

PROFESSOR MAX MÜLLER'S  
**HIBBERT LECTURES**

THE ORIGIN AND GROWTH  
OF  
**RELIGION**

AS ILLUSTRATED BY  
THE RELIGIONS OF INDIA.

---

TRANSLATED INTO BENGALI

BY

**RAJANIKANTA GUPTA.**

*Author of "History of the Great Sepoy War," "Studies in Indian  
History," &c., &c.*

PUBLISHED BY

**BEHRAMJI M. MALABARI.**

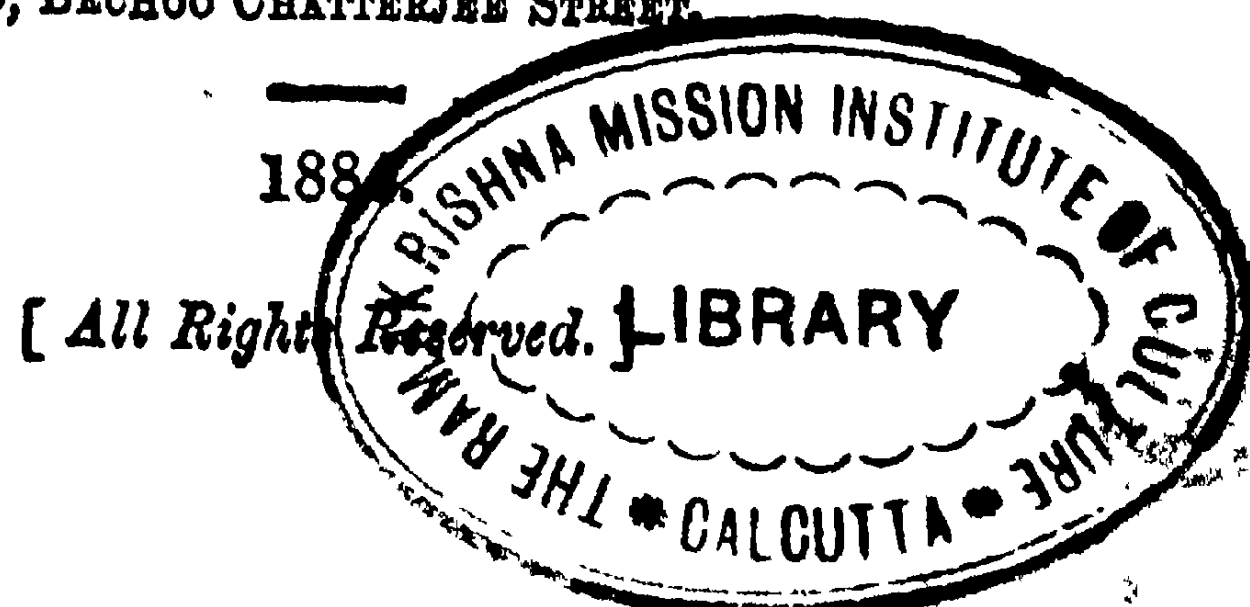
---

**CALCUTTA :**

PRINTED BY G. C. BOSE & CO., BOSE PRESS,  
33, BECHOO CHATTERJEE STREET.

1884

[ All Rights Reserved. ]





অধ্যাপক মোক্ষমূলরের হিবার্ট বক্তৃতা  
ধর্মের উৎপত্তি ও উন্নতি।

ভারতবর্ষের ধর্ম দ্বারা ব্যাখ্যাত।



শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত কর্তৃক

অনুবাদিত।

শ্রীবেহেরামজী মেহেরবানজী মলবারিকর্তৃক

প্রকাশিত।



কলিকাতা।

জি.সি. বসু কোম্পানি দ্বারা ৩৩ নং বেচু চার্টার্ডের স্ট্রীট,  
বসু প্রেসে মুদ্রিত।



MIC LIPPAR	
21068	
2941	
NIAX	
ard	✓
	✓
	✓
ard	✓
Ch ked	an



To

THE MAHARANI SHURNOMOYE, C. I.,

KOSSIMBAZAR,

BENGAL.

MADAM,

*I cannot offer this Bengali translation of Max Müller's Hibbert lectures to a worthier friend of literature than yourself. But for your generous contribution of Rs. 1,000 my tour through parts of Bengal, the North-West Provinces and Rajputana would have proved a costly failure.*

*It may appear not a little curious that over an extent of territory occupied by the wealthiest aristocracy in India and some of the foremost Hindu princes, an undertaking like this should have been reserved for the exclusive patronage of a widow lady. But to me this circumstance is of the happiest augury. It is another proof of your now proverbial liberality and devotion to the cause of advancement. So long as India is blessed with daughters like the Maharani Shurnomoye there is hope for female education and for general enlightenment, leading perhaps to a revival of the past, when the high and inspiring thoughts, now placed before us by the most facile interpreter between nations, were first thought out by your Indo-Aryan ancestors and mine.*

*Yours faithfully,*

BEHRAMJI M. MALABARI.

BOMBAY,

February, 29, 1884. }



মাননীয় শ্রীমতী মহারানী স্বর্ণময়ী সি, আই,

মহোদয়াসু ।

সবিনয় নিবেদন,

আপনি সাহিত্যের সুপরিচিত বন্ধু । ভট্ট মোক্ষমূলরের হিবার্ট বক্তৃত্তার বাঙ্গালা অনুবাদ আপনা অপেক্ষা অধিকতর উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে সমর্পিত হইতে পারে না । আপনি উদারতাগুণে হাজার টাকা দান না করিলে, আমার বাঙ্গালার কোন কোন স্থানে এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ও রাজপুতনার বহুবায়-সাধ্য পরিভ্রমণের কোন ফল হইত না । ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ভারতবর্ষের প্রধান হিন্দুরাজগণ ও ধনকুবেরগণের বাসভূমির জায় বিস্তৃত স্থানে একটী বিধবা রমণীর একমাত্র অনুগ্রহ, এরূপ একটী গুরুতর বিষয়ের অবলম্বনরূপ হইয়াছে । কিন্তু আমি ইহা পরম মঙ্গলের পূর্ব-সূচনা বলিয়া মনে করি । উন্নতির উদ্দেশে আপনার নিকরজন-বিদিত আগ্রহ ও হিতৈষিতার ইহা অশ্রুতম পরিচয় । জননী ভারতভূমি যত দিন মহারানী স্বর্ণময়ীর জায় ছুহিতা পাইয়া আনন্দিত থাকিবেন, তত দিন স্ত্রীশিক্ষা ও সাধারণ উন্নতির সম্পূর্ণ আশা আছে । আশা আছে, হয় ত সেই উন্নতিতে ভারতবাসী আপনাদের অতীত ইতিহাসের মর্যাদা বুঝিবে এবং ইহাও আশা আছে যে, বহুভাষাভিজ্ঞ সুপণ্ডিত ভট্ট মোক্ষমূলর আমাদের সম্মুখে আপনার ও আমার অর্থ্য পূর্বপুরুষগণের যে গভীর চিন্তাগ্রস্ত ভাব উপস্থিত করিতেছেন, ভারতবাসী তাহা জানিয়া, আপনাদের পূর্বপুরুষগণের জ্ঞান-গরিমা উপলব্ধি করিবে ।

বোম্বাই ।

বশংবদ

২০ এ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৩ । } শ্রীবেহেরামজী মেহেরবানজী মলবারী ।



## NOTICE.

---

I AM much obliged to Babu Rajanikanta Gupta for his patience and diligence in the preparation of this Bengali translation. My best thanks are also due to Dr. Rajendralala Mitra for revision of proofs often in the midst of other engagements and even when indisposed.

B. M. MALABARI.

BOMBAY.



## ভূমিকা ।

---

প্রায় তিন বৎসর হইল, আমি আমার রচিত কয়েকখানি ইংরেজী কবিতা-পুস্তক আমার শুভানুধ্যায়িনী লণ্ডনস্থ কুমারী ম্যানিঙের দ্বারা তথাকার কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট উপহার স্বরূপ পাঠাইয়া দি। সকলেই প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অধ্যাপক মোক্ষমূলরও একজন। তিনি এই বলিয়া আমাকে একখানি পত্র লিখেন যে, “আমরা ইংরেজী কবিতাই লিখি—আর গদ্যই লিখি, ভারতের ও জন্মভূমির ভাবগুলি যাহাতে ইংরেজী ভাষায় ব্যক্ত কবিতে পারি, তাহাতে বিম্বৃত থাকা উচিত নহে।” গুরু উপদেশের মর্ম এইরূপ ছিল। যাহাদিগের নিকট আমি পুস্তক পাঠাইয়াছিলাম, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ গ্লাড্‌ষ্টোনের প্রবন্ধ, সাফ্টস্বেরীর বক্তৃতা এবং মোক্ষমূলরের হিবার্ট লেকচার আমার নিকট পাঠায়াছিলেন। এই শেষোক্ত পুস্তকখানি আমার অত্যন্ত প্রয়োজনে আসিয়াছে। এই পুস্তকের প্রশংসা শুনিয়া মনে করিয়াছিলাম, ইহা অবশ্য উৎকৃষ্ট হইবে, শেষে পাঠ করিয়া ততোধিক উৎকৃষ্ট বোধ হইল। মোক্ষমূলরের অনেক কথা আমার হৃদয়ে লাগিয়াছে। মহাশয় আর্য্যগণসম্মুখে তাঁহার অদ্ভুত অনুমতি। তাঁহার সর্বগুণ-সম্পন্ন সংস্কৃত ভাষার প্রতি উদ্দীপনা-পূর্ণ উক্তি এবং আর্য্য জাতির ভাষা ও ক্ষমতায় তাঁহার প্রশংসার উচ্ছ্বাসে আমার মন একান্ত আকৃষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। মোক্ষমূলর যেরূপ গভীর বিষয়ের তত্ত্বানুরত, সাহিত্য-জগতে সেরূপ বিষয়ে আর অল্প লোকই গৌরব করিতে পারেন। ফলতঃ তিনি একটী প্রধান ও অতি দুর্লভ বিষয়ে ব্যাপ্ত হইয়াছেন। আমরা জানি, অনেক বড় বড় পণ্ডিত আছেন; এ ভাবত-থওও অল্প নাই। ইউরোপ-ক্ষেত্রে কয় জন আছেন কিরূপে বলিব?—আর কেইবা! তাঁহাদের জ্ঞানের পরিমাণ করিবে? এমন কি তাঁহাদের পারদর্শিতা এবং অভিজ্ঞতা যে কতদূর, তাহা ধারণা করিবার ক্ষমতাও আমাদের নাই। আমরা জ্ঞানধনের উপাসনা করিতে সচরাচর ঐশ-

রিক জ্যোতি টুকু হারাইয়া বসি। মোক্ষমূলরের জ্ঞান, সুশিক্ষা-প্রভাবে যত না আলোকিত হইয়াছে, সেই পবিত্র জ্যোতিতে উহা ততোহধিক উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে। পণ্ডিতগণ জ্ঞানরাজ্যে ক্রয়ের ব্যাপারী; কিন্তু ভট্ট মোক্ষমূলর অবিশ্রান্ত দাতা, এবং ব্যবসায়ী। তিনি নিজেই কেবল কিছু বুদ্ধিয়া ক্ষান্ত হইয়া না, উহা সকলকে বুঝাইয়া দিবার তাঁহার যেমন প্রবৃত্তি, তেমনই ক্ষমতা আছে। এই সদ্গুণ তাঁহার প্রতিভার শিরশোভা স্বরূপ। উহাতে মানবাতীত এমন কিছু সুখ অবশ্যই থাকিবে, যদ্বা তাহা তিনি এই সমস্তায় কৃতকার্য হইয়া উঠিয়াছেন যে, অদৃশ ও সর্বদর্শী বিশ্বাত্মার জ্ঞান মানবাত্মায় কিরূপে পাইল।

হিবার্ট বক্তৃতা পাঠ করিতে করিতে এইরূপ চিন্তার তরঙ্গ আমার মনে প্রবাহিত হইতে আবশ্য হইয়াছিল। কৃতজ্ঞতার আবেশে আমি গ্রন্থকারকে একখানি পত্র লিখি। পত্রখানির মর্ম্ম এই।—“আপনার যে বক্তৃতা ইউরোপের সর্ব প্রদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহা আমার ন্যায় ছাত্রদের মধ্যেও পঠিত হইতে পারে। কিন্তু ইহা কি বিদেশী ভাষায় অশিক্ষিত লক্ষ লক্ষ আর্য্যবংশীয়গণের অপাঠ্য রহিবে?” ইহাতে তিনি এই স্নেহপূর্ণ উত্তর দেন—“যখন এই পুস্তক লিখি, তখন আমি আমার ওয়েষ্টমিন্‌স্টেরের প্রোভ-গণ অপেক্ষা আপনাদের দেশে বন্ধুবর্গের কথাই অধিক মনে করিয়াছি। আমার ইচ্ছা, এগুলি সংস্কৃতে অনুবাদিত হয়। ইহা পাঠে ভারতের উপকার হইবার সম্ভাবনা থাকিলে আমি আনন্দিত হইব”। আমি এ বিষয় কোন কোন বন্ধুর নিকট বলিয়াছিলাম, কিন্তু কেহই এই ভার গ্রহণ করেন নাই। আমি আবার মোক্ষমূলরকে লিখি “এখন বরং সংস্কৃত অনুবাদ থাকুক, ইহার গুজরাটী অনুবাদ প্রথমে আরম্ভ করিলে কেমন হয়” ? গ্রন্থকার আমার প্রস্তাবে সন্মত হইয়া পুনরায় উৎসাহ-পূর্ণ পত্র লিখিয়া সাহস দিয়াছিলেন যে, আমি এইরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে গবর্ণমেন্ট এবং সাধারণে অবশ্যই সাহায্য করিবেন। তাঁহার এত অনুগ্রহ যে, এই অনুবাদিত গ্রন্থের স্বত্বও আমাকে দিয়াছেন। তাঁহার এইরূপ উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া আমি যে ব্যয়েই হউক, উল্লিখিত গ্রন্থের অনুবাদে প্রবৃত্ত হই। কেবল গুজরাটী কেন, যেমন করিয়া পারি, ইহার সংস্কৃত অনুবাদও



অবশ্য করিব। অতঃপর আমার একরূপ ইচ্ছাও আছে যে, ক্রমে ইহার মরহাট্টা, বাঙ্গালা, হিন্দি, এবং তামিল ভাষায় অনুবাদও প্রকাশ করি।

পাঠকগণের নিকট যদি অনুবাদের ভাষা কঠিন বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের দেখা উচিত যে, যে গুরুতব বিষয় লইয়া এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে, তাহা অতি সহজ ভাষায় হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। যখন গুজরাটী ভাষায় উপযুক্ত শব্দের অভাব দৃষ্ট হইয়াছে, তখনই সংস্কৃতের আশ্রয় লইতে হইয়াছে। ভাব সম্বন্ধেও ঐরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছি। ফলতঃ এই কঠিন বিষয়টিকে সাধারণের পাঠোপযোগী করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে আমাকে প্রায় বর্ষকালব্যাপী পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। সময়ে সময়ে এক একটা পৃষ্ঠার জন্য সপ্তাহ-কাল লাগিয়াছে। আবার এমনও হইয়াছে যে, এক একটা শব্দের উপযুক্ত প্রতিশব্দ না পাইয়া ভাষাবিদগণের আশ্রয় লইতে হইয়াছে। ফলতঃ মোক্ষমূলর ভট্টের গ্রন্থেব ভাষা সাধারণের জন্য ব্যক্ত করিতে আমাদের শরীরের রক্তকে জল করিতে হইয়াছে।

আমাদের গুণগ্রাহী তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন “রাস্তা গোফ্তর”-সম্পাদকের মতে মোক্ষমূলর একজন “ভবিষ্যৎ বক্তা”। যথার্থই যেন তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি আমাদের সমস্ত জীবনের গভীর রহস্য ভেদ করিতে সক্ষম হইয়াছে। তাঁহার বাক্য ঈশ্বর-কর্তৃক প্রবুদ্ধ লোকের বাক্যেব জায় বোধ হয়। সমালোচক বিশেষেই নির্দ্ধারণ করিতে পারেন যে, ইহার মূলদেশে কি প্রকার সত্য নিহিত রহিয়াছে। আমরা জানি যে, কোন কোন চিন্তাশীল তাঁহার মতের পক্ষপাতী নহেন। তথাপি কেহই ইহা অস্বীকার করিতে পারেন না যে, তাঁহার ভাব-ব্যক্তির ক্ষমতা অসাধারণ এবং অমানুষিক। তাঁহার মীমাংসিত সুন্দর মতগুলি আর্য্য ভ্রাতৃগণের উপকারার্থে প্রকাশ করাই আমার উদ্দেশ্য। এই মূলগ্রন্থের ভাষা ও ভাব সম্বন্ধে বলিতে গেলে গ্রন্থকারের প্রতিভা যেন সূর্য্যের তুল্য দীপ্ত। তাহার সহিত অনুবাদকের প্রতিভা তুলনা করিতে গেলে ক্ষীণালোক বর্ত্তিকার তুল্য বোধ হইবে। ভাব ব্যক্ত করিবার সময় গ্রন্থকারের চিন্তাব প্রবাহ যেন সাগরের তুল্য, আবার অনুবাদকের সঙ্কীর্ণ কূপ-তুল্য। মোক্ষমূলরের অসাধারণ ভাব এবং ভাষা গুজরাটীতে অনুবাদ করিবার চেষ্টা পাওয়া, আর সুবিস্তৃত সাগরকে অপ্রশস্ত খালে পরিণত করা

একই কথা। কলতঃ আমার মনোগত ভাব বৃথা অহঙ্কার বলিয়া গণ্য হওয়া আশ্চর্য্য নহে। যেক্রপ অনুবাদ করা হইল, তাহা সাধারণের পক্ষে যদি কিঞ্চিৎপ্রাণপ্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ না হয়, তবে নিশ্চই জানিব যে, অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া আমি যে অসংসাহসিক কার্য্য করিয়াছি, ইহা তাহারই শাস্তি। আমার এই অসাধারণ গ্রন্থ ভাষান্তরিত করিবার চেষ্টা, ঠিক যেন পণ্ডিতের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা বালকের মুখদ্বারা নির্গত করার আশ্রয়।

যাহাই হউক, আমি মনে মনে এই ভাবিয়া রাখিয়াছি যে, আমার যেন সত্য সত্যই এই গ্রন্থানুবাদের সাগর্যা আছে। এই ক্ষুদ্রগ্রন্থ এবং ইহার পরে ক্রমে ক্রমে যে ‘সংস্কৃত, মারহাট্টী, হিন্দি, তামিল গ্রন্থ বাহির হইবে আমার মনে তাহা যেন “সমর্পণ” তুল্য। সংসারের সকলেরই কিছু না কিছু উচ্চাভিলাষ আছে—ইহাই আমার জীবনের উচ্চাভিলাষ। সংসার-যন্ত্রণার মধ্যে যদি কোন আর্য্যভ্রাতার মনে ইহা পাঠে শান্তির উদয় হয়, যদি কাহারও মনে ইহাতে প্রাচীন আর্য্য-গরিমার কথা আনিয়া দেয়, যদি ইহা পাঠে কোন আর্য্য আত্মচিন্তায় প্রবর্তিত হন, বা পরমানন্দলাভ কি পরমাশ্রাধারণ করিবার উদ্যোগও করেন, আর আর্য্য-জন্মের মোক্ষমূলর মুনি, যিনি সমস্ত জীবন মানব-ইতিহাসের দুইটী প্রধান বিষয়, —“আর্য্য বিশ্বাস” এবং “আর্য্য ভাষা” লইয়া কাটাইয়াছেন, ইহা পাঠে যদি আমাব দেশীয়গণ তাঁহার আন্তরিক ভাব কিয়ৎপরিমাণে জানিতে সমর্থ হন, তাহাহইলেই আমি সন্তুষ্ট হইয়া মনে করিব যে, আমার উদ্দেশ্য চরিতার্থ ও সম্পূর্ণ হইল।

বোম্বাই, ৩১এ ডিসেম্বর, ১৮৮১ } শ্রীবহরামজী এম্, মালাবারী।

## ধর্ম ।

ধর্ম কি? কোন বিষয় আলোচনা করিতে হইলে সেই আলোচিত বিষয়টী সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হওয়া চাই, সুতরাং এখানে যখন ধর্মের বিষয় আলোচিত হইতে চলিল, তখন “ধর্ম” কি, তাহা সর্বাগ্রে বলা উচিত ।

ধর্মশব্দটীকে ব্যুৎপত্তি অনুসারে নির্দেশ করিতে গেলে ইহাই বুঝা যায়, “যাহা অপরকে ধারণ করে, রক্ষা করে, বা পতন হইতে রক্ষা করে” । ধর্মকে ইংরেজীতে “রিলিজিয়ন” (Religion) বলে । এই ‘রিলিজিয়ন’ শব্দ লাতিন ভাষার “রিলিজিও” (Religio) শব্দ হইতে প্রসূত ।—লাতিনের ‘রিলিজিয়র (Religere) প্রকৃত অর্থ বন্ধন, সংস্থান, চিন্তা, এবং ধ্যান প্রভৃতি । ধর্মের এই কয়েকটীই প্রধান অর্থ । কিন্তু আজি কালি এই শব্দ যে ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার সহিত ঐ রূপ অর্থ খাটাইতে গেলে কালানৌচিত্য দোষ ঘটে । কোন শব্দেরই ব্যুৎপত্তি-মূলক অর্থ চির দিন একভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে না, কেন না মানবগণের স্বাভাবিক উন্নতি, বৃদ্ধি এবং অবনতির সঙ্গে সঙ্গে শব্দেরও অর্থ ও ভাবমূলক উন্নতি, বৃদ্ধি ও অবনতি ঘটিয়া থাকে । ধর্মশব্দ সর্বপ্রথমে “যাহা ধারণ করে,” এবং পবে “যাহা রক্ষা করে” এইরূপ বুঝাইত, ইহাদের মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ ছিল না । কিন্তু আধুনিক, Religion এবং Religere শব্দের, “চিন্তা, জপ, বা ভাবা ও বিশ্বাস প্রভৃতি অর্থের সহিত উহার বিশেষ পার্থক্য অনুভূত হয় । অথচ, ইহারা সকলে এক মানসিক উদ্ভবনী শক্তির বিভিন্ন প্রবাহ । “চিন্তা করা” এই শব্দটি যেন প্রথমতঃ একটী সূক্ষ্ম স্রোতের ন্যায় এক কোণে বহিয়া যাইতেছিল, পরে ‘ভাবনায়’ পরিণত হইয়া উহা বর্ধিতকলেবর প্রবহমান নদীর আকার ধারণ করিল । তাহার পর “জ্ঞান ও ‘বিশ্বাসে’ মিলিত হইয়া উহার আকার অধিকতর বিস্তৃত ও স্রোত অধিক খরতব হইল । এইরূপ উন্নতি সহকায়ে উহা অবশেষে সাগর এবং মহাসাগররূপে পরিণত হইয়া গেল । কিন্তু এখন যদি এই প্রবল মহাসাগরকে উৎপত্তি নির্দেশ করিতে হয়, তাহাহইলে আমাদের, সেই কোণ-বাহি ক্ষুদ্র স্রোতের কথা স্মরণ হইবে । পণ্ডিতগণ এইরূপ প্রক্রিয়ার নাম “প্রসারণ” বা “প্রকাশন” রাখিয়াছেন ।

গ্রন্থকার ইহাকে “পরিণামবাদ” নামে অভিহিত করেন, কেননা এই শব্দটি বহু অর্থ জ্ঞাপক। ধর্ম শব্দের আদিম বা ব্যুৎপত্তি-গত অর্থে দৃষ্টি রাখিয়া বিবেচনা করা উচিত যে, এখন এই শব্দটি কি ভাব প্রকাশ করিতেছে। যদিও এই শব্দটি একই ভাবে গ্রহণ করা সকল লোকের পক্ষে সম্ভব নহে, তথাপি এ সম্বন্ধে খ্যাতনামা ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিতগণ যে ভাব ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা জানিতে পারিলেই আমাদের উদ্দেশ্য এক প্রকার সাধিত হইবে। তাহা এক প্রকার স্থির হইয়াছে যে, “ধর্ম” বলিলেই বিশ্বাস, পূজা, স্মৃতি, আনন্দপ্রদর্শন, আশা বা ভীতি, অজ্ঞেয়কে পাইবার জন্য জ্ঞান-পিপাসার অনুভূতি প্রভৃতি কতগুলি অবস্থাকে বুঝায়। অথচ এই সকল শব্দ যে পরস্পর এক প্রকার তাহাও নহে। এমন কতগুলি জাতি আছে যে, ধর্ম বলিয়া তাহাদের কোন শব্দ নাই। অথচ তাহারা সেই অজ্ঞেয়ের পূজা করিয়া থাকে। জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলিতেন যে, ঈশ্বর বলিয়া কাহারও বিষয়ে চিন্তা করা পণ্ডিত্য ও নিষ্প্রয়োজন। তথাপি এই পণ্ডিত নারীর পূজা করিতেন। তিনি মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ জীবকে পূজার যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, ঈশ্বর বা ঈশ্বরের তুল্য কিছুই গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলিতেন, ঈশ্বর বা ঈশ্বরী কথাই কথা মাত্র। তাহার এই সকল উক্তি শ্রবণ করিয়াও আমরা বলিতে পারি না যে, তাহার ধর্মে বিশ্বাস ছিল না। তাহার নিশ্চয়ই একটি ধর্ম ছিল। যদি তাহার ধর্মই না থাকিত, তবে নারীর পূজাকে কি বলা যাইবে? ব্রাহ্মণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। বৌদ্ধ ঈশ্বর স্বীকার করেন না। তাই বলিয়া কি বৌদ্ধের ধর্ম নাই? ষথার্থ কথা বলিতে কি, লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যেও বোধ হয় এমন লোক পাওয়া যায় না, যাহার কোন না কোন ধর্মই নাই। সকল শাস্ত্রদর্শী মহাবিজ্ঞ ব্যক্তি যেমন অনন্ত শক্তির ধ্যান করিয়া ধর্ম অভ্যাস করিতেছেন, সেইরূপ বানরতুল্য নিরক্ষর এক হীনবুদ্ধি ব্যক্তির উপল-খণ্ড পূজার নামও ধর্ম।

জর্জ দার্শনিক কার্ট বলেন যে, ধর্মের অর্থ স্মৃতি। যাহারা কর্তৃকাণ্ড প্রভৃতি ঈশ্বরাদেশ বলিয়া মানেন, তাহারাই ধর্মে বিশ্বাসী। (অনেক পারশী সংস্কারকদের এ সম্বন্ধে এই মত)।

ফিস্তে নামা আর এক জন পণ্ডিত বলেন, পার্থিব ব্যাপারে ধর্মের প্রয়োজন নাই। পবিত্র নীতিই এ বিষয়ে প্রশস্ত। অজ্ঞান এবং দূষিত ব্যক্তি-দেবই কেবল ধর্মের আবশ্যকতা হইতে পারে। (বৈষ্ণবেরা এ কথা ভাল বলিবেন না)। ফিস্তে আরও বলেন, ধর্মের অর্থ জ্ঞান (বৈদাস্তিকগণ! তোমরা আনন্দিত হও)। যাহা হউক, এই দুই পণ্ডিতের এইরূপ পরস্পর বিভিন্ন মত। এখন কাহার মত সত্য? কাণ্টের না ফিস্তের? গ্রন্থকার বলেন যে, উভয়ের মতই সত্য এবং উভয়ের মতই মিথ্যা। যদি উভয়েই বলিতেন, যিনি যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহাই ধর্ম, তবেই ভাল হইত। ধর্মের অর্থ সুনীতি, আর যে নীতি ঈশ্বরের আদিষ্ট তাহাই ধর্ম, তাহাই ঠিক, এবং তাহাই হওয়াও উচিত। কিন্তু তাহা যে, ইহার কিছুই নহে, ইহা মনে রাখা উচিত।

স্মারমশর নামা আর এক জন প্রসিদ্ধ লোক বলেন, ধর্ম বলিলে সম্পূর্ণ অধীনতা বুঝায়। ফিউএরবাক্ নামা জর্মনীর আব এক পণ্ডিত বলেন, ধর্ম শব্দে শুদ্ধ অধীনতা বুঝায় না। ইহাতে অধীনতার সঙ্গে সঙ্গে লোভও বুঝায়। অর্থাৎ যে দেবতায় বিশ্বাস করে, সে তাহাতে দেহ ও মন সমর্পণ করিয়া একবারে অধীন হইয়া পড়ে, অবশেষে কোন স্বার্থের জন্য পূজা ও যাগ বন্ধ করে। পূজা শেষ হইলে দেবতার নিকট ভিক্ষা বা দান চাহিয়া থাকে। আপনার স্বার্থ-সিদ্ধিই উপাসনার উদ্দেশ্য। ফলেও তাহাই।

হেজেল নামা আর এক জন সুপ্রসিদ্ধ লোক কৌতুক করিয়া বলিয়াছেন যে, “স্মারমশর যে বলেন ধর্ম বলিলেই পরাধীনতা বুঝায়, তাহা হইলে বোধ হয় পৃথিবীতে কুকুর অপেক্ষা ধর্মিষ্ট আর কেহই হইতে পারে না। মনুষ্য যেমন দেবের অধীন, কুকুরও তেমনি তাহার প্রভুর বাধ্য ও অধীন। তাহার পর হেজেল বলেন যে, না তাহা নয়, ধর্মের অর্থ—পরাধীনতা কখন হইতে পারে না, বরং ইহার অর্থ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বলা দাইতে পারে। এই দুই জনের কি আশ্চর্য মত-ভেদ। তথাচ উভয়ের কথাই ঠিক।

ফিউএরবাক্ এবং কাণ্ট উভয়েই বলেন যে, মানব-প্রকৃতির অতীত বিষয় মানবে ধারণা করিতে অসমর্থ। তবেই ধর্ম অর্থ—লোক বিশেষের নহে, সমগ্র মানব জাতির পূজা—এই দুই বিজ্ঞ পণ্ডিতের মতে মনুষ্যত্ব-সমষ্টিই

পূজক ও পবনেশ্বর। ফিউএরবাক্ আরও বলেন যে, আত্মপ্রেম ছাড়া ধর্ম হইতে পারে না, এ কথাও ঠিক।

হরডার বলেন, মনের প্রকৃতির সং শিক্ষার প্রথম বিকাশ ধর্মসম্বন্ধীয় কাহিনী এবং পুবাণে দৃষ্ট হয়। পক্ষান্তরে ফিউএর বাক্ বলেন যে, ধর্ম প্রথমে রোগ বিশেষ বলিয়া গণ্য ছিল। মানবের পীড়িত হৃদয়ই তাহার ধর্মোৎপত্তির কারণ। কেবল পীড়া নহে, তাহার সমস্ত আপদ বিপদই ধর্ম-বিকাশের কারণ। শিবাক্লিতাসও কহেন যে, ধর্ম বাস্তবিকই রোগ, কিন্তু ইহা পবিত্র বা ঐশ্বরিক পীড়া।

সিলার বলেন যে, তিনি মূলেই কোন ধর্মে বিশ্বাস করেন না। কেননা তাহার ধর্মের জন্যই কোন ধর্ম নাই। ইহার অর্থ এই যে, তিনি প্রকৃত ধর্ম জানেন, প্রচলিত ধর্ম স্বীকারে তাহার কোনও প্রয়োজন নাই। এ কথাও ঠিক।

একজন বলেন, মানব হৃদয়ের গুহ্য উপাসনাই ধর্ম। একথায় আর এক জন জিজ্ঞাসা করেন যে, কর্মকাণ্ড-বিবর্জিত এরূপ উপাসনায় কি প্রয়োজন? তৃতীয় ব্যক্তি বলেন, হৃদয়ের গুহ্য উপাসনাই বল, আর কর্মকাণ্ড প্রভৃতি কুসংস্কারই বল, কিছুই প্রকৃত ধর্ম নহে।

এখন দেখা যাইতেছে ধর্ম কি, মীমাংসা হইল না, অথচ ইহা বুঝাইবার জন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। ফলতঃ কথা এই, ধর্ম কি, ইহার মীমাংসা সহজ নহে, বা এক কথায় ইহা বুঝাইতে পারা যায় না। ধর্মের অর্থ “সকলই,” অথবা ধর্মের অর্থ “কিছুই নয়”। পাঠক বলিবেন, তবে এসম্বন্ধে এত বাদানুবাদের প্রয়োজন কি? যাহা বলা হইল, তাহা এ বিষয়ের বাদানুবাদ নহে, এ সম্বন্ধে নানা মূনির নানা মত উদ্ধৃত করা গিয়াছে মাত্র। উহাতে ধর্ম কি? অনেকটা বুঝাও যাইতে পারে। ধর্ম কি, এ প্রশ্নটি বাস্তবিকই বড় কঠিন। আমাদিগকে এইটী বুঝিতে হইবে যে, গ্রন্থকারের নির্দিষ্ট অন্তর ধর্ম এবং বিশ্বাস কি? অন্তর ধর্মে ইহাই বুঝায় যে, সকল মনুষ্যেরই অন্তরে এমন একটা তেজ আছে যে, যদ্বারা তাহারা অসীমের ধারণা করিয়া থাকে। ধর্ম কি? ইহা বুঝাইবার জন্ত বোধ হয় ইহা হইতে অধিকতর সহজ, বোধগম্য ও উৎকৃষ্ট হয় নাই।

এখন এই তেজ এবং ইহার অর্থ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই অমুভূত হইবে যে, ধর্মভাবের উৎপত্তি কিরূপে সৃষ্টি হইয়াছিল। সকল শ্রেণীর জ্ঞানী লোকেরাই ইহা স্বীকার করিবেন যে, মানবের বুদ্ধি ও বিবেক আছে এবং এই দুই বৃত্তি আপনাপন্ন ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহাও সকলকে স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ বুদ্ধি স্বাভাবিক (উহা আমাদের সঙ্গে জাত হয়) এবং উহার প্রসারণই বিবেক। সূত্রাং বিবেকের কার্য জ্ঞানের ক্রিয়াফল হেতু সম্পন্ন হয় ; অর্থাৎ দর্শন এবং শ্রবণে আমাদের মনে যে রেখাপাত হয়, তদ্বারা আমরা যাহা দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি, বুঝিতে পারি। এই রেখাপাতের নাম অমুভূতি, এবং উহার কার্যফলের নাম ধারণা।

কিন্তু ইহা ত হইল সীমাবিশিষ্ট পদার্থের সম্বন্ধে। অসীমের ধারণা কিরূপ হইতে পারে? গ্রন্থকার বলেন, এই তৃতীয় ব্যাপার নির্বাহোপযোগী একটি তৃতীয় উপকরণ আছে। এই তৃতীয় উপকরণের নাম “বিশ্বাস”। ইহার কার্যফল অসীমের ধারণা। এই ক্রিয়া-ফলটি অতিসুন্দর। প্রথমতঃ বুদ্ধি দ্বারা সীমাবিশিষ্ট পদার্থ আমরা জানিতে পারি। তাহার পর বিবেক দ্বারা উহার ধারণা জন্মে। এই দুইটী ক্রিয়ার পর জ্ঞান ও বিবেকের সাহায্যে বিশ্বাসের উদয় হয় এবং তাহাতেই আমরা সীমাবিশিষ্ট হইতে অসীমের ধারণা করিতে শিখি। ১ম বুদ্ধি, ২য় বিবেক, ৩য় বিশ্বাস। এই বিশ্বাস, বুদ্ধি ও বিবেকের অতিপ্রসারণ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

“বিশ্বাস” কি অসাধারণ রহস্য? আর এই রহস্য কিরূপেই বা মানবের অমুভূত হয়? গ্রন্থকার বলেন “এ একটি রহস্য বটে, কিন্তু কোন ক্রমেই অসাধারণ নহে। ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই। পার্থিব সকলই রহস্যময়। বুদ্ধি ও বিবেকের রহস্য কি কম? আমরা শ্রবণ ও দর্শন করি, কিরূপে ইহা হয়? এবং কি উদ্দেশ্যেই বা হয়? কি আশ্চর্য্য রহস্য! রহস্যের উপর রহস্য এই, এই প্রক্রিয়া কি কোশলে চলিতেছে? চিন্তা করিতে কাহারই বা বিরাম আছে? ইহা প্রতিদিন আমাদের চক্ষু কর্ণের উপর ঘটিতেছে। ইহাতে কি নূতনত্ব আছে, বল। সকলই স্বাভাবিক, সূত্রাং আমরা এইরূপ জ্ঞানে বাধ্য হইয়া সন্তুষ্ট। বখন অবস্থাই এই, তখন



বিশ্বরাবিষ্ট হইবার কি প্রয়োজন ? বিশ্বাস বলিবারই বা কি প্রয়োজন ? উহা ত বুদ্ধি ও বিবেকের প্রসারণ ব্যতীত আর কিছু নহে । অনেক বিজ্ঞ লোকে বিবেককে বুদ্ধির ফল বলিয়া স্বীকার করেন । আবার তাঁহারা ইহাতে বলিয়া থাকেন যে, বিবেক অনমুভূত । যদি আমরা বিবেককে সাধারণভাবে ব্যবহার করি, তাহাহইলে বুদ্ধির সহিত ইহার অতি নিকট সম্বন্ধ থাকিয়া যায় । কিন্তু ইহাকে যদি আর কোনরূপে ব্যবহার করা যায়, তবে তাহা হয় না । বিশ্বাস সম্বন্ধেও তাহাই বলা যাইতে পারে ।

এখন দেখা যাউক, অন্তবান্ কাহাকে বলে এবং অনন্তই বা কি ? যাহা বুদ্ধি ও বিবেক দ্বারা জানিতে ও অনুভব করিতে পারা যায় তাহাই—“অন্তবান্” । সূতরাং ইহাতে এই প্রতিপন্ন হইতেছে না যে, “অনন্ত” সীমা ও শেষ শূন্য—ইহা কেবল শেষ সীমার অতীত । এই প্রয়োজনীয় বৈলক্ষণ্য মনে রাখা কর্তব্য । পারিভাষিক শব্দার্থে প্রবিষ্ট না হইলে এই সকল জটিল বিষয় ধারণা করা যাইতে পারে না ।

যাঁহারা বলেন ধর্ম বলিয়া কিছু নাই, অথবা তাহার প্রয়োজনও নাই, তাঁহাদের প্রধান তর্ক এই, যে, আমাদের বুদ্ধি ও বিবেক আপনাপন কর্ম করিয়া থাকে ; এই দুই বৃত্তির সহায়তায় মানবগণ আপন উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হয় । সূতরাং এই দুই বৃত্তির জন্য তাঁহাদের “বিশ্বাসের” ও প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না । আর ইহাও সম্ভব নহে যে, বুদ্ধি ও বিবেকের দ্বারাই কেবল মানব “বিশ্বাস” লাভ করিতে পারে—এই তর্কের প্রতিবাদে গ্রন্থকার বলেন,—তোমাদের কথাই স্বীকার করিয়া এই প্রমাণ করিয়া দিতে পারি যে, যদি বুদ্ধি ও বিবেক প্রভৃতি আপন আপন কর্ম করিয়া থাকে, তবে বিশ্বাস কেবল উহার সম্ভাব্য ফল নহে ; বিশ্বাস এ অবস্থায় আমাদের নিকট অনিবার্য্য হইয়া দাড়ায় । যদি আমাদের বুদ্ধি বিবেক থাকে, তবে আমাদের বিশ্বাসও অবশ্যই থাকিবে । আমরা বিশ্বাসের হাত ছাড়াইতে পারিব না । যদি “বিশ্বাসের” প্রমাণ জন্ম কিছু থাকে, তবে তাহাই বুদ্ধি । এই বুদ্ধির অস্তিত্ব উভয় দলের সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন । যেখানে বুদ্ধি সেখানে বিশ্বাস । দ্বিতীয়টি প্রথমটির ফল । এই বিশ্বাসের মূল অন্বেষণ করিবার জন্ম কোন অভিনব বৃত্তি বা গুণ কারণের প্রয়োজন



দেখা যায় না। অথবা এস্থলে কোনরূপ প্রকটীকরণেরও প্রয়োজন নাই। যখন বুদ্ধি গ্রাহ্য হইয়াছে, তখন বিশ্বাসও কেবল ঐতিহাসিক ভঙ্গ-বলে অবশ্যই গ্রাহ্য হইবে।

গ্রন্থকার বলেন যে, ধর্মের জন্ত লোকের কোন স্বতন্ত্র বা বিশেষ একটি প্রকৃতিদত্ত জ্ঞান নাই। ঈশ্বরও কোন নবনির্মিত ধর্ম কোন জাতি কি ব্যক্তিবিশেষের জন্য দেন নাই। “ধর্ম” শুদ্ধ বুদ্ধি ও বিবেকের ফল মাত্র। এই বৃত্তি বা জ্ঞান আমাদিগকে কি শিখাইয়া থাকে? শিখাইয়া থাকে—“অন্তবান্”। এই “অন্তবান্” বুদ্ধি এবং বিবেকে আমাদিগকে শিক্ষা দিতে সক্ষম হয়। উহা অন্তবানের অতীত অনন্তকে জানিতেও আমাদিগকে শিখায়, ইহারই নাম ধর্ম, এবং ইহাই ধর্মভাবোৎপত্তির মূল।

যাহা আমরা দেখি এবং শুনি, তাহা সকলই কি কেবল অন্তবান্? না, আমরা চক্ষু কিংবা যন্ত্রাদি দ্বারা দেখি বটে; কিন্তু ঐ অন্তবানের অতীত অনন্ত অবশ্যই আছে। প্রত্যেক বিন্দুর অতীত আর এক বিন্দু থাকিবেই, ইহা একটি সাধারণ নিয়ম। যথার্থই শেষ বা অন্ত, এইরূপ একটি ভাব মনে উদয় হইলেই তৎক্ষণাৎ আর একটি ভাবও ঐ সঙ্গে উদ্ভিত হইবে যে, ঐ অন্তের অতীত অনন্ত বা অসীম কিছু থাকিবেই। তাহা না হইলে কিরূপে এ ভাব ও এ শব্দের উৎপত্তি হইল?

তুমি জিজ্ঞাসা করিবে, মানব পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা যদি অন্তবান্ পদার্থ জানিতে পারিল, তবে আর কি দিয়া “অনন্ত” জানিতে পারিবে?—এরূপ প্রশ্নে কি সার আছে? যখন মানব পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা অন্তবান্ জানিতে পারিল, তখন সেই জ্ঞান তাহাকে তৎক্ষণাৎ অনন্তের ধারণা আনিয়া দিবে। যে কোন পদার্থের অন্ত না দেখিতে পাইয়া মানব ভাবে, আমি উহা দেখিতে পারি না, তখন উহাই তাহার নিকট অনন্ত। পদার্থের অন্ত না দেখিতে পাইয়া যদিও আমরা উহার গণনা, তুলনা, পরিমাণ, বা কোন নামকরণ করিতে পারি না, তথাপি আমরা নিশ্চয়ই জানি যে, উহা অনন্ত ভূম্য কিছু হইবে। আমরা কেবল যে, অনন্ত বলিয়া কিছু জানিতে পারি, তাহা নহে, আমরা উহা অনুভবও করিয়া থাকি। আমাদের অনন্ত-বেষ্টিত চারি দিকে দৃষ্টি করিলে ওরূপ একটা ভাব মনে হয়। যথার্থ বলিতে হইলে

আমরা অদৃশ্য দেখিয়া থাকি, ইহারই নামান্তর অনন্ত। তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার, অদৃশ্য কিরূপে দেখা যাইবে? বাস্তবই অদৃশ্য দেখা যায়। অদৃশ্য দেখা যায়, একথা যদি সাধারণ-সম্মতির বিরুদ্ধ কথা হয়—তবে যে অদৃশ্য আসিয়া আমাদের চক্ষু কর্ণে আঘাত করে এবং উচ্চরবে বলি “এই আমি অদৃশ্য এখানে উপস্থিত”। ইহা চক্ষু, কর্ণ এবং দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি ও অন্তবান্ ইত্যাদির ন্যায়। এইভাবে সকলেই অনন্তও দর্শন করিয়া থাকে।

অনন্ত সম্বন্ধে ইহাই যথেষ্ট হইল না। মনে কর এক ব্যক্তি পর্বততাপরি, কিংবা বিস্তৃত সমধরাতলে, অথবা সমুদ্রপরিবেষ্টিত দ্বীপে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার মস্তকোপরি অনন্ত নীল আকাশ। এরূপ অবস্থায় তিনি কি এই গম্ভীর অনন্ত দৃশ্যে একবার,—আর বার পরক্ষণেই অন্তবান্ পদার্থ দেখিয়া বিস্মিত হইবেন না? তাঁহার অন্তরস্থ অনুজ্জল রেখার ন্যায় অন্তবানের পশ্চাৎ দেশে যে বিশাল বিস্তৃতি অনন্তের স্থলভূত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহারই নাম বিপুল অনন্ত।

আমরা এখন অনন্তরূপে ক্ষুদ্র কি, তাহাই বলিব। অনন্ত যে কেবল অন্তবানের বাহিরে পাওয়া যায়, তাহা নহে। অন্তবানের অভ্যন্তরেও উহা প্রাপ্য। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে এমন সূক্ষ্ম কোন পদার্থ নাই, যাহা তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর হইতে পারে না। আমরা কাল, সাদা ও আরও কতগুলি বর্ণ চিনি। এবং তন্মধ্যে এটা সাদা, ওটা কাল তাহাও চিনিতে পারি। কিন্তু কালোর কাল ধীরে ধীরে ক্ষয় পাইয়া কোথায় যাইয়া শেষে ধূসর হয়, এবং ঐ ধূসরের ধূসরতাই বা ক্রমে ক্ষয়িতহইয়া কোথায় যাইয়া পরিশেষে সাদা হয়, বল, কোন্ চক্ষে কোন্ যন্ত্রে এবং কোন উপায়ে এই ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়। আদৌ এই সকল নানা সুরঞ্জিত বর্ণ ছিল না। প্রথমে মাত্র দুইটা ছিল। অবশেষ একে আর মিলিয়া এতগুলি হইয়াছে। ইহা নিশ্চয় আমরা জানি যে, যদিও প্রাচীন মহাত্মারা নিয়ত আকাশ-পট দৃষ্টি করিতেন, তথাপি নীল (আকাশ) বর্ণের কথা বেদে, আবেস্তায়, বা মিশর-দেশীয়দের ধর্মগ্রন্থে উল্লিখিত হয় নাই। এইখানেই প্রকাশন বা প্রসারণ সম্বন্ধীয় উপপত্তি গোচরীভূত হয়।

এখন আমাদের ইহা বলায় কোন বাধা নাই যে, অন্তবান্ অনন্ত ছাড়া হইতে পারে না। এই অনন্তের ধারণা করিতে যাইয়া আমরা মানব জাতির ধর্মসম্বন্ধীয় বাবতীয় ঐতিহাসিক প্রসারণের উৎপত্তি দেখিতে পাই।

আমরা সচরাচর পণ্ডিতদিগকেও বলিতে শুনি যে, অন্তবান্ মন কদাপি অনন্তের ধারণা করিতে পারে না। সুতরাং যাহা আমাদের ধর্মগ্রন্থ-প্রতি-পাদিত, তাহাই বিশ্বাস করা ভাল। কিন্তু এরূপ মত এবং সংস্কারের জন্য আমরা আমাদের বুদ্ধির এবং আমাদের ধর্মপুস্তকের প্রশংসা করিতে পারি না। এতৎসম্বন্ধে গবেষণার ন্যায় আর কোন্ বিষয় সুবিধাজনক হইতে পারে ?

আমরা গবেষণাপরম্পরায় এরূপ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি যে, এখানে মানবের ঐরূপ বিশ্বাস নিতান্ত আবশ্যক, যে বিশ্বাস জ্ঞানলব্ধ এবং যে জ্ঞান মানবের সঙ্গে জাত। যে তেজোবলে অন্তবানের অন্তবাহী এবং অতীত অনন্তকে জানিতে পারা যায়, এই বিশ্বাসের অর্থ সেই তেজ।

আমাদিগের পূর্বপুরুষগণ অন্তবানের আগেই অনন্তের দর্শন পাইয়া থাকিবেন। পর্বত, নদী, বৃক্ষ, সূর্য্য, বৃষ্টি এবং বিদ্যুৎ বা বজ্র প্রভৃতিতে তাঁহারা অনন্তের ছায়া দেখিতে পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা এই অনন্তের কোন নাম রাখেন নাই। এই নাম দিবার পূর্বে তাঁহারা উহাকে অবশ্যই বজ্রধর, বর্ষক, তড়িৎদানয়নকারী, জীবনদাতা প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া থাকিবেন। তাহার পর যখন উহার সহিত আরও কিছু নিকট সম্বন্ধ বোধ করিয়াছিলেন, তখনই বোধ হয় বিধাতা, সম্রাট, রক্ষাকর্তা, রাজা, পিতা, প্রভু, কর্তা, ঈশ্বর, পরমেশ্বর, এবং কারণের কারণ, প্রভৃতি নামে উহা বিশেষিত করিয়াছেন। এই রূপে তাঁহাদের জ্ঞানদৃষ্টি প্রথর এবং বহুদর্শন ক্রমে প্রসারিত হইলে অবশেষে অনন্তকে তাঁহারা “অবি-নাশী” “অজ্ঞাত” এবং “অজ্ঞেয়” প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত উন্নত নাম দিয়াছিলেন।

ইহাতে কি বুঝিতে পারা যায় ?—এই বুঝিতে পারা যায় যে, মানব একযোগেই অনন্তকে জানিতে পারেন না, বুদ্ধি, বিবেক এবং বিশ্বাসের ক্রমিক বিকাশে তিনি উহা জানিতে পারেন। অনন্তকে জানিবার এই কয়ে-

কটা বৃত্তি হঠাৎ বা ক্রমে জাত হয় না। ইহা ক্রমিক এবং কালব্যাপি কৰ্ম-ফল মাত্র। প্রকৃতিতে যেমন সকল দ্রব্যই জন্মিয়া ক্রমে বড় হয়, ধর্মও ঠিক সেইরূপ ক্রমে বর্দ্ধিত এবং প্রসারিত হইয়াছে। ফলতঃ সকল জাতিরই ধর্মোৎপত্তির মূল এক—ইহার নাম “অনন্ত জ্ঞানেচ্ছা।” কিন্তু ধর্মভাবোৎপত্তির সম্বন্ধে নানা জাতির নানা মত দৃষ্ট হয়। আর্য্যজাতির ধর্মোৎপত্তি কিরূপে হইয়াছিল, গ্রন্থকার স্বয়ংই এ গ্রন্থে তাহা বিবৃত করিবেন। আমাদের যাহা জানিতে হইত, এইখানে তাহা জানিয়াছি যে, ধর্ম আছে, ধর্ম সম্ভাব্য, ধর্ম অনিবার্য্য। আরও জানিতে পারিয়াছি ধর্ম একটা ভঙ্গীল বীজে (অনন্তের ধারণা) অঙ্কুরিত হইয়া সহস্র সহস্র ব্যাপি কাল ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া, এখন এক পরম সুন্দর প্রকাণ্ড বৃক্ষাকারে দণ্ডায়মান হইয়াছে। এই সমুদয়কে আশাতীত বা দৈবায়ত্ত ঘটনা বলা যাইতে পারে না। যাহাহউক্ বেদ বা জুরথোন্তের সৃষ্টির পূর্বে বা জগৎ-পরিচিত মোজেসের কালেরও আগে ঈশ্বর আর্য্য পিতৃপুরুষগণকে প্রস্তুতীকৃত ধর্ম স্বয়ং উপহার দিয়াছিলেন, গ্রন্থকারের মতে ইহা কবিকল্পনাসুলভ অতিরঞ্জিত বর্ণনা। এই কাব্যসুলভ অতিরঞ্জন অনাবশ্যক বলিয়া বোধ হয় না। প্রয়োজন ব্যতীত কিছুই হয় না। সূতরাং এই অতিসুখপ্রদ অতিরঞ্জিত বর্ণনাকেও মন্দ বলা উচিত নহে। এই কবি-চিত্র মানবজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা না বলিয়া মানবজাতির শুদ্ধির উপায়ভূত বলিয়া মনে কবিত্তে হইবে কি না, ইহার উপর ইহজীবনের মুক্তির আশা স্থাপন করা উচিত কি না, অথবা জগতের ভ্রাতৃত্ব ভগ্ন করিয়া প্রতিবেশীর প্রতিকূল ধর্ম আমাদের মধ্যে স্থাপন করা সুবিবেচিত হইবে কি না, এ সকল প্রশ্ন স্বতন্ত্র কথা। পাঠকগণ আপনাপন জ্ঞান ও বহুদর্শিতা-বলেই ইহার সমুচিত উত্তর বুঝিয়া লইবেন।

শ্রীবহরামজী এম্, মানাবারী।

## মোক্ষমূলরের মতের সারাংশ ।

গ্রন্থকার ভাষা এবং ধর্মোৎপত্তিবিষয়ে অতি অসাধারণ মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার মত বিগত কি সম্ভবত এ বিষয়ের বিচার-ভার পাঠকগণের হস্তে ন্যস্ত রহিল। কিন্তু তদীয় অনুমিতি যে অতীব প্রতিভা-পূর্ণ, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বৃক্ষজীবনের উৎপত্তি (যাহাকে আদি কারণ বলা যায়) ক্ষুদ্র বীজ হইতেই হইয়া থাকে। তাহার পরে এই বৃক্ষ ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া শাখা, প্রশাখা, পত্র, পল্লব এবং ফল ফুলে সুশোভিত হয়। আমাদের বহুদর্শন-গুণে ইহা আমরা জানি। পদার্থবিদ্যানুশীলনে আমরা আর এই জানিতে পারি যে, ভৌতিক পদার্থ মাত্রই পরমাণু সংগঠিত। গ্রন্থকার বলেন যে, ভাষাও ঠিক এইরূপ ৪৫ শত কি ততোহধিক মূল ধাতুযোগে গঠিত। সুতরাং মানবে যাহা কিছু বলে—যাহা কিছু ভাবে, সকলই মুষ্টিমেয় কতিপয় ধাতু হইতে উৎপন্ন। এই ধাতুই সকল ভাষার মূল বা বীজস্বরূপ। এই সকল ধাতু মাত্রেরই যে পৃথক পৃথক ভাব আছে, তাহা নহে। ইহারা সাধারণতঃ এক শ্রেণীর বা এক বিষয়ের বহুভাব-বাচক। এই প্রাথমিক ভিত্তিমূলেই ভাষার গঠন বা সংস্থান হইয়াছে। গ্রন্থকার নির্দেশ করেন, ইংরেজী ভাষার (man) ম্যান ও সংস্কৃত মনুষ্য শব্দের উৎপত্তি মন বা মনু শব্দ হইতে হইয়াছে। মনুর অর্থ—চিন্তাকারী বা যে মনন করে। তিনি বলেন, মানবেই কেবল চিন্তা করিতে পারে। জন্তু চিন্তা করিতে পারে না। এইখানে ডারউইনের সহিত গ্রন্থকারের মতদ্বৈধ দেখা যায়। সর্বিদ্বান্ ডারউইন বলেন, মানব নিকৃষ্ট জীবের প্রসারণ মাত্র। বানর মানবাকারে উন্নত হইয়াছে। মোক্ষমূলর এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

এখন এই চারি পাঁচ শত মূল ধাতুর সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলেন যে, মানবের সঙ্গে সঙ্গে উহাদেরও জন্ম হয়। সাধারণ জীবজন্তু অপেক্ষা মানব বহুতর প্রকৃতিদত্ত গুণ সহকারে জন্মিয়াছে। উহা ইহারই অন্যতম। মানব-ভাষার বতই শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, ততই মূল ধাতুগুলি ক্রমে অন্তর্হিত হইয়াছে। ভাষার প্রারম্ভ-কালেই কেবল তাহাদের প্রয়োজন ছিল।

আবার গ্রন্থকারের মতে ইহাও অসম্ভব বোধ হয় না যে, সকল দেশের

ভাষারই সাধারণ উৎপত্তিস্থান এক। কেননা ইহা দেখা যায় যে, আৰ্য্য তুর্য্যগণ ও লৌমিতিকগণের ভাষার মূলধাতু পরস্পর সৌসাদৃশ্য-সম্পন্ন। এই তিনটি জাতি হইতেই মানবজাতির বৃহৎ তিন শ্রেণী গঠিত হইয়াছে। মনু (চিন্তা-কারী) সর্বপ্রথমে এই সকল মূল ধাতু ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা বলা হুষ্কর যে, কখন সংস্কৃত, জৈন, হিব্রু ও লাতিন ভাষার সৃষ্টি হয়, এবং উহারা ঐ সকল মূলধাতু যোগেই গঠিত কি না। প্রতীচ্য এবং পাশ্চাত্যগণের অনেকগুলি আধুনিক ভাষা এই কয়েকটি প্রধান ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ঐ আদি ভাষা কয়েকটির উৎপত্তিকাল নির্ণয় করা ঘাইতে পারে না।

ভাষা সম্বন্ধে যে মত, গ্রন্থকারের, ধর্মোৎপত্তি সম্বন্ধেও সেইরূপ মত। ধর্মেরও উৎপত্তি অতি ক্ষুদ্র একটা মূল হইতে হইয়াছে। ঐ মূলই—‘মান-বের সতেজ উদ্দীপনা’। ইহারই বলেই মানব অনন্ত কি তাহা জানিতে পারে। এ বিষয়ে পূর্বে বিস্তার বিবৃত হইয়াছে।

পাঠকগণের ইহা জানা উচিত যে, গ্রন্থকার, বলেন, জড়োপাসনা ধর্মের প্রথম আকার বা আভাস নহে। এবিষয়ে তিনি অনেক বাদানুবাদ করিয়াছেন (তাহার গ্রন্থের ৫৩ হইতে ১২৮ পৃষ্ঠা পাঠ কর)

গ্রন্থকার সংস্কৃতে তাহার নাম “মোক্ষমূলর ভট্ট” লিখিয়া থাকেন। আমরা তাহার মূল নাম “মাক্ষ মূলর” বলিয়া জানি। সংস্কৃত অনুসারে মোক্ষমূলর নাম (মক্শমূলর) স্বাভাবিক এবং মনোমদ হইয়াছে এবং ইহাতে নাম-নির্মাণতার প্রতিভাও বিকাশ পাইয়াছে। আমরা যদি “মক্শমূলর” শব্দের ব্যাখ্যা করি, তবে এইরূপ হইবে যথা—“মক্শ” অর্থ মুক্তি বা আত্মার স্বাধীনতা, আর, “মূলর” অর্থ অধিবাসী। গ্রন্থকার যেন ব্রহ্মানন্দ নামে দীক্ষিত হইয়াছেন।

শ্রীবহরামজী এম্, মালাবারী।

### মোক্ষমূলরের সংক্ষিপ্ত জীবনী ।

সুপণ্ডিত মোক্ষমূলর ১৮২৩ খ্রীঃঅব্দে জন্মগীর অন্তর্গত দেশান নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম উলহেম্ মূলর। ইনি একজন সুবিখ্যাত কবি ছিলেন। তাঁহার মাতৃকুলও সাতিশয় সম্ভ্রান্ত। মোক্ষমূলর বাল্যকাল হইতেই অতি শ্রমপটু এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি বলিয়া খ্যাত ছিলেন। সঙ্গীত-শাস্ত্রে তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল। ১৮৪৩ খ্রীঃঅব্দে অর্থাৎ বিংশতি বৎসর বয়সে তিনি লিপ্‌জিক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে “ডাক্তার অব্ ফিলজফি” উপাধি পান। এইখানে তিনি হিব্রু, আরবি ও সংস্কৃত শিক্ষা করেন। পর বৎসর, সিলিং এবং বপ্ নামক বিখ্যাত অধ্যাপকদ্বয়ের উপদেশ পাইবার আশায় জন্মগীর প্রধান নগর বর্লিনে গমন করেন। এই খানে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত হাম্বল্ট্‌ও বিকের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। মোক্ষমূলর বর্লিনে সুবিজ্ঞ রক্তের সহিত পারস্য ভাষা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন।

ইহার পর ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক উজিন্ বর্গুফের সুখ্যাতি শুনিতে পাইয়া মোক্ষমূলর ১৮৪৫ খ্রীঃঅব্দে পারী নগরে গমন করেন। বর্গুফ্ তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে “ঋগ্বেদ সংহিতা” মুদ্রিত করিবার জন্ত উত্তেজনা করিতে লাগিলেন। তদনুসারে তিনি ১৮৪৬ খ্রীঃঅব্দে ইংলণ্ডে আসিয়া ঋগ্বেদসংহিতা মুদ্রণের সমস্ত আয়োজন করিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ব্যয়ে উহা অক্সফোর্ড নগরে মুদ্রিত হইতে লাগিল। গ্রন্থের স্তম্ভাবধান জন্য মোক্ষমূলর নিজেও ঐ স্থানে থাকিলেন। ইংলণ্ডে ঘাতীত এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের স্থান আর ছিল না। ধন্য ইংলণ্ড! তুমিই বিদ্যার যথার্থ প্রতিপোষক।

১৮৫৪ খ্রীঃঅব্দে মোক্ষমূলর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাসমূহের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। ১৮৬৮ খ্রীঃঅব্দে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব শিক্ষার একটা নূতন শ্রেণী স্থাপিত হইল, তিনি উহার অধ্যাপকতা গ্রহণ করিলেন।

মোক্ষমূলর ১৮৪০ খ্রীঃঅব্দে তাঁহার সংস্কৃত ভাষার প্রথম অনুবাদ-গ্রন্থ হিতোপদেশ মুদ্রিত করেন। পরে ১৮৪৩ অব্দে জার্মান ভাষায় কালিদাসের মেঘদূত



অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। এই অনুবাদে মূল সংস্কৃত ছন্দ জর্মন ছন্দে পরিণত করিয়াছিলেন। ইহাতে যে, তাঁহার প্রতিভার কেবল যশোগৌরব ঘোষিত হইয়াছিল তাহা নহে, জর্মন ও সংস্কৃত ভাষায় কত দূর সম্বন্ধ, তাহা এই উপলক্ষে বিশিষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছিল। ১৮৫৯ অব্দে তাঁহার রচিত সুবিখ্যাত “প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস” মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়।

১৮৬১ খৃঃ অব্দে মোক্ষমূলর “ভাষা-বিজ্ঞানের প্রবন্ধ” নামে একখানি পুস্তক লিখিতে প্রবৃত্ত হন। এই পুস্তকে নয়টি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত ছিল। তৎসঙ্গে আর দ্বাদশটি প্রবন্ধ যোগ হইলে গ্রন্থখানি পরিসমাপ্ত হয়। ১৮৬৪ অব্দে উহা প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ জর্মন, ফরাসী, ইতালীয় ও রুষীয় প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মহামতি মোক্ষমূলরের স্বরচিত এত গ্রন্থ আছে যে, এস্থলে তৎসমুদয়ের পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে না।

মোক্ষমূলর “ঋগ্বেদ সংহিতা” ছয় খণ্ড প্রচার করেন। ইহা তাঁহার জীবনের একটি প্রধান কার্য্য বলিতে হইবে। এই ছয় খণ্ড পুস্তক ১৮৪৯ হইতে ১৮৭৫ অব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়। সুপণ্ডিত ডাক্তার মার্টিন হোগ্ এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। ইহার পর ১৮৬২ অব্দে পুনরায় প্রায় ৭০০ ব্রাহ্মণ সভা করিয়া এই গ্রন্থের পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইহার সুখ্যাতি করিয়া কহিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের নিকট যে হস্তলিখিত গ্রন্থ আছে, ইহা তাহা অপেক্ষা সম্পূর্ণ। এমন কি তাঁহারা এই অভিনব গ্রন্থের সাহায্যে আপনাপন হস্তলিখিত গ্রন্থের পাঠ সংশোধন করিয়া লইয়াছিলেন।

এই ঋগ্বেদ সংহিতার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অল্পকাল মধ্যে দুই সহস্র পৃষ্ঠা পরিমিত আর একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক লিখেন। ইহার নাম “চিপস্ ফ্রম জর্মন ওয়ার্ক্ সপ্”। সাধারণ পাঠকবর্গ এই অসাধারণ শ্রমের বিষয় ভাবিলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইবেন।

মোক্ষমূলর এখন আর একটি প্রধান কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি এখন প্রাচ্য পবিত্র গ্রন্থাবলী নামে কতকগুলি পুস্তক প্রকাশ করিতেছেন। ইহাতে ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, পারসিক, চিন এবং মহম্মদীয় ধর্ম গ্রন্থাদি সন্নিবেশিত হইতেছে। ইহার এক এক খণ্ড এক এক জন অতিপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কর্তৃক



লিখিত হইলে, মোক্ষমূলর স্বয়ং সংশোধন করিয়া প্রকাশিত করিতেছেন।  
সর্বশুদ্ধ ২৪ খণ্ডে ইহা পরিসমাপ্ত হইবে।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের সুবিখ্যাত গ্রন্থকার কবির পুত্র।  
তিনি স্বয়ংও এক জন কবি। যদিও তিনি কোন স্বতন্ত্র কবিতা-গ্রন্থ লিখেন  
নাই, তথাপি তাঁহার অতি গ্রন্থে সুধাময় কবিত্বের আভাস দেখা যায়। তিনি  
অতি গুরুতর বিষয় লইয়া গ্রন্থাদি লিখেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভাষা যেমন,  
সুন্দর, তেমনি সরল ও কবিত্বময়। অন্যান্য লেখকদের ন্যায় সত্য বিনির্গম  
সম্বন্ধে নিজের জ্ঞানাভাব, সুবিন্যস্ত ভাষায় কখনও প্রচ্ছন্ন রাখিতে  
তাঁহার চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রন্থকারের প্রকৃতি এমন সহিষ্ণু  
এবং সহানুভূতিপর যে, তিনি বৃথা বাদানুবাদ ভালবাসেন না। তিনি  
বলেন, যত নিকৃষ্ট ধর্মই হউক না কেন, তাহাতে কিঞ্চিৎ সত্যের ভাব অবশ্য  
থাকিবে। ইহাই তাঁহার প্রতিভার প্রকৃতি। কিন্তু যদি কখন তাঁহাকে  
কোন বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তখন তিনি যত বড় লোকই প্রতিদ্বন্দ্বী  
হউন না কেন, কাহাকেও ভয় করেন না। অথবা কখন তাঁহাকে আক্রমণ-  
ভয়ে পশ্চাৎপদ হইতে দেখা যায় না।

ইউরোপ প্রদেশে যত পণ্ডিত-সমিতি আছে, মোক্ষমূলর তৎসমুদয়েরই  
একজন সদস্য। তিনি ফ্রান্সিয়ার নাইট। তিনি ইংলণ্ডের প্রিয়তম পুত্র-  
রত্ন। তথাকার প্রধান ব্যক্তিগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে চাহেন না। তিনি  
ইংলণ্ডের উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত দলের মধ্যে একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। ইংলণ্ডের  
সুবিজ্ঞ ও সম্ভ্রান্তগণ তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিতে আপনাদিগকে  
সম্মানিত এবং সৌভাগ্যবান্ মনে করেন। তিনি ইংলণ্ডে না জন্মিলেও এরূপ  
সুন্দর ইংরেজী লিখেন ও বলেন যে, তাহাতে ইংলণ্ডের অধিবাসিগণের আর  
বিস্ময়ের সীমা নাই। সহস্র সহস্র পণ্ডিত এবং লক্ষ লক্ষ ছাত্র তাঁহার  
স্তুতিগায়ক।

মোক্ষমূলরকে দার্শনিক বিজ্ঞানের নেতা বলিয়া অভিহিত করিলে বোধ  
হয়, অসঙ্গত হয় না। এই নূতন মহোপকারক বৈজ্ঞানিক তর্কে তাঁহার  
সমকক্ষ আর কেহই নাই। ভাষা-বিজ্ঞানে এবং ধর্ম-বিজ্ঞানে তিনি যে,  
প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়।

তাঁহার “হিবার্ট বক্তৃতায়” (যাহার বিবরণ পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে) গভীর  
পাণ্ডিত্য এবং অসাধারণ ক্ষমতার বিকাশ হইয়াছে। এই বক্তৃতা তিনি তাঁহার  
পরলোকগতা কন্যার নামে নিম্নলিখিত করুণরসোদ্দীপক কথায় উৎসর্গ  
করিয়াছেন :—

“যাহার স্নেহ-স্মৃতি আমাকে এই বক্তৃতা লিখনে উৎসাহিত, চালিত এবং  
আশ্রয়দান করিয়াছে, তাঁহারই নামে, পিতৃস্নেহের নিদর্শনস্বরূপ এই  
বক্তৃতা-নিচয় উৎসর্গীকৃত হইল”

শ্রীবহরামজী এম্, মালাবারী

---

## সূচী ।

ভারতের প্রাচীন সাহিত্য এবং তাহা হইতে ধর্মের উৎপত্তি  
সম্বন্ধীয় বিবরণ জানিবার জন্য উপকরণ  
যতদূর সংগৃহীত হইয়াছে ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
গ্রন্থক ধর্মালোচনার আবশ্যকতা ... ..	১
গিহদী এবং পারসিক প্রভৃতির ধর্মভাবের উৎপত্তি ... ..	২
ভারতে ধর্মের উৎপত্তি ... ..	৪
ধর্ম-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বেদের উপযুক্ত স্থান ... ..	৫
সংস্কৃত সাহিত্যের আবিষ্কার ... ..	৬
বৌদ্ধ ধর্ম ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের মধ্যবর্তী সীমা	৬
বেদ ঈশ্বর-প্রচারিত বলিয়া উদ্ঘোষিত ... ..	৯
বৈদিক ভাষার ঐতিহাসিক প্রকৃতি ... ..	১৫
বৈদিক সাহিত্যের চারিটি স্তর ... ..	১৭
১ম । সূত্রকাল ৫০০ খ্রীঃ পূঃ ... ..	১৭
২য় । ব্রাহ্মণকাল ৬০০—৮০০ খ্রীঃ পূঃ ... ..	২০
৩য় । মন্ত্রকাল ৮০০—১০০০ খ্রীঃ পূঃ ... ..	২১
৪র্থ । ছন্দকাল ১০০০ খ্রীঃ পূঃ ... ..	২২
বেদ জনশ্রুতিক্রমে আগত ... ..	২৩
পূর্ব প্রস্তাবের পরিশিষ্ট ... ..	২৯

### স্পৃশ্য, ঈষৎ স্পৃশ্য এবং অস্পৃশ্য পদার্থের আরাধনা

ধর্মের প্রমাণ কদাপি সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে ... ..	৩৭
বাহ্য প্রকটিকরণ ... ..	৫৮
অন্তর প্রকটিকরণ ... ..	৩৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইন্দ্রিয়গণ ও তৎসমুদয়ের সাক্ষ্য ... ..	৪১
প্রত্যক্ষ শব্দের অর্থ... ..	৪২
ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের স্পৃশ্য এবং অর্ক-স্পৃশ্য এই দুই বিভাগ ...	৪৩
বৃক্ষ ... ..	৪৩
পর্বত ... ..	৪৪
নদী ... ..	৪৫
পৃথিবী... ..	৪৫
ঈষৎ স্পৃশ্য পদার্থ ... ..	৪৬
অস্পৃশ্য পদার্থ ... ..	৪৭
দেবতাদিগের প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রাচীনগণের প্রমাণ ... ..	৪৮
বেদের প্রমাণ ... ..	৪৯
আর্য্যভাষা যে অবিভক্ত তাহার প্রমাণ ... ..	৫০
ভাষার উৎপত্তি ... ..	৫১
আদি কল্পনা ... ..	৫২
সকল পদার্থই সাক্ষ্যক বলিয়া অভিহিত ... ..	৫৩
সাক্ষ্যক শব্দ মানব অর্থবাচক নহে ... ..	৫৪
ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় লিঙ্গ ... ..	৫৫
সহকারী ক্রিয়াপদ ... ..	৫৬
As—নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করা ... ..	৫৭
ভূ হওয়া ... ..	৫৭
বস্ বাসকরা ... ..	৫৮
আদিম ভাব ব্যক্তি... ..	৫৮
আদিম কালে সাদৃশ্যের অপেক্ষা ... ..	৫৮
চলিত বিশেষণ ... ..	৬০
বৈদিক দেবগণের মধ্যে স্পৃশ্য পদার্থ ... ..	৬৩
বৈদিক দেবগণের মধ্যে ঈষৎ স্পৃশ্য পদার্থ ... ..	৬৪
অগ্নি ... ..	৬৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
সূর্য্য ... ..	৭১
ঊষা ... ..	৭২
বৈদিক দেবতাগণের মধ্যে আরাধ্য পদার্থ...	৭২
বজ্র ... ..	৭৩
বায়ু ... ..	৭৩
মকুৎ ... ..	৭৪
বৃষ্টি ও বর্ষণকারী ... ..	৭৪
বৈদিক বিশ্বদেবকুল ... ..	৭৫
দেবতাগণ ... ..	৭৬
দৃশ্য ও অদৃশ্য ... ..	৭৭

### অসীমত্ব ও বিধির সম্বন্ধে ধারণা।

বেদোক্ত দেববংশ ... ..	৮৫
অনন্ত শব্দের আদিম ধারণা ... ..	৮৬
অদিতি বা অনন্ত ... ..	৮৭
অদিতি আধুনিক দেবতা নহে...	৮৮
অদিতির স্বাভাবিক উৎপত্তি ... ..	৮৯
অন্ধকার ও পাপ ... ..	৯১
অমরত্ব... ..	৯২
বেদে অপরাপর ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ভাব বা ধারণা ... ..	৯৩
নিয়মের সম্বন্ধে ধারণা ... ..	৯৫
সংস্কৃত ঋত ... ..	৯৭
ঋত শব্দের আদিম অর্থ ... ..	৯৯
সরমার উপাখ্যান ... ..	১০০
ঋত, যজ্ঞ বা হোম... ..	১০৪
ঋত শব্দের পরিপুষ্টি ... ..	১০৪
অমুবাদ করিবার কাঠিন্য ... ..	১০৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
ঋত শব্দ আখ্যাদিগের একটি সাধারণ কল্পনা কি না ...	১০৬
ঋত জেন্দ ভাষায় অর্থ ...	১০৮

## ইষ্টেশ্বরবাদ, অনেকেশ্বরবাদ, একেশ্বরবাদ ও নিরীশ্বরবাদ ।

একেশ্বরবাদ ধর্মের আদিম অবস্থা কি না ...	১১২
ভাষা-বিজ্ঞান ও ধর্ম-বিজ্ঞান ...	১১৩
ঈশ্বরের বিশেষণ ...	১১৫
বেদ-দত্ত নব উপকরণ ...	১১৬
ইষ্টেশ্বরবাদ ...	১১৬
সূর্যের প্রাথমিক অবস্থা ...	১১৭
সূর্যের অট্টনসর্গিক শক্তি কল্পনা ...	১২০
সূর্যের দ্বিতীয় অবস্থা ...	১২৬
দ্যৌঃ বা দীপ্তিকারক ...	১৩০
দ্যৌঃ ও ইন্দ্রের মধ্যে প্রাধান্য লইয়া বিরোধ ...	১৩২
শ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া ইন্দ্রের স্তোত্র ...	১৩৪
শ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া বরুণের স্তোত্র ...	১৩৭
ইষ্টেশ্বরবাদ ধর্মের বাক্কাল ...	১৩৯
ভিন্ন ভিন্ন দেবতার প্রাধান্য ...	১৪০
ইষ্টেশ্বরবাদের পরিপুষ্টি ...	১৪২
একেশ্বরবাদের উপক্রম ...	১৪৫
বিশ্বকর্মা ...	১৪৬
প্রজাপতি ...	১৪৭
নিরীশ্বরবাদের উপক্রম ...	১৫০
ইন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও ইন্দ্রের প্রতি সংশয়...	১৫২
প্রকৃত ও সাধারণ নাস্তিকতার প্রভেদ ...	১৫৫

## দর্শনশাস্ত্র ও ধর্ম ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
দেবগণের তিরোধান ...	২৬১
স্বর্গীয় নামের উদ্দেশ্য ...	১৬২
ক্লীবলিঙ্গ নাম পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ নাম হইতে মহৎ ...	১৬৩
অস্তুরাত্মা ...	১৬৪
বাহ্যাত্মা ...	১৬৫
উপনিষদের দার্শনিক ভাব ...	১৬৭
প্রজাপতি ও ইন্দ্র ...	১৬৮
সপ্তম খণ্ড ...	১৭০
অষ্টম খণ্ড ...	১৭২
নবম খণ্ড ...	১৭৩
দশম খণ্ড ...	১৭৪
একাদশ খণ্ড ...	১৭৫
দ্বাদশ খণ্ড ...	১৭৬
যাজ্ঞবল্ক ও মৈত্রেয়ী ...	১৭৭
যম ও নচিকেতা ...	১৮২
উপনিষদের ধর্ম ...	১৮৭
বৈদিক ধর্মের পরিপুষ্টি ..	১৮৮
চারি জাতি ...	১৯০
চারি আশ্রম ...	১৯১
প্রথম আশ্রম, ব্রহ্মচর্য ...	১৯২
দ্বিতীয় আশ্রম, গার্হস্থ্য ...	১৯৪
তৃতীয় আশ্রম, বানপ্রস্থ্য ...	১৯৬
আরণ্য জীবন ...	২০০
উপসংহার ...	২০৫
ধর্মচিন্তার অবস্থা ...	২০৭
পূর্ববিষয়ের আলোচনা ...	২১৭





# ধর্মের উৎপত্তি ও উন্নতি ।



ভারতের প্রাচীন সাহিত্য এবং তাহাহইতে ধর্মের উৎপত্তি-  
সম্বন্ধীয় বিবরণ জানিবার জন্য উপকরণ

যতদূর সংগৃহীত হইয়াছে ।

আফ্রিকা, অমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের সৃষ্টির তিন চারি  
যুগ পরে ঐ সকল দেশে ধর্মের যেরূপ প্রকৃতি ছিল, সেই অবস্থা লক্ষ্য  
করিয়া উহার ক্রমোৎকর্ষ কল্পনা করতঃ কোন সম্পূর্ণ গঠিত ধর্মের সহিত  
তুলনা করিলে ধর্মের সৃষ্টি, উৎপত্তি ও উন্নতি কিরূপে হয়, বুঝা যায় বটে,  
কিন্তু এরূপ চেষ্টার ফল সহজ-সিদ্ধ নহে । সুতরাং ঐ প্রণালীতে ধর্মের  
উৎপত্তি জানিবার চেষ্টা না করিয়া, এমন কোন দেশের বিষয়ে ঐ চেষ্টা করা  
ভাল—যে দেশে ধর্মের কেবল যে আদি, অন্ত ও ক্ষয় উপলব্ধি হয়,  
তাহা নহে । যেখানে অন্ততঃ ধর্মসম্বন্ধে বর্তমান অবস্থার পূর্বসূর কয়েকটীও  
দেখা যায় ।

অসভ্য জাতির ধর্মতত্ত্ব অনুশীলন করা যেরূপ কঠিন কার্য, উপস্থিত  
বিষয়ের অনুশীলন করাও যে সেইরূপ কঠিন, তাহা বলা বাহুল্য । সুতরাং  
সামান্য যে ক্ষেত্রে ব্রতী হইতেছি, তাহাতে শ্রম অগাধ হইলেও মূল্যবান ফল  
লাভের আশা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে ।

ধর্মের ঐতিহাসিক বিষয় অবলম্বন করিলেও সম্যক কৃতকার্য হইতে  
পারা যায় না । পদে পদে বাধা বিঘ্ন । যেখানে কিছু কাণ্ডের কথা,  
সেই খানেই গোল, যেখানে আসিলে মূলদেশ পাইবার ভরসা জন্মে, সেই  
খানেই নৈরাশ্য । ইহা একপ্রকার অনিবার্য ।

কোন ধর্মই প্রারম্ভ-কালে এককালে চতুষ্পার্শ্ববর্তী জন-সমাজের চিত্ত  
আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয় না । ঐ অভিনব ধর্ম যতদিন কেবল

প্রবর্তকের হৃদয়ে অথবা তদীয় ক্ষুদ্র শিষ্য-দলমধ্যে আবদ্ধ হইয়া, অতি সংকীর্ণ অবস্থায় থাকে, ততদিন কেহই তাহার মহিমা গ্রাহ্য করে না। একথা ব্যক্তিগত ধর্ম অপেক্ষা জাতীয় ধর্মের প্রতি অধিকতর প্রযুক্ত হইতে পারে। কোন খ্যাতনামা ব্যক্তির প্রবর্তিত ধর্মের নামই ব্যক্তিগত ধর্ম। আর যাহা সমস্ত লোকের চোঁটায় ও একতায় গঠিত এবং উন্নত, তাহাকেই জাতীয় ধর্ম কহে। জাতীয় ধর্ম, ধর্ম বলিয়া বাচ্য হইতে এবং তাহার বিধান সকল ধর্মাস্তর্গত ক্রিয়া কাণ্ড রূপে গৃহীত হইতে বহুকাল লাগে। ইহার সংজ্ঞা কি নাম কিছুই থাকে না। যখন কোন ধর্ম সাধারণ্যে সংগত ও প্রয়োজনীয় বলিয়া আদৃত ও গৃহীত হইতে থাকে, যখন ভবিষ্যতের জন্য সেই ধর্মের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে ব্যক্তিবিশেষ কিংবা সকলেরই উৎসুক্য জন্মে, এবং তাঁহারা যখন উহার উৎপত্তি এবং প্রথম প্রচারের বিবরণ, যাহা কিছু পারেন, লিখিয়া রাখিতে থাকেন, তখনই তাহাকে প্রকৃত পক্ষে আমরা ধর্ম বলিয়া জানিতে পারি। সুতরাং মানব প্রকৃতির সাধারণ নিয়মেই ধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় বিবরণ প্রায় সমস্তই কাল্পনিক গল্প পূর্ণ হইয়া উঠে। যাহাকে প্রকৃত ঐতিহাসিক বিবরণ বলা গিয়া থাকে, উহা তাহা নহে।

## যিহুদী এবং পারসিক প্রভৃতির ধর্মভাবের

### উৎপত্তি।

নব-প্রতিষ্ঠিত ধর্মের সর্বদো জীবন্ত ভাব কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না; গেলেও কোন কোন দেশে ধর্মভাবের ক্রমোন্নতি দেখা যায়। আফ্রিকা, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্যদিগের মধ্যে এইরূপ হওয়া অসম্ভব। বর্তমান কালে তাহাদের যে ধর্ম কি, অবধারণ করা সুকঠিন। তাহা আদিম অবস্থার অথবা সহস্র বৎসর পূর্বেই বা কেমন ছিল, তাহা এক প্রকার আমাদের ধারণার অতীত।

এইরূপ গ্রন্থভুক্ত ধর্ম মাত্রেরি ঠিক এইরূপ অবধারণ-কাঠিন্য লক্ষিত হইয়া থাকে। যিহুদীদিগের ধর্মের উৎপত্তি ও অবনতির লক্ষণ

দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহা বিশেষ প্রাধান্য সহ পর্যালোচনা করিতে হয়। ঐ সকল লক্ষণ প্রচার না করিয়া বরং গোপনে রাখাই যেন প্রাচীন টেইমেন্ট-লেখকদিগের অভিপ্রেত ছিল বলিয়া, বোধ হয়। তাহারাই যিহুদীদিগের ধর্ম আমাদের সমক্ষে এই ভাবে উপস্থাপিত করিতে ইচ্ছা করেন যে, তাহা আদি হইতেই সুগঠিত, সম্পূর্ণ, অভ্রান্ত এবং এত উন্নত যে, আর উন্নতি সম্ভব নহে। কেন না স্বয়ং ঈশ্বরই তাহার প্রচার-কর্তা। যিহুদীগণ যে একেশ্বরবাদী হইবার পূর্বে বহু দেবতার আরাধনা করিত, তাহা পণ্ডিতমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। তাহাদের ধর্ম-পুস্তকেই হোমের দুইটা ধারা নিবন্ধ রহিয়াছে। একটা লেবিটিকসে আর একটা উদ্গাতার কথায়। এই দুইটা পরম্পর-বিরোধী এবং বিসংবাদিত মত হইতে কি এ সম্বন্ধে আর অধিক প্রমাণ চাই? বলির সম্বন্ধে লেখা আছে, “বলি আপনার প্রীতিকর নহে, নচেৎ তাহাই আমি অর্পণ করিতাম। আপনি হোমেও প্রীত নছেন, সন্তুষ্ট আত্মাই ঈশ্বরের প্রকৃত বলি। হে ঈশ্বর! আপনি সন্তুষ্ট ও অনুতপ্ত হৃদয়কে ঘৃণা করিবেন না।”

ধর্ম-পাঠকগণের নিকট ঈশ্বর-প্রচারিত ধর্মের উৎপত্তি ও প্রকৃতি অবধারণ করা যত কঠিনই বোধ হউক না কেন, এখানে উন্নতিই লক্ষিত হইতেছে।

মুসার ধর্ম-সম্বন্ধে যাহা বলা যায়, জরথুষ্ট্র-প্রণীত ধর্ম-সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই বলা যাইতে পারে। ইহা স্বয়ং অসুরমসজদা কর্তৃক প্রচারিত ও জরথুষ্ট্র কর্তৃক উদ্বোধিত এবং প্রথম হইতেই সুসম্পন্ন ধর্মগ্রন্থ বলিয়া কথিত। সুদক্ষ পণ্ডিতগণের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য-বলে কেবল গাথা হইতে কিছু পুরাতন সামগ্রী আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহা ব্যতীত অবস্থাভেদেও প্রকৃত উন্নতির বিশেষ চিহ্ন অতি বিরল।

গ্রীস এবং ইতালির ধর্ম ও পুরাণ আলোচনা করিলেও উহার বাল্য, যৌবন ও প্রৌঢ়কালের প্রভেদ নির্ণয় করা সুকঠিন হইয়া থাকে। হোমরের পরবর্ত্তী লেখকগণের গ্রন্থে এরূপ অনেক ভাব আছে যে, তাহা হোমরে লক্ষিত হয় না। কিন্তু তাহা বলিয়া ঐ সকল ভাব যে পরে সৃষ্ট হইয়াছে, কি তাহা অন্যভাবে অনুসারী, একথা কখনই বলিতে পারা যায় না। কোন

প্রবাদ কোন একটি জাতির মধ্যে প্রচলিত থাকিতে পারে, কোন দেবতা কোন একটি স্থানে প্রধান বলিয়া সম্পূর্ণ হইতে পারেন, এই সকল বিষয় কোন আধুনিক কবির গ্রন্থে পাঠ করিয়া আমরা উহার আধুনিকত্ব সপ্রমাণ করিতে পারি না। এতদ্ব্যতীত গ্রীক ও রোমকদিগের ধর্ম্ম-লোচনার সম্বন্ধে বিশেষ অসুবিধা এই যে, তাহাদের মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্ম-পুস্তক বলিবার যোগ্য, কোন গ্রন্থ নাই।

### ভারতে ধর্ম্মের উৎপত্তি।

ভারতে ধর্ম্মের উৎপত্তি ও উন্নতি জানিবার যেমন সুবিধা, তেমন সুবিধা আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। আমার মতে এতদেশের ধর্ম্মের ক্রমোন্নতি জানিবার সুবিধা যত অধিক, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ইতিহাস জানিবার সুবিধা তত নহে। যেহেতু প্রকৃত ইতিহাস শব্দে যাহা বুঝায়, তাহা ভারতীয় সাহিত্যে একপ্রকার নাই বলিলেই হয়। কিরূপে ধর্ম্মচিন্তা এবং ধর্ম্মভাষার বিকাশ প্রাপ্তি হয়, কিরূপে উহা শক্তি-সম্পন্ন হইয়া উঠে, এবং কিরূপে উহা মুখ হইতে মুখান্তবে, মন হইতে মনান্তরে, গতির সঙ্গে সঙ্গে মূল উৎসের সহিত ঈষৎ সংশ্রব রক্ষা করিয়া, ক্রমে আকার পরিবর্তন পূর্বক আপনার গতি প্রসারিত করে, তাহা ভারতে অনুশীলন করিবার এবং জানিবার যেমন সুবিধা, আর কোথাও তেমন নহে।

ভাষার উৎপত্তি ও উন্নতি জানিবার সম্বন্ধে ভারত-ভাষা “সংস্কৃতের” প্রসাদে যেরূপ আশ্চর্য্য ও অভাবনীয় আনুকূল্য পাওয়া গিয়াছে, ধর্ম্মের উৎপত্তি ও উন্নতির অনুশীলনেও ভারতের ধর্ম্ম-সংহিতা সকল হইতেও যে সেইরূপ আনুকূল্য পাওয়া যায়, ইহা বলিলে বোধ হয় আমাকে অতিশয়োক্তি দোষে দূষিত হইতে হইবে না। সুতরাং ধর্ম্মের উৎপত্তি ও উন্নতির সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণাদি আমি প্রাচীন ভারতের ধর্ম্ম-গ্রন্থ হইতে নির্বাচিত ও উদ্ধৃত করিয়াছি। জীবিতকাল ব্যাপিয়া ভারতীয় ধর্ম্ম-গ্রন্থ সকল পাঠে এই উপপত্তি আমার মনে উদয় হইয়াছে।

আমার উপপত্তি এখন কেবল ঘটনার উপর অবস্থিত রহিয়াছে, এবং আমি উহার প্রকৃত ব্যাখ্যার জন্য দায়ী রহিয়াছি।

### ধর্ম-বিজ্ঞান-সম্বন্ধে বেদের উপযুক্ত স্থান।

ভারতে ধর্মের উৎপত্তি ও উন্নতি যেরূপে হইয়াছে, আর সকল স্থানেও যে, সেইরূপ হইয়াছে ইহা বলা আমার অভিপ্রেত নহে। ভাষাতত্ত্বের গূঢ় প্রস্তাবলির মীমাংসা করিতে হইলে, ভাষা-বিজ্ঞান-পাঠকের যে সংস্কৃত ভাষা সুন্দররূপে অধ্যয়ন করা আবশ্যিক, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। অপরূপ ভাষায় যে যে উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে হইলে সংস্কৃত ভাষার উপায়গুলির সহিত উহাদিগের তুলনা করা অপেক্ষা আর কিছুই অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু বপ্ সাহেব যেরূপ মালয়, পোলিনেশীয় ও ককেশীয় প্রভৃতি ভাষায় সংস্কৃতের মূল অন্বেষণ করিয়াছেন, সেইরূপ করা, অথবা আর্য ভাষায় যে যে বৈয়াকরণিক উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, কেবল তাহাই যে মানব-ভাষার অভিপ্রেত বিষয় সম্পাদনের এক মাত্র উপায়, তাহা মনে করা বিষম ভ্রম।

মানব জাতির ধর্ম সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিতে যাইয়া, যাহাতে আমাদের ঐক্য ভ্রম-প্রমাদে পতিত না হইতে হয়, তদ্বিষয়ে পূর্ব-সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। প্রাচীন ভারতবাসিগণ কিরূপে ধর্মভাব সকল লাভ করেন, কিরূপে তাহা উন্নত ও সম্প্রসারিত করিয়া তুলেন, কিরূপে পরিবর্তিত ও শেষে কলুষিত করেন, তাহা আমরা একপ্রকার বুঝিতে পারিয়াছি। অপরূপ জাতির ধর্মভাব সকলও যে এইরূপ প্রাপ্ত হইতে এইরূপ নানা অবস্থা অতিক্রম করিয়াছে, তাহাও অনুমান করিয়া লইতে পারা যায়। তাহা বলিয়া, যাহারা আফ্রিকা, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্য জাতিগণের মধ্যে জড়োপাসনা দেখিয়া স্থির করিয়াছেন যে, অসভ্য জাতি মাত্রই ঐ জড়োপাসনা হইতে ধর্ম চর্চা আরম্ভ করিয়াছে, তাঁহাদের ন্যায় আমি ভ্রমে পতিত হইব না।

এইক্ষেণে দেখা যাউক যে, ভারতের আদিম উপনিবেশিদিগের মধ্যে ধর্মের উৎপত্তি ও উন্নতির বিষয় পর্যালোচনা করিতে হইলে যে যে লিখিত প্রমাণ আবশ্যক, তাহা কি কি?

### সংস্কৃত সাহিত্যের আবিষ্কার ।

ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের আবিষ্কার অনেকের পক্ষে ইতিহাস না হইয়া উপকথা বলিয়া প্রতীত হইবে। বহুকাল পর্য্যন্ত যে অনেকে এই সাহিত্য অপ্রকৃত বিবেচনা করিতেন, তাহাও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সংস্কৃত ভাষায় অন্যান্য দশ সহস্র ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ আছে (১)। এই সকলের হস্তলিপিও অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে। সেকন্দের শাহ যে ভারত জয় করিতে আসিয়া, আবিষ্কার মাত্র করিয়াছিলেন, গ্রীস হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ সেই ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের কথা। তাৎকালিক গ্রীক-ধুরন্ধর প্লেতো এবং আরিস্ততল, শুনিলে কি বলিতেন, বলিতে পারি না।

### বৌদ্ধ ধর্ম ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের মধ্যবর্তী সীমা ।

বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশোন্মুখ সময়ে ব্রাহ্মণদিগের প্রাচীন সাহিত্য-অভিনয়ের যযনিকা পাত হইয়াছিল পুরাতন ভাষা পরিবর্তিত হইয়াছিল। পুরাতন ধর্মেরও বিবিধ পরিবর্তনের পর নূতন এক ধর্ম আসিয়া তৎস্থলাভিষিক্ত

(১) ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্রের “বঙ্গদেশস্থ এসিয়াটিক পুস্তকালয়ের” হস্তলিখিত প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের তালিকা। ১৮৭৭। মুখবন্ধের ১ম পৃষ্ঠ। কথিত আছে যে, ইণ্ডিয়া আফিসের পুস্তকালয়ে ৪০২৩ খণ্ড ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ রক্ষিত আছে। বোডলিয়নে ৮৫৪ খণ্ড। বর্লিনের গ্রন্থালয়েও প্রায় ঐ পরিমাণ। তাজোরের মহারাজার পুস্তকালয়ে একাদশবিধ অক্ষরের ১৮,০০০ হস্ত-লিখিত গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। বারাণসী সংস্কৃত কলেজের পুস্তকালয়ে ২,০০০ খণ্ড। কলিকাতাহ বঙ্গদেশের এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকালয়ে ৩,৭০০ খণ্ড, এবং কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের পুস্তকালয়ে ২,০০০ খণ্ড গ্রন্থ আছে।

হইয়াছিল। ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের ধর্মসংহিতা অতি প্রাচীন কাল হইতে বিদ্যমান আছে, তাহা স্বীকার করা যাউক বা না যাউক, সেকন্দের শাহের আক্রমণ কালে, গ্রীক লেখকেরা যে সম্রাটকোতসকে (১)

(১) আমার ১৮৬৯ সালের মুদ্রিত “প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস” নামক পুস্তকে (২৭৪ পৃষ্ঠা) উত্তর ও দক্ষিণ প্রদেশীয় বৌদ্ধগণের কিংবদন্তীমূলক ঘটনা-কালের সঙ্গে গ্রীকগণের ঐতিহাসিক কালের কথঞ্চিৎ মিল রাখিতে চেষ্টা পাইয়াছি। অবশেষে আমার একপ ধারণা হইয়াছে যে, চন্দ্রগুপ্ত ৩১৫ খৃষ্ট পূর্বের রাজা হন ও ২৪ বৎসর রাজত্ব করেন। ২৫১ খ্রীঃ পূঃ অর্কে বিন্দুসার তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। বিন্দুসার ২৫ কিংবা ২৮ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে (২৬৬ অথবা) ৩৬৩ খ্রীঃ পূঃ অর্কে অশোক তৎস্থলাভিষিক্ত হন। অশোক (২৬২ বা) ২৫৯ খ্রীঃ পূঃ অর্কে যথারীতি রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন। তিনি ৩৭ বৎসর রাজত্ব করেন, এবং (২২৫ বা) ২২১ খ্রীঃ পূঃ ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি ১৭ বৎসর রাজত্ব করিলে পর বৌদ্ধ-সমিতি আহুত হয়। সুতরাং এই ঘটনা হয় ২৪৫ নয় ২৪২ খ্রীঃ পূঃ অর্কে হইয়া থাকিবে।

বৌদ্ধকাল বিনির্গয় সম্বন্ধে একটা মোটামুটি গণনা করিতে আমাকে বুদ্ধের মৃত্যু এবং তৎপূর্ব ও পরের কতকগুলি সাধারণ প্রবাদের উপর লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইয়াছে। ইহাতে এই দেখা যাইতেছে যে, (১) বুদ্ধের মৃত্যু ও চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক, এই ঘটনাদ্বয়ের মধ্যে আনুমানিক ১৬২ বৎসর গত হইয়াছে। ৩১৫ ও ১৬২ যোগে ৪৭৭ হয়, সুতরাং উক্ত ঘটনার আনুমানিক কাল ৪৭৭ খ্রীঃ পূঃ অর্ক। (২) এখন দেখা যাইতেছে, বুদ্ধের মৃত্যু এবং অশোকের রাজ্যাভিষেকে আনুমানিক ২১৮ বৎসরের ব্যবধান। সুতরাং ২৫৯ + ২১৮ = ৪৭৭ সম্ভবতঃ ইহাই উক্ত ঘটনার সময় হইবে।

আমি এই কারণে বুদ্ধের মৃত্যু-কাল ৫৪৩ খ্রীঃ পূঃ অর্ক না বলিয়া, ৪৭৭ খ্রীঃ পূঃ অর্ক অবধারণ করিয়াছি। এবং এই অবধারণা দৃঢ় করিবার চেষ্টায় তাৎকালিক আয়াস-সাধ্য প্রমাণ সংগ্রহেও চেষ্টা পাইয়াছি।

আমার এই অনুমানের সিদ্ধি-সূচক আর দুইটি প্রমাণ অল্প দিন হইল পাওয়া গিয়াছে। জেনারেল কনিংহাম সাহেব দুইটি ক্ষোদিত লিপি আবিষ্কৃত করিয়াছেন, এবং ডাক্তর বুল্লর উহা “ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারী” নামক সম্মভে প্রকাশ করিয়াছেন। বুল্লর তাঁহার এতদ্বিবয়ক দুইটি প্রবন্ধেই স্বীকার করিয়াছেন যে, এই ক্ষোদিত লিপি অশোক ব্যতিরিক্ত আর কাহারও হইতে পারে না। অশোকের এই ক্ষোদিত লিপিতে বিবৃত আছে যে, তিনি সাড়ে তেত্রিশ বৎসরেরও অধিক কাল “উপাসক” (অর্থাৎ বুদ্ধের উপাসক) ভাবে দিনযাপন করিয়াছিলেন এবং এক বৎসরেরও অধিক কাল সম্রাটশ্রেণীভূক্ত ছিলেন। এইক্ষণ যদি অশোক ২৫৯ খ্রীঃ পূঃ অর্কে দীক্ষিত হইয়া থাকেন এবং ২৫৫ খ্রীঃ পূঃ অর্কে “উপাসক” হন তাহা হইলে, এই ক্ষোদিত স্তম্ভ ২৫৫ - ৩৩½ = ২২১ খ্রীঃ পূঃ অর্কে অবশ্যই স্থাপিত হইয়া



শিল্প এবং সেকন্ডর শাহের ভারতবর্ষ ত্যাগের পর সিলিউকসের সমকালিক পালিবোধার রাজা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তিনিই যে অশোকের পিতামহ পাটলিপুত্রের রাজা চন্দ্রগুপ্ত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মেগাস্থিনিস্ ইহাকে কয়েক বার দেখেন। যশস্বী অশোক বৌদ্ধ ধর্মের অনেক শ্রীবুদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন; তাঁহার রাজত্ব কালে ২৪৫ বা ২৪২ খ্রীঃ পূঃ অর্কে বৌদ্ধ মহাসভার অধিবেশন হয়। তৎকালের প্রথম ক্ষোদিত লিপি অদ্যাপি ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে পর্কতোপরি অঙ্কিত রহিয়াছে। ঐ সকল ক্ষোদিত লিপি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত নহে, উহা যে ভাষায় লিখিত, তাহার সহিত সংস্কৃতের যে সম্বন্ধ, ইতালীয়ের সহিত লাতিনেরও সেই সম্বন্ধ। সুতরাং যে কালে ভারতবাসী সংস্কৃতে কথা বার্তা কহিত, সে কাল খ্রীষ্ট জন্মবার তিন শত বৎসর পূর্বে শেষ হইয়াছিল।

---

থাকিবে। সুতরাং এই ক্ষোদিত লিপি অনুসারে বুদ্ধের নির্বাণ প্রাপ্তি হইতে ২৫৬ বৎসর গত হইয়াছে, ইহাই বুঝা যায়। (এস্থলে আমি বুল্লর সাহেবের ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিলাম। বুল্লর সাহেবের ব্যাখ্যায় যে ঐ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই, তাহা বলিতেছি না। তবে তাহার ব্যাখ্যা হইতে ভিন্ন প্রণালীর উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা হওয়া অসম্ভব)। সুতরাং  $২২১ + ২৫৬ = ৪৭৭$ । অতএব সম্ভবতঃ বুদ্ধের মৃত্যু ৪৭৭ খ্রীঃ পূঃ অর্কে হইয়াছে।

কলতঃ আমার মতের সহিত ক্ষোদিত লিপির এক্রপ ঐক্য অভাবনীয় এবং আশাতীত, সুতরাং এ প্রমাণ অধিকতর প্রয়োজনীয়।

এস্থলে আর একটী প্রমাণের উল্লেখও করা যাইতে পারে। অশোকের পুত্র মহেন্দ্র তাঁহার পিতা ছয় বৎসর রাজত্ব করিলে, অর্থাৎ ২৫৩ খ্রীঃ পূঃ অর্কে ভিক্ষু হন। ঐ সময়ে তাঁহার বয়স ২০ বৎসর। সুতরাং ৩৭৩ খ্রীঃ পূঃ অর্কে অবশ্যই তাঁহার জন্ম হইয়া থাকিবে। তাঁহার জন্ম এবং বুদ্ধের মৃত্যু, এই কালের মধ্যে আনুমানিক ২০৪ বৎসর গত হইয়াছে। সুতরাং আবার ২৭৩ ও ২৫৬ যোগ করিয়া দেখ, কল ৪৭৭ দাঁড়াইবে। সুতরাং বুদ্ধের মৃত্যু যে, ৪৭৭ খ্রীঃ পূঃ অর্কে হইয়াছে, তাহা ইহাতেও দেখা যাইতেছে।

আমি জানিতে পারিয়াছি, বুদ্ধের মৃত্যু কাল বিনির্দয় সম্বন্ধে কনিংহাম সাহেবের ন্যায় পুরাতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরও এই মত। আমি ১৮৫৯ অর্কে যে “সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস” নামক পুস্তক মুদ্রিত করি, তিনি তাহার পূর্বেই এ মতটী প্রচার এবং প্রস্বাকারে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি বে সকল প্রমাণের উপর বিশ্বাস করিয়া আমার মত স্থাপন করিয়াছি, তিনি তৎসমুদায়ের অনুসরণ করিয়াছিলেন কি না, বলিতে পারি না।



অশোকের বৌদ্ধ ধর্মের সহিত ব্রাহ্মণদের বৈদিক ধর্মের যে সম্বন্ধ, ইতালীয়ের সহিত লাতিনের, অথবা প্রোটেষ্ট্যান্টদিগের সহিত কাথলিক-দিগের ধর্মের ঠিক সেই সম্বন্ধ। বস্তুতঃ বৌদ্ধধর্ম বৈদিক ধর্মের প্রতিকূলাচারী বলিয়া বোধ হয়। যাহারা ভারতবর্ষের সাহিত্যকে নববিকশিত বলিয়া বিবেচনা করেন, এবং যাহারা আমাদের প্রত্যক্ষ বিষয়কেও দৃষ্টিভ্রম জ্ঞানে বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা অন্ততঃ এই দুইটা বিষয়ের উপর নির্ভর করিতে পারেন যে, খ্রীষ্ট জন্মবার তৃতীয় শতাব্দী পূর্বেই সংস্কৃত ভাষা প্রাকৃত ভাষারূপে গঠিত হয়, এবং পুরাতন বৈদিক ধর্ম বৌদ্ধ ধর্মাকারে পরিণত ও চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোকের রাজত্বকালে রাজধর্মকর্তৃক পর্য্যুদস্ত হইয়া উঠে।

### বেদ ঈশ্বর-প্রচারিত বলিয়া উদ্ঘোষিত।

বৈদিক ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে একটি প্রধান প্রভেদ এই যে, বেদ পবিত্র ও ঈশ্বর-প্রতিপাদিত বলিয়া পরিচিত। ভারতের আদি ধর্ম-তত্ত্বের উন্নতির সম্বন্ধে বেদের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা এত অধিক যে, বেদ কেন ঈশ্বর-প্রতিপাদিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এখন তাহার কারণ অনুসন্ধান আমাদিগের বিশেষ যত্নবান হওয়া আবশ্যক। যদিও বৌদ্ধেরা অনেক বিষয়ে প্রচ্ছন্নভাবে বৈদিক ভিন্ন আর কিছুই নহেন, তথাপি তাহারা বেদকে ঈশ্বর-প্রচারিত বলিয়া স্বীকার না করাতে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাবের পূর্বে বেদ ঈশ্বর-প্রচারিত বলিয়া উদ্ঘোষিত হইয়াছিল।

কোন সময়ে ব্রাহ্মণেরা বেদকে ঈশ্বর-প্রচারিত ও ভ্রমশূন্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। বেদের সম্বন্ধে এইরূপ জল্পনা বোধ হয় ক্রমে ক্রমে উদ্ভব হইয়া পরিশেষে অপরাপর ধর্মের ন্যায় “ঈশ্বর কর্তৃক অনুপ্রাণিত” এই উপপত্তিমূলক হইয়াছে। সুতরাং ইহাও যে অপরাপর ধর্মের ন্যায় কাল্পনিক ও কৃত্রিম, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

বেদের কবিগণ তাঁহাদের রচনা সম্বন্ধে নানারূপ বলিয়া থাকেন।

তঁাহারা কখন আপনাদিগকে স্তোত্র-নির্মাতা বলিয়া পরিচয় দেন, এবং কখনও বা তঁাহারা নিজের কার্য্য সূত্রধরের, তত্ত্ববায়ের, গোপের এবং পোত-বাহকের কার্য্যের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। (১০ম, ১১৬, ৯) (১)

আবার সময়ে সময়ে, বেদে অনেক উচ্চ ও মহোদার ভাব-রাশিও লক্ষিত হইয়া থাকে। একরূপ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্তোত্রনিচয় হৃদয়ে নির্মিত হইয়া (১ম, ১৭১, ২; ২য়, ৩৫, ২), মুখ হইতে বিনিসৃত হইয়াছে। (৬ষ্ঠ, ৩২, ১)। কবি কখনও বলেন, স্তোত্রগুলি তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন (১০ম, ৬৭, ১), তিনি নিজে উহার রচনাকর্তা নহেন; আবার কখনও বলেন যে, তিনি সোমপানে দৈবশক্তি-সম্পন্ন হইয়া (৬ষ্ঠ, ৪৭, ৩) অমুপ্রাণিত হইয়াছেন। তিনি এই সকল কবিতা মেঘ-নিসৃত বারিধারা (৭ম ৯৪, ১). অথবা বায়ু-চালিত মেঘ-মালার (১ম, ১১৬, ১) সহিত তুলনা করিয়া থাকেন।

এই সকল হৃদয়োখিত এবং স্তোত্রাকারে বিনির্গত ভাব, আবার কিছু কাল পরে ঈশ্বর-দত্ত (১ম, ৩৭, ৪) ও স্বর্গীয় (৩য়, ১৮, ৩) বলিয়া উক্ত হইয়াছে। দেবতারা যেন কবিদের মনকে উত্তেজিত ও অগ্রহান্বিত করিয়া তুলিতেন (৬ষ্ঠ, ৪৭, ১০)। তঁাহারা কবিগণের বন্ধু ও সহকারী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (৭ম, ৮৮, ৪; ৮ম, ৫২, ৪), এবং পরিশেষে দেবতারাষ্ট্রী দ্রষ্টা ও কবি বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিয়াছেন (১ম, ৩১, ১)। কবিরা স্তোত্র পাঠ করিয়া দেবতাদিগের নিকট যে সকল প্রার্থনা করিতেন, তৎসমুদয় ফলবতী হইলে তঁাহারা সহজেই মনে করিতেন যে, তঁাহাদের স্তোত্র অবশ্যই অলৌকিক ক্ষমতা-বিশিষ্ট হইয়া থাকিবে। দেবতা ও মানুষের মধ্যে যে প্রকৃত কথোপকথন চলিতেছে, তঁাহারা তাহাতেও বিশ্বাস করিতেন (১ম, ১৭৯, ২; ৭ম, ৭৬, ৪)। এইরূপে প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ মনে করিতেন যে, তঁাহারা দ্বিব্যচক্ষে দর্শন করিতেছেন এবং স্বয়ং দেবতারাষ্ট্রী প্রচার করিতেছেন।

প্রথম হইতেই আবার এই সঙ্গে সন্দেহের ভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। দেবতারা যদি তঁাহাদের প্রার্থনার কর্ণপাত না করিতেন এবং কোন

---

(১) এ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রয়োজনীয় কবিতা ডাক্তর ব্লুইর সাহেবের “সংস্কৃত মূল” নামক গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে দৃষ্ট হইবে।

শত্রুপক্ষ যদি অপর দেবতাগণের সহায়তার জর লাভে কৃতকার্য হইত (বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের বিরোধ ইহার উদাহরণ-স্থল) তাহা হইলে তাঁহারা আবার সন্নিহান হইয়া উঠিতেন। স্তোত্রের কোন কোন অংশ পাঠে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, লোক-বিদিত দেবরাজ ইন্দের ক্ষমতাতেও তাঁহারা সন্নিহান ছিলেন (১)।

দেব-প্রসূত বলিয়া বেদের যে মর্যাদা, তাহা কবি-কাল্পনিক বলিয়া পরিগণিত হইলে বোধ হয়, কোন আপত্তিই থাকিত না। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা যখন সমগ্র বেদকে অজ্ঞাস্ত ও দেব-প্রসূত বলিয়া পরিচয় দিলেন এবং যখন ব্রাহ্মণ দিব্য জ্ঞানযুক্ত ও ভ্রমশূন্য বলিয়া পরিগণিত হইলেন, তখন বৌদ্ধদিগের আপত্তি দুর্নিবার্য হইয়া উঠা অসম্ভব নহে। বোধ হয়, বেদের সূত্র-ভাগে এই বিরোধ ঘটিয়া থাকিবে। “ব্রাহ্মণে” বেদের দেব-প্রসূত হওয়ার কথা উক্ত হইলেও উহা প্রতিবাদকারীকে পরাস্ত করিবার একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দেশ করা হয় নাই। এই দুইটা বিষয়েরই অন্তরও অতি অধিক। যদিও ব্রাহ্মণে শ্রুতি শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় (শ্রুতি শব্দ শ্রুতি শব্দের বৈপরীত্য-ব্যঞ্জক। ঈশ্বর কর্তৃক অনুপ্রাণিত হওয়ার আধুনিক কথা শ্রুতি এবং স্মৃতি শব্দ লোক-প্রসিদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে), তথাপি শ্রুতি শব্দ অদ্যাপি সন্দেহ-ভঞ্জন বা বিরোধের অপনয়নে ব্যবহৃত হয় নাই। প্রাচীন উপনিষদে বেদের অনেক নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়, উহাতে বেদের স্তোত্র এবং বলি, নিফল বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এবং বনচারী ঋষিগণের জ্ঞান অধিক সমাদৃত হইয়াছে, কিন্তু উপনিষদ মিথ্যা বলিয়া কাহাকেও অভিযোগ করিতে দেখা যায় না।

সূত্রপ্রণয়ন-কালে এই প্রতিবাদ ঘটিতে দেখা যায়। নিক্কন্ততে (১ম, ১৫) যাক্ষ কোৎসের মত উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, “বেদের অন্তর্গত স্তোত্র-গুলি সম্পূর্ণ নিরর্থক।” কোৎস কাহারও প্রকৃত নাম না হইয়া নামের অপভ্রংশ হইয়া থাকিলেও পাণিনির পূর্বে বেদের মর্যাদার ভ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। (২) এক বুদ্ধিই যে, কেবল সর্ব প্রথমে, বেদের দেব-জনকত্ব ও

(১) এই বিষয় আমার এই গ্রন্থের বহু প্রবন্ধে বিবৃত হইয়াছে।

(২) ৪র্থ, ৪, ৬০ সূত্রে দৃষ্ট হইবে যে, পাণিনি অবিদ্বানো এবং নিরীক্ষণবানীন্দ্রের বিষয়

ব্রাহ্মণদিগের স্বত্বাধিকার অস্বীকার করিয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না। অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও নাস্তিকতার ইতিহাস পাওয়া সুকঠিন। আধুনিক বিসংবাদমূলক গ্রন্থসমূহে, নাস্তিক-প্রধান বৃহস্পতির কতকগুলি মত উদ্ধৃত দেখা যায়। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ভারতে তৎসমুদায় সংগৃহীত হয় নাই। বৃহস্পতির আবির্ভাব-কাল নিরূপণ করা আমার অভিপ্রেত নহে, তবে তন্মাত্রে আরোপিত কয়েকটি মাত্র কথা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে, মৃচ্-স্বভাব হিন্দুও কেমন নিদারুণ আঘাত করিতে পারিতেন এবং বেদের ঐশ্বরিক প্রকৃতি লইয়া ব্রাহ্মণদের যে স্পর্ধা, তাহা কেবল অনুমানজনক না হইয়া ঐতিহাসিক সত্যরূপে পরিগণিত হইয়া উঠিয়াছিল।

অধ্যাপক কাউএলের অনুবাদিত সর্বদর্শন-সংগ্রহে চার্বাক-প্রণীত দর্শনশাস্ত্রের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। চার্বাক বৃহস্পতির শিষ্য বা মতাবলম্বী ছিলেন। ইঁহারা লোকায়ত (জগতে প্রসিদ্ধ) সম্প্রদায়-ভুক্ত। ইঁহাদের মতে চতুর্ভূত ব্যতিরিক্ত জগতে আর কিছুই নাই। ইঁহারা বলেন, কয়েকটি পদার্থের সমবায়ে যেমন মাদকতা-শক্তি উৎপাদিত হয়, সেইরূপ ঐ চতুর্ভূতের সমবায়ে জীবদেহে মেধার বা বুদ্ধির উদ্ভব হইয়া থাকে। শরীর ব্যতিরেকে আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ না থাকায়, ইঁহারা মেধা-সংশ্লিষ্ট শরীরকে আত্মা কহিয়াছেন। ইঁহাদের মতে অমৃত্যু, জ্ঞানলাভের একমাত্র সাধক, এবং সম্ভোগই মানব-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য।

এ সম্বন্ধে এই আপত্তি হইতেছে, যদি তাহাই হইবে, তবে জ্ঞানী লোকে কি অন্য বেদের মতানুসারে অগ্নিহোত্র বা অন্যান্য যজ্ঞ করিয়া থাকেন? এই প্রশ্নটির উত্তর চার্বাকেরা এইরূপ দিয়াছেন। যথা—

“তোমার এ প্রতিবাদে আমার মত কিছুই খণ্ডন করিতে পারিতেছে না। অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কেবল জীবিকা নির্বাহের উপায়ভূত। কারণ বেদ তিনটি প্রধান দোষে দূষিত। ইহার একটি দোষ অসত্য-প্রবণতা, দ্বিতীয়

---

অবগত ছিলেন। অধিবাসীদের একটি নাম লোকায়ত; এই লোকায়ত শব্দ হইতে উক্ত-  
খাদিগণে এবং ৪র্থ, ২, ৬০ নৃত্তে লোকায়তিক পদ দৃষ্ট হয়। ৫ম, ১, ১২১ নৃত্তে বার্ষপত্য  
শব্দের নির্দেশ আছে।

দোষ আশ্র-বিসংবাদিতা, তৃতীয় দোষ এক কথার বা এক বিষয়ের পুনঃ পুনঃ উক্তি। যে সকল ধূর্ত আপনাদিগকে বেদের পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহারা পরস্পরের মতচ্ছেদী। জ্ঞানকাণ্ড (উপনিষদ) বাদীরা কৰ্মকাণ্ডের (শ্রোত্র এবং ব্রাহ্মণ) প্রতি অনাদর প্রদর্শন করেন; পক্ষান্তরে কৰ্মকাণ্ডজেরা জ্ঞানকাণ্ডজদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন। ফলতঃ তিন বেদ, ধূর্তগণের অসংলগ্ন অর্থশূন্য গীতি-রচনা ভিন্ন আর কিছুই নহে,” এতৎ-সম্বন্ধে এই একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে—

“বৃহস্পতি বলেন, যাহারা জ্ঞান, ও বুদ্ধি-বিহীন, অগ্নিহোত্র, ত্রিবেদ, সন্ন্যাসীর ত্রিষষ্টি ও শরীরে ভস্ম লেপন, এই কয়েকটা কেবল তাহাদের জীবনোপায়।”

বৃহস্পতি আরও বলিয়াছেন—

“জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে পশু বধ করিলে ঐ পশু যদি সশরীরে স্বর্গে যায়, যাজক তবে কি জন্য তাহার পিতাকেও সেই সঙ্গে বলি না দেন? শ্রাদ্ধ করিলে মৃত ব্যক্তির যদি প্রীতি উৎপাদিত হয়, তাহা হইলে পথিকের সহিত খাদ্য সামগ্রী দিবার প্রয়োজন কি?”

ইহা লোকে পিণ্ডদান করিলে যদি স্বর্গীয় আত্মারা প্রীত হন, তাহা হইলে যাহারা গৃহের উপরিভাগে আছেন, তাঁহাদের আহারীয় বস্তু গৃহের নিম্নে দেওয়া হয় না কেন?

যত দিন জীবন থাকে, সুখে বাস কর; খণ করিয়াও মৃত পান কর।

শরীর একবার ভস্মমাৎ হইলে উহা কেমন করিয়া আবার ফিরিয়া আসিবে?

লোকে কলেবর ত্যাগ করিয়া পরলোকে যায়, ইহা হইলে তাহারা আত্মীয় স্বজনের প্রণয়-কাতর হইয়া ইহা জগতে কেন প্রত্যাগত না হয়?

ব্রাহ্মণেরা তাহাদের জীবনোপায়ের জন্যই মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে এই সকল শ্রাদ্ধ-বিধি প্রণয়ন করিয়াছে। এতদ্বারা কোনও ফল লাভ হয় না।

বেদ-লেখক তিন জনই ধূর্ত, পিণ্ডাচ ও নির্বোধ।

পণ্ডিতগণের গর্ফরী তর্ফরী প্রভৃতি এবং ভয়ঙ্কর অশ্বমেধ যজ্ঞের নিরমাবলি, নির্যোধগণ কর্তৃক প্রণীত হইয়াছে। উহাতে পুরোহিতদিগের

বুড়ুকাও দূর হইরাছে এবং নিশাচর মাংস-পিষাচদিগের মাংস-মাংসসাও  
পরিভূক্ত হইরাছে।”

এই সমস্ত প্রতিবাদের মধ্যে কতকগুলি আধুনিক হইলেও হইতে  
পারে। কিন্তু ইহার অধিকাংশই যে বৌদ্ধদিগের সময়ে সৃষ্ট, তাহা স্পষ্টই  
বুঝা যাইতেছে।

অধ্যাপক বর্ণূক্ষ দেখাইরাছেন যে, যদি “দেবসমীপে বলিদান করিলে, সেই  
পুত্র আত্মা স্বর্গে যায়, তাহা হইলে লোকে পিতাকে বলি দেয় না কেন ?”  
বৌদ্ধ তার্কিকগণও ঠিক এই তর্কটাই ধরিরাছেন (১)। যদিও অশোকের  
বহু তৃতীয় শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম রাজধর্ম হইয়া উঠিরাছিল, তথাপি ইহা যে  
কতিপয় বংশপরম্পরায় লোকের মনে মনে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইতেছিল,  
তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বুদ্ধের মৃত্যু ঠিক কোন্ সময়ে হইরাছিল, তৎসম্বন্ধে  
সন্দেহ থাকিলেও খ্রীষ্ট জন্মবার ৫৪৩ বৎসর পূর্বে হইতে তাহার শতকের গণনা  
আরম্ভ হওয়ার, আমরা নির্বিক্বাদে বলিতে পারি যে, খ্রীষ্ট জন্মবার প্রায়  
৫০০ বৎসর পূর্বে বৌদ্ধ ধর্ম অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হইরাছিল।

এই সময়ের পূর্বের সংস্কৃত সাহিত্যই ভারতীয় ঐতিহাসিক সাহিত্যের  
একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। তাহা বলিয়া কালিদাসের শকুন্তলার সৌন্দর্য্য এবং  
রমণীয়তা আমার পক্ষে অস্বীকার করা এক প্রকার অসম্ভব। উক্ত কবি-  
প্রণীত “মেঘদূত” ও “শকুন্তলা” অতি আদরের সামগ্রী। মেঘদূতের পবিত্রতা  
আরও অধিক। “নলের” কিয়দংশ পরিত্যক্ত হইলে উহা একখানি প্রতিভা-  
পূর্ণ চমৎকার গ্রন্থ হইতে পারে। পঞ্চতন্ত্র ও দ্বিতোপদেশের কয়েকটি গল্প,  
গল্পকথনের আদর্শ বলিলেই হয়। কিন্তু এই সকল সাহিত্য আধুনিক ও  
বিব্রান্তর হইতে পরিগৃহীত। এগুলি আলেকজেন্ড্রীক কালের গ্রন্থাদির তুল্য।

এই গ্রন্থসমূহ সাহিত্য-ভাণ্ডারের বিচিত্র বস্তু ভিন্ন আর কিছুই নহে,  
জোনস্ ও কোলব্রুক্ যে, অবসরকালে ইহাদিগকে লইয়া যথেষ্ট আনন্দ  
অনুভব করিতেন, তাহা বলা বাহুল্য। তথাপি এই সকল গ্রন্থ আজীবন  
আলোচ্য বিষয় নহে।

(১) বর্ণূক্ষকৃত বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের উপক্রমণিকা ভাগ, ২০২ পৃষ্ঠা।

## বৈদিক ভাষার ঐতিহাসিক প্রকৃতি ।

যেদের ভাষা সচরাচর প্রচলিত সংস্কৃত সাহিত্যের ভাষা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহাতে একরূপ বিবিধ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় যে, তৎসমুদয় কালসহকারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অথচ ঐ সমুদয় প্রয়োগ গ্রীক ও অন্যান্য আর্য্য ভাষার ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। প্রচলিত সংস্কৃত ভাষার সন্দেহার্থক ক্রিয়াপদের প্রয়োগ নাই। সংস্কৃত ভাষার উক্ত ক্রিয়া থাকিবার সম্ভাবনা ভাষাবিজ্ঞানালোচনার অবধারিত হইলে এবং বেদ আবিষ্কৃত ও সমালোচিত হইলে পর, বেদে উহার প্রচুর প্রয়োগ দেখা গিয়াছে।

চলিত সংস্কৃত ভাষার স্বরগ্রামের নির্দ্ধারণ-প্রণালী নাই। বৈদিক সাহিত্যে উহার ব্যবহারের রীতি আছে এবং এই রীতি দেখিয়া বুঝা যায় যে, সংস্কৃত ও গ্রীক ভাষার স্বর-প্রয়োগ এক নিয়মানুসারেই হইয়াছে।

বৈদিক সংস্কৃত ও গ্রীক ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখাইবার জন্য একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। আমরা জানি যে গ্রীক *Zeus* এবং সংস্কৃত দ্যৌস্ (আকাশ) একই কথা। কিন্তু দ্যৌস্ কথাটি আধুনিক সংস্কৃতে কেবল জীলিন্ধে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। বেদে উহার পুংলিঙ্গ-প্রয়োগ দেখা যায় এবং গ্রীক ও লাতিনে ঐ শব্দসংযুক্ত পদ প্রধান দেবতার্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যুপিতরের ন্যায় বেদে দ্যৌস্পিতর্ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। অধিকন্তু গ্রীক ভাষার *Zeus* শব্দ কর্তৃপদে উদাত্ত ও সম্বোধনে স্বরিত স্বরবিশিষ্ট হইয়া থাকে। আবার বেদেও দ্যৌস্ শব্দের ঐ সকল পদে দ্বিক উক্ত রূপ হইয়া থাকে। গ্রীক বৈয়াকরণিকেরা এইরূপ প্রভেদের কারণ বলিতে পারেন না। কিন্তু সংস্কৃত বৈয়াকরণিকেরা বলেন, স্বরগ্রামের আরোহ ও অবরোহের নিয়মানুসারেই ঐ প্রকার রূপান্তর ঘটিয়া থাকে (১)।

---

(১) সাধারণ নিয়মানুসারে সম্বোধন পদের প্রথম শব্দেই বল ক্রিষ্ট হয়। গ্রীক এবং লাতিনেও অংশতঃ এই নিয়ম আছে। পক্ষান্তরে সংস্কৃতও এই নিয়ম-বদ্ধিত নহে। দ্যৌস্ শব্দের সম্বোধন স্বরিত স্বরবিশিষ্ট হওয়ার আপাততঃ এই নিয়মের বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। এই শব্দ দ্বিপদ-বিশিষ্ট। দ্বির উচ্চারণ দীর্ঘ এবং ঔস্ এর উচ্চারণ দ্রুত। এই দীর্ঘ ও দ্রুত একত্র হইয়া স্বরিত স্বরের উৎপত্তি হইয়াছে।



সংস্কৃতে দ্যৌস্ শব্দের সম্বোধন পদের উচ্চারণ উদাত্ত স্বরে না হইয়া  
 বে, স্বরিত স্বরে হইয়াছে, ইহা আমার নিকট ভাষার একটি মনোহর এবং  
 অমূল্য রত্ন বলিয়া বোধ হয়। ডাক্তর শ্লিমান কর্তৃক আবিষ্কৃত গ্রীক  
 শিল্পবিশিষ্ট দেখিয়া কে না চমৎকৃত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছেন? আমি উহা-  
 দিগকে গ্রীক সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতরণের সোপানস্বরূপ জ্ঞান করিয়া থাকি।  
 কিন্তু দ্যৌস্ শব্দের এই সম্বোধন পদের সহিত তুলনা করিলে আবিষ্কৃত  
 প্রস্তর খণ্ড, পান-পাত্র, ঢাল, শিরোভূষণ, এমন কি স্তূর্ণ-মুকুটও অকিঞ্চিৎকর  
 বলিয়া বোধ হয়। যেমন এক দিকে বুঝিতে পারি যার যে, পান-পাত্র প্রভৃতি  
 সামান্য শিল্পীর সামান্য চিন্তাসম্মত, তেমনি অন্য দিকে স্তূর্ণপেঙ্গা বহুমূল্য  
 উপাদান স্বরূপ মানব চিন্তার পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাইয়া প্রীতি লাভ করিতে  
 হয়। যদি পিরামিদ গড়িতে বা স্তূচাক প্রকোষ্ঠ নির্মাণে সহস্র সহস্র লোক  
 আবশ্যক হইয়া থাকে, তবে “দ্যৌস্পিতর,” (আদৌ আলোকদাতা অর্থে,  
 পশ্চাৎ জৈম্বার্থে প্রযুক্ত) এই একটীমাত্র শব্দের নির্মাণে যে, কোটি কোটি  
 লোকের পরিশ্রম আবশ্যক হইয়াছিল, ইহা কেন বলিতে পারিব না?  
 বেদের অনন্ত ভাণ্ডার এই রূপ অসংখ্য পিরামিদে পরিপূর্ণ এবং এই রূপ  
 অগণ্য অমূল্য রত্নে সমাকীর্ণ। এখন আমরা এই রত্নরাজির উদ্ধরণ, সংগ্রহ  
 এবং সজ্জিতকরণ জন্য কৰ্ম্মকুশল লোক চাই, তাহাহইলেই সেই মহামতি  
 প্রাচীন মানবের হৃদয়-নিহিত গভীর বৈচিত্র্য আবার বিমুক্ত হইবে।

উল্লিখিত বিষয়গুলিকে কেবল বিচিত্র বলিলেই উহাদের সম্পূর্ণ প্রশংসা  
 করা হইল না; ভাষা-বিজ্ঞান রূপ অণুবীক্ষণে দ্যৌস্ ও Zeus শব্দের সম্বোধন  
 পদের স্বর যেন জীবের অন্তর্লীন, জীবনসূচক ধমনীর প্রকল্পন বলিয়া বোধ  
 হয়। ইহাতে জীবন আছে, ঐতিহাসিক, জীবনের সতেজ চিহ্ন ইহাতে  
 লক্ষিত হইতেছে। আধুনিক ইতিহাস মধ্যকালের ইতিহাস ব্যতীত যেকোন  
 অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়, কিংবা মধ্যকালের ইতিহাস রোমের ইতিহাস,  
 অথবা রোমের ইতিহাস গ্রীসের ইতিহাস ব্যতিরেকে যেমন অসম্পূর্ণ হইয়া  
 উঠে, সেইরূপ সমস্ত জগতের ইতিহাস বৈদিক সাহিত্য-সংরক্ষিত, আৰ্য্যজাতির  
 জীবন-বৃত্তান্তের প্রথম অধ্যায় ব্যতিরেকে আজি অবধি অসম্পূর্ণ বলিয়া  
 পরিগণিত হইবে।



হুর্ভাগ্যবশতঃ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ পূর্বে ভারতের সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতরণ পূর্বক কেবল কালিদাস ও ভবভূতির গ্রন্থ এবং শিব ও বিষ্ণুর ধর্ম-শাস্ত্র পাঠ করিয়াই পরিতৃপ্ত থাকিতেন। তাহারা ইহার অধিক আর কিছুই করিতেন না। বৌদ্ধধর্মের উন্নতির পূর্বে যখন সংস্কৃত ভাষা ভারতের কথিত ভাষা ছিল, এবং শিবপূজা অসম্পূর্ণ প্রচলিত কি অজ্ঞাত ছিল, তৎকাল-প্রসূত ভারতীয় সাহিত্য পাঠ করা নিতান্ত আবশ্যক।

### বৈদিক সাহিত্যের চারিটি স্তর।

১ম। সূত্রকাল, ৫০০ খ্রীঃ পূঃ।

বৌদ্ধ ধর্মের প্রাচুর্য্যবশতঃ পূর্বে ভারতীয় সাহিত্যে উপর্য্যুপরি তিন চারিটি স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম সূত্রকাল। এই কাল বৌদ্ধসময় পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। বিচিত্র রচনাপ্রণালী দ্বারা এই কালের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এই সকল রচনা নিতান্ত অস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখিত, টীকা ব্যতিরেকে প্রায় বোধের অগম্য। সূত্ররাং এসময়ে অধিক কিছু বলিতে বিরত হইলাম। ফলতঃ আমি যে সকল সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াছি, তাহার কোন খানির মধ্যে একরূপ অপূর্ণ রচনা দৃষ্ট হয় নাই। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এইরূপ একটা প্রচলিত প্রবাদ আছে যে, সূত্রলেখক একটি মাত্র অক্ষর বাঁচাইতে পারিলে পুত্রলাভেরও অধিক আনন্দ অনুভব করিতেন। পুত্রের প্রদত্ত পিও না পাইলে তাঁহাদের স্বর্গলাভ হইত না। তৎকালের পরিষদ-প্রচলিত জ্ঞানসংগ্রহ ও একত্রীকরণই সূত্রের উদ্দেশ্য। এই সকল সূত্রে যজ্ঞের নিয়ম, স্বর-বিজ্ঞান, ধাতুপ্রকরণ, ব্যাকরণ, ব্যাকরণ, ছন্দ, আচার, আইন, জ্যামিতি, খগোল ও দর্শনশাস্ত্র, এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি সংগৃহীত হইয়াছে। তাঁহাদের প্রত্যেকটীতে নূতন নূতন ভাব লক্ষিত হয়। আধুনিক পাঠকেরা এ সমস্ত মত অস্বীকার করিতে সমর্থ।

কর্মকাণ্ড প্রভৃতিতে বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ দেখা যায় না বলিয়া, আজিও তাঁহা আদৃত না হইলেও বলির উৎপত্তি ও উন্নতির বিষয় মানব-হৃদয়ের

ইতিহাসে একটি প্রয়োজনীয় অধ্যায় হইয়া উঠিয়াছে। এই বিষয় ভারতে জানিবার যেমন সুবিধা, আর কোথাও তেমন নহে।

যখন লিপিকার্য অগতে অবিদিত ছিল, তখন ভারতে স্বর-বিজ্ঞান সৃষ্ট হইয়াছিল। কারণ উহা দ্বারা ব্রাহ্মণেরা স্তোত্রের প্রকৃত উচ্চারণ রক্ষা করিতেন। খ্রীষ্ট জন্মাব্দ পঞ্চম শতাব্দী পূর্বের ভারতীয় স্বর-বিজ্ঞানবিৎগণকে ভাষার পদার্থ-বিভাগ বিষয়ে যে, অদ্যাপি পৃথিবীর কোন জাতি অতিক্রম করিতে পারে নাই একথা বলিলে বোধ হয়, হেমহোজ, বা এলিস্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রতিবাদ করিবেন না।

ব্যাকরণ বিষয়ে পাণিনির সূত্রে যেসকল ভাষা-তত্ত্ব সংগৃহীত ও বিস্তৃত হইয়াছে, কোনও পণ্ডিত অম্য কোনও ভাষার সেইরূপ আর একখানি গ্রন্থ দেখাইতে পারিবেন না, ইহা আমি সাহস করিয়া বলিতেছি।

ছন্দের বিষয়ে আধুনিক ছন্দকারেরা বলিয়া থাকেন যে, আদৌ সূত্য গীতের সহিত ছন্দের সম্বন্ধ ছিল। ভারতবর্ষের প্রাচীন লোকদিগের মত হইতেও আমরা ঠিক তাহাই বুঝিতে পারি। ছন্দগুলির নাম প্রবণ মায়েই তাহা উপলব্ধি হয়। ছন্দের সহিত পদবিক্ষেপার্থের সংশ্রব লক্ষিত হয়। বৃত্ত বৃত্ত-ধাতু হইতে নিম্পন্ন। এই ধাতুর অর্থে আদৌ নৃত্যকারীর শেষ ৩৪ পদ-বিক্ষেপ বুঝাইত এবং সেই বৃত্ত দেখিয়া নৃত্যের প্রকৃতি ও ছন্দ স্থিরীকৃত হইত। বেদে সচরাচর যে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের ব্যবহার দেখা যায় (১) তাহা ত্রিপদার্থে প্রযুক্ত হইত। ইহার বৃত্তে তিনটি করিয়া পদ থাকিত, যথা, ৮—

প্রাচীন সূত্রের মধ্যে জ্যামিতি ও ধগোল সম্বন্ধে যে যে মত দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমুদয় কতদূর প্রকৃত, তাহা বলিতে পারি না। হিন্দুরা কতকাল পরে গ্রীকদিগের নিকট যে, ঐ বিষয় শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। হিন্দুদিগের মধ্যে বেদী নির্মাণ লইয়া জ্যামিতি ও ২৭টি নক্ষত্র লইয়া ধগোল ছিল, একথা অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। শুষ্ক সূত্রে (২) এই প্রশ্ন দেখা যায় যে, একটি গোল বেদীর আরতনের সমান

(১) ন., ব., ধর্ম্মের অনুবাদ।

(২) এই সূত্র সর্বপ্রথম “পণ্ডিত” অধ্যাপক জি থিওট কর্তৃক সংস্কৃত ও অনুবাদিত হইয়াছিল।

করিয়া কিরূপে একটি বর্গক্ষেত্রাকার বেদী নির্মাণ করিতে হইবে ? ইহাতে বোধ হয়, এই অন্যই বৃত্তকে বর্গ করিবার প্রথম প্রয়াস হইয়া থাকিবে (১)। এই সকল প্রাচীন সূত্রে যে সকল পদের ব্যবহার দেখা যায়, তৎসমুদায় গৃহজাত বলিয়া বোধ হয়। তাহার প্রণিত-বিজ্ঞানের উৎপত্তি, সম্বন্ধীয় বিবরণ জানিবার ইচ্ছা করেন, এই সমস্ত সূত্র তাঁহাদের সমধিক যত্নের সহিত পর্যালোচনা করা উচিত।

জন্ম, উপনয়ন, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রভৃতি গার্হস্থ্য ব্যাপার সম্বন্ধে নিয়মাবলী, শিক্ষা-বিষয়ক নিয়ম, সামাজিক আচার ব্যবহার, উত্তরাধিকার, সম্পত্তি, কর ও শাসন-সংক্রান্ত রীতি নীতি প্রভৃতি গৃহ্য ও ধর্মসূত্র পাঠ করিয়া যেমন জানা যায়, তেমন আর কোথাও নহে। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রভৃতির প্রণীত নিয়ম এই সকল মূল গ্রন্থ হইতে সংকলিত হইয়াছে। সুতরাং উহাতে প্রাচীন সময়ের রীতি নীতি বর্ণিত হইলেও উহার অতি প্রাচীন কালের রচিত গ্রন্থ নহে।

এই সকল সূত্রমধ্যে (২) দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধেও কয়েকটি অধ্যায় নির্বেশিত হইয়াছে। দর্শনশাস্ত্র উপনিষদে অঙ্কুরিত হইয়া বড়দর্শনসূত্রে অতি বিশাল আকার ধারণ করিয়াছে। এই সকল সূত্র আধুনিক হইতে পারে (৩), কিন্তু

(১) গ্রীসেও ডেলিয়ানগণ একটি দৈবাদেশ পাইরাছিলেন যে, যদি তাঁহারা বর্তমান বেদী অপেক্ষা দ্বিগুণ বৃহৎ একটি বেদী নির্মাণ করেন, তবে তাঁহাদের এবং বাবতীয় গীক জাতির দুর্দশার ও বিপদের অপনয়ন হইবে। কিন্তু তাঁহারা জ্যামিতিতে অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত উহাতে কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। “পরে এতৎসম্বন্ধে তাঁহারা স্নেহের পরামর্শ চাহিলে তিনি তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, দৈবাদেশের জাৎপথ্য কেবল তোমাদিগকে যুগ্ম হইতে নিবৃত্ত করিয়া বিজ্ঞানশীলনে উৎসাহী করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। যেসের মঙ্গল চাহিলে বিজ্ঞানই উহার প্রধান সাধন।”

(২), “প্রাচ্য ধর্মগ্রন্থাবলী,” নামক গ্রন্থে জি. বুলার সাহেব কর্তৃক অনুবাদিত “আপস্তম্ব সূত্র” দেখ।

(৩) ৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে লাংথ্যকারিকা চীন ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। বিল সাহেবের বুদ্ধ-জিপিটকের ৮৪ পৃষ্ঠা দেখ। বিল সাহেব কোলত্রোককে লিখিয়া আমাইরাছিলেন তাঁহার মূল গ্রন্থের সহিত তদীয় “স্বর্ণ-সংগতি” শাস্ত্রের এক আছে। আমি এই অনুবাদের কাল এবং এই বিষয় স্বীকার করি।

উহা যে সময়েরই হউক, কসিন সাহেব বলেন, “ইহাতে অল্পের মধ্যে সমস্ত বিষয় একরূপ বিশদরূপে বর্ণিত ও নির্ণীত হইয়াছে যে, এক্ষণে দর্শনশাস্ত্র উপেক্ষিত হইলেও উহারা আমাদের বিশ্বয় উৎপাদন করিতেছে”।

২য়। ব্রাহ্মণকাল ৬০০-৮০০ খ্রীঃ পূঃ।

শ্রুতকালের অব্যবহিত পূর্বেই ব্রাহ্মণ-কাল। এই সকল ব্রাহ্মণ গদ্যে রচিত। কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রণালীতে ও কথঞ্চিৎ ভিন্নরূপ ভাষায় লিখিত। ইহার উদ্দেশ্যও ভিন্নরূপ। এই সকল গ্রন্থের অধিকাংশই স্বর-বোধক চিহ্ন দেখা যায়। এই সকল গ্রন্থে যাগযজ্ঞের নিয়ম সুন্দররূপে নির্দ্ধারিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে এবং তৎসমুদয়ের সমর্থন জন্য অনেক মহাত্মার নামও উল্লিখিত হইয়াছে। যাগযজ্ঞের বর্ণনা করা প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও সময়ে সময়ে উহাতে নানা বিচিত্র বিষয়ের সন্নিবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রুতে অনেক বিষয়ের সমর্থনস্থলেই ব্রাহ্মণের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণের পর শ্রুত হইয়াছে, ইহা স্বীকার না করিলে শ্রুত বোধগম্য হইয়া উঠে না।

ব্রাহ্মণের মধ্যে আরণ্যকের বিবরণ অতি সুন্দর। বানপ্রস্থ ধর্ম অবলম্বন করিতে হইলে যেক্রমে আত্মসংযম করিতে হয়, ইহাতে তাহার বিবরণ বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। অবশেষে উপনিষদে ইহার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। খ্রীঃ পূঃ ৬০০ অব্দে যদি শ্রুতকাল আরম্ভ হইয়া থাকে, তবে ব্রাহ্মণ-কালের উৎপত্তি ও বিবৃদ্ধি হইতে অন্যান্য ২০০ বৎসর লাগিয়া থাকিবে। ইহার মতের সমর্থনপ্রসঙ্গে যে সকল মহাত্মার নাম উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহারাও যে এ কালের কম সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। কিন্তু একরূপ কাল-নিরূপণে আমার বিশেষ প্রয়োজন নাই। ইহাতে কেবল স্মৃতিশক্তির সহায়তা হইতে পারে। সাহিত্যের যে স্তররাশি শ্রুতের নিম্নাংশে পতিত থাকিয়া স্বয়ং আর একটি স্তরোপরি স্থাপিত রহিয়াছে, তাহার নাম মন্ত্রকাল। ইহার বিশেষ বিবরণ অবগত হওয়াই আমার প্রধান উদ্দেশ্য।

## ৩য়। মন্ত্রকাল ৮০০-১০০০ খ্রীঃ পূ।

এই সময়ে বৈদিক স্তোত্র ও মন্ত্র সকল যে, ষথানিয়মে সন্নিবেশিত ও সংগৃহীত হইয়াছিল, ঋক, যজুঃ, সাম ও অথর্ব, এই চারি বেদে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। এই বেদচতুষ্টয় বোধ হয় ধর্মশাস্ত্র বা বলিপ্রকরণ প্রকটন উদ্দেশ্যেই সংগৃহীত হইয়াছিল। কোন্ শ্রেণীর ঋত্বিকগণ কোন কোন যজ্ঞে কোন্ কোন্ মন্ত্র ব্যবহার করিবেন, এক একটা বেদে তাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সামবেদ-সংহিতা (১) উদ্গাতার উচ্চাৰ্য্য স্তোত্রে পূর্ণ, এবং যজুর্বেদ-সংহিতা অধ্বর্য্যদিগের উচ্চাৰ্য্য স্তোত্রে ও মন্ত্রে পরিপূরিত। এই দুই খানি গ্রন্থের সন্নিবেশ-বিষয়ে কতকগুলি যজ্ঞের নিয়ম অনুসৃত হইয়াছে। ঋগ্বেদসংহিতা হোতৃদিগের পাঠ্য স্তোত্রে পূর্ণ। কিন্তু তৎসমুদয় কোন যজ্ঞের নিয়মানুসারে সন্নিবেশিত নহে। উহাতে নানা-বিধ ধর্মবিষয়ক ও প্রচলিত কবিতা আছে। অথর্ব বেদটা আধুনিক সংগ্রহ মাত্র। ইহাতে ঋগ্বেদের কবিতা ভিন্ন মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতি কুসংস্কার-পূর্ণ অনেক বিচিত্র কবিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আমরা কেবল সংহিতা-রচকদিগকে লইয়া বিচরণ করিতেছি না, যে ব্যক্তিসমূহ ঋত্বিকগণ এই দুইরূপ যজ্ঞের নিয়ম প্রণয়ন করিয়াছেন, কোন্ কোন্ আচার্য্যকে যজ্ঞের কোন্ কোন্ অংশ সম্পাদন করিতে হইবে, অবধারণ করিয়া দিয়াছেন এবং ধর্মশাস্ত্রীয় প্রাচীন কবিতার কোন্ কোন্ অংশইবা পঠিত ও গীত হইবে, তাহাও স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেই বিচরণ করা এখন আমাদের কার্য্য।

সৌভাগ্যের বিষয় এই, অপর এক শ্রেণীর ঋত্বিক আছেন যাঁহাদের জন্য কোন স্বতন্ত্র উপাসনা-গ্রন্থ নাই। তাঁহাদিগকে কেবল তাঁহাদের জাতীয় সমস্ত পৌরাণিক কবিতাগুলি কণ্ঠস্থ রাখিতে হইত। যাগযজ্ঞের সহিত কোন সংশ্রব নাই এরূপ অনেক প্রাচীন কবিতা তাঁহাদিগের দ্বারা এইরূপে রক্ষিত হইয়াছে। অপরূপের গ্রন্থ বেদ নামে অভিহিত হইলেও ঋগ্বেদই

(১) প্রায় ৭৫০টি কবিতা বা স্তোত্র ব্যতীত আর প্রায় সকল সামবেদসংহিতার কবিতাই ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রকৃত ঐতিহাসিক বেদ, এবং উহাতেই প্রাচীন কবিতা সকল বিস্তারিত  
রূপে সংগৃহীত হইয়াছে।

এই বেদ দশ ভাগে বিভক্ত এবং একই অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অধীনে  
সম্পাদিত হইলেও এক একটি ভাগ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্তোত্রের সংগ্রহ যাত্র (১)।  
উহা ভিন্ন ভিন্ন পরিবার মধ্যে সাদরে সংরক্ষিত হইত। পরিশেষে এই সকল  
কবিতা একত্রে সংগৃহীত হইয়া এক প্রকাণ্ড পবিত্র কবিতা-গ্রন্থ হইয়া  
উঠিয়াছে। এই কবিতার সংখ্যা ১০১৭ কি ১০২৮ হইবে।

যে সময়ে এই প্রাচীন স্তোত্রগুলি সংগৃহীত ও উল্লিখিত চারি শ্রেণীর  
ঋষিগণের জন্য উপাসনা গ্রহণকারে নিবদ্ধ হয়, সেই কালই মন্ত্রকাল  
নামে অভিহিত। এই কাল খ্রীঃ পূঃ ১০০০ হইতে ৮০০ অব্দ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

### ৪র্থ। ছন্দকাল, ১০০০ খ্রীঃ পূঃ।

এইজন্য কেবল ঋগ্বেদে বৈদিক কবিতা দৃষ্ট হয়, সেই রূপ বৈদিক কবিতার  
উৎপত্তি, বৈদিক ধর্মের জন্মবর্ধন এবং প্রধান প্রধান বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান-  
বিধি অনুান খ্রীঃ পূঃ ১০০০ অব্দে হইয়া থাকিবে। এই ছন্দকাল কত  
কাল হইতে বিস্তৃতি লাভ করিয়া আসিতেছিল, তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে?  
কেহ কেহ এমন মনে করেন যে, এই কাল খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর ২।৩ হাজার বৎসর  
পূর্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বৎসর বা শতাব্দী দ্বারা এই কালের পরিমাণ স্থির  
করিতে চেষ্টা করা কেবল অনুমান মাত্র—কুসৃতরাং বৃথা। স্তরে স্তরে চিন্তার  
উৎকর্ষে যে রূপে বৈদিক ধর্ম গঠিত হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান-প্রসঙ্গে  
এই সুদীর্ঘ কাল অবধারণ করাই শ্রেয় বলিয়া বোধ হয়।

যদি আমরাগকে এই কালের প্রকৃত দূরত্ব নির্ণয় করিতে হয়, তাহা  
হইলে ভাষা ও ছন্দের পরিবর্তন, কোন কোন স্তোত্রে স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত  
উত্তর পশ্চিম হইতে দক্ষিণ পশ্চিম স্থানের পরিবর্তন, কবিকথিত  
প্রাচীন এবং আধুনিক নীতিসমূহ রাজা বা দলপতিসমূহ

(১) অনুক্রমণীয় পরিভাষা দ্বারা ইহা নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে স্তোত্রোদ্ধৃতি  
সেবগণের শ্রেণী বিভাগ এবং ঐ বিভাগানুসারে প্রত্যেক মন্ত্রে যে-যে স্তোত্র শৃঙ্খলাবদ্ধ  
হইয়াছে তাহা পরিব্যক্ত আছে।



অণের সংশোধন, মানব-বিহিত আচার ব্যবহারের ক্রমবর্ধন এবং পরিশেষে আধুনিক স্তোত্র-লক্ষিত চতুর্বর্ণের উৎপত্তির প্রথম লক্ষণ প্রভৃতি পর্যালোচনা পূর্বক নির্ণয় করাই উচিত। ঋগ্বেদের সহিত অথর্ববেদের ভুলনা করিলে মনে হয়, ঋগ্বেদের আদি ভাব সকল অথর্বে বর্দ্ধিত হইয়াছে। অথর্ব ও যজুর্বেদের শেষ ভাগেও তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ইহাতেই বৈদিক সাহিত্যের ঐতিহাসিক উৎপত্তি-বিষয়ে বিশ্বাস জন্মে।

কেবল ভারতে কেন, সমস্ত আর্য্যজগতেও যে, ঋগ্বেদের ন্যায় প্রাচীন ও আদিম গ্রন্থ নাই, ইহা একবারে নিশ্চিত। এমন কি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আর্য্য ভাষার সহিত তাঁহাদের ভাষার সংগ্রহ দেখিয়া ঋগ্বেদকে তাঁহাদের আপন প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া স্পর্ধা করেন। যে ঋগ্বেদ তিন চারি হাজার বৎসর হইতে কোটি কোটি লোকের ধর্ম্মের ও নৈতিক জীবনের মূল স্বরূপ হইয়াছে, সে বেদ যে প্রচারিত ও প্রকাশিত হয় নাই, ইহা বলিলে আপাততঃ গল্প বলিয়া বোধ হইবে। ফলতঃ ইহা গল্প নহে। মৌভাগ্যক্রমে আমি এই সমস্ত বেদ মায়নাচার্য্যের টীকার সহিত প্রকাশিত ও প্রচারিত করিতে পারিয়াছি।

ঋগ্বেদে অনূন ১০১৭ কি ১০২৮টি স্তোত্র আছে এবং প্রত্যেক স্তোত্রে গড়ে ১০টি করিয়া কবিতা আছে। দেশীয় পণ্ডিতগণের মতে উহাতে অনূন ১৫৩,৮২৬ শব্দ আছে।

### বেদ জন-শ্রুতিক্রমে আগত।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এত প্রাচীন সাহিত্য কিরূপে রক্ষিত হইয়া আসিতে ছিল? বর্তমান কালে বেদের পাণ্ডুলিপি দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু খ্রীষ্ট শকের ১,০০০ বৎসরের পূর্বে ভারতীয় সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি প্রাপ্য নাই। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রারম্ভের বা বৈদিক সাহিত্যের শেষ সময়ের পূর্বে যে, ভারতে লিপি-প্রণালী প্রচলিত ছিল, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে কিরূপে ব্রাহ্মণ, যজ্ঞ ও প্রাচীন স্তোত্রাদি বিদ্যমান ছিল? পূর্বে কেবল শ্রুতি-শক্তির বলেই উহা থাকিত। এই সমুদয় স্মরণ রাখিবার জন্য বিশেষ নিয়ম নির্দ্ধারিত ছিল। আমরা পাঠশালায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে

যে সময় অতিবাহিত করি, ভারতের উচ্চ তিন বর্ণের বংশ-সম্বৃত সন্তানেরা সে সময়ের মধ্যে কোন গুরুত্বপূর্ণ স্থান হইতে বেদ অধ্যয়ন করিতেন। ইহা তাঁহাদের পবিত্র কর্তব্য বলিয়া নির্ধারিত ছিল। এই পবিত্র কর্তব্যে লিপিত-প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদিগকে সমাজে স্থানিত হইতে হইত। লিপিত-প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদিগকে সমাজে স্থানিত হইতে হইত। লিপিত-প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদিগকে সমাজে স্থানিত হইতে হইত। লিপিত-প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদিগকে সমাজে স্থানিত হইতে হইত।

শুনিতে পাওয়া যায়, ভারতে বৈদিক ধর্ম লুপ্ত হইয়াছে। উহা বৌদ্ধ ধর্ম কর্তৃক পরাস্ত হইয়া আর মস্তকোত্তলন করিতে পারে নাই, এবং আধুনিক ব্রাহ্মণ-ধর্ম কেবল শিব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবপূজা-বিধি-পূর্ণ পুরাণ (১) এবং তন্ত্রের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে। স্থূলদর্শী ব্যক্তিগণ এরূপ বলিতে পারেন বটে, কিন্তু ইংলণ্ডের যে সকল লোকের সহিত ভারতের বিশেষ সংশ্লিষ্ট আছে, এবং যে সকল ভারতবাসী শিক্ষিত ব্যক্তি এখানে মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকেন, তাঁহারা এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিবরণ দিয়া থাকেন। বৌদ্ধদিগকর্তৃক পরাস্ত হইয়া ব্রাহ্মণ ধর্ম অনেক রূপান্তর, ধারণ করিয়াছে। সত্য বটে উহাকে ভিন্ন অবস্থার অনুবর্তী হইতে হইয়াছে,

---

(১) আমরা বর্তমান পুরাণ হইতে প্রাচীন প্রবাদে পরিচিত অথর্ববেদোক্ত মূল পুরাণ বাছিয়া লইব। ১১শ, ৭, ২৪, রিচা: সামানি ছন্দাংসি পুরাণং যজুসা সহ; ১৫শ, ৬, ৪, ইতিহাস: পুরাণঞ্চ গাথা চ নারাদংসিচ্চ। অতি প্রাচীনকাল হইতেই যে গল্পময় ইতিহাস ব্রাহ্মণগণের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল, তাহা পুরাণ হইতে বিভিন্ন (গৃহ্য সূত্র ৩য়, ৩; দেখ)। পুরাণ ও ইতিহাসাদি কেবল ব্রাহ্মণ ও অস্টোত্তি প্রভৃতি ক্রিয়ায় সময়েই আবৃত্তি হইত, গৃহ্য সূত্র ৪র্থ ৬, ৬। অনেক সময় ব্যবহারশাস্ত্রও পুরাণের উপর নির্ভর করিত। উহা বেদ, ধর্মশাস্ত্র এবং বেদান্ত হইতে পৃথক, গৌতম, ১১ ম, ১২। আপস্তম্বের ধর্মসূত্রে পুরাণ হইতে উদ্ধৃত অংশ নিবেশিত আছে, ১ম ১৯, ১৩; ২য়, ২৩, ৩; এ তলিও ছন্দোবদ্ধ, প্রথম মনুতে (৪র্থ, ২৪৮, ২৪৯) এবং শেষে বাজবল্ক্য (৩য়, ১৮৬) উক্ত হইয়াছে। উহাতে গদ্যাংশ উদ্ধৃত দেখা যায়। আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ১ম, ২৯, ৭। পুরাণ উহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। জৈমিনীর সময়েও পুরাণের তাদৃশ আদর দৃষ্ট হয় না, এবং কি তিনি তাহার মীমাংসা গ্রহণ পুরাণের নামও করেন নাই।



এবং ব্রাহ্মদিগ-কর্তৃক ভারতবর্ষ অধিকৃত হইবার পূর্বে ইহার স্থানে স্থানে যে  
যে ধর্ম প্রচলিত ছিল, ব্রাহ্ম-ধর্ম তৎপ্রতিও উদাসীনা প্রকাশ করিয়াছে,  
ব্রাহ্মগণ সমস্ত ভারতবর্ষে ধর্মগত বিশ্বাসে একতা স্থাপনে, ধর্মীয়গত  
পরীক্ষণে, বা নাস্তিকতা দমনেও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন না। কিন্তু গত  
দুর্ভিক্ষের সময় যবনের হস্তের খাদ্য খাওয়া অপেক্ষা অনেকে মৃত্যুকেও  
শ্রেয় জ্ঞান করিয়াছিলেন কিরূপে (১) ? অনাহার-কষ্ট-সহিষ্ণু যাজক  
ইউরোপে বা অন্য কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় কি ? ভারতে যাজকদিগের  
প্রভুত্ব আজিও প্রবল রহিয়াছে। আচার ব্যবহার, জনশ্রুতি ও কুসংস্কারের  
প্রবল প্রতাপে উহা আরও সুদৃঢ় হইয়াছে। যাঁহারা দীক্ষা-গুরু বলিয়া  
মনোনীত হন, তাঁহারা বেদের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া থাকেন। বেদের  
সহিত তন্ত্র, পুরাণ বা মন্ত্র কোন স্থানের অনৈক্য হইলে তাহা তৎক্ষণাৎ  
পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। যে সকল ব্রাহ্ম শ্রুতি ও শ্রুতির সমাদর করেন,  
এই ঘোর কলিযুগে স্বেচ্ছ-প্রাধান্যকালেও তাঁহাদিগকে কলিকাতার  
দরবার-গৃহে উপস্থিত হইতে দেখা যায় না। তাঁহারা ভিক্ষাজীবী  
হইয়া পল্লীতে একাকী চতুষ্পাঠীতে কাল কাটাইয়া থাকেন। তাঁহাদের  
একুপ বিশ্বাস যে, নাস্তিকের সহিত কথা কহিলে গৌরবের লাঘব হয়।  
সুতরাং তাঁহারা ইউরোপ-বাসীদের সহিত সহজে কথা কহেন না। কিন্তু  
সংস্কৃত-পারদর্শী ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের সঙ্গে কখনও আলাপ পরিচয় হইলে  
আশ্চর্য্যান্বিত হন, এবং তাহাদিগকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইলে অবশেষে প্রাচীন  
জ্ঞানের অতুল ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডারের ন্যায় হৃদয়-দ্বার খুলিয়া বসেন। ইহারা  
ইংরেজী বা বাঙ্গালায় কথা কহেন না। ইহারা সংস্কৃত কহেন এবং সংস্কৃতই  
লিখিয়া থাকেন। আমি সময়ে সময়ে ইহাদের নিকট হইতে অতি পরিপাটি ও  
নির্দোষ সংস্কৃত পত্র পাইয়া থাকি। আমার অদ্ভুত গল্প এখনও শেষ হয় নাই।  
তিন চারি হাজার বৎসর পূর্বে ইহাদের পূর্বপুরুষগণ যেমন সমস্ত ঋগ্বেদ  
জানিতেন, তেমনি ইহারাও সমস্ত ঋগ্বেদ আয়ত্ত করিয়াছেন। মুদ্রিত বেদ

(১) ইহাই আশ্চর্য্য যে, দুর্ভিক্ষের সময়েও অণুচি হস্তের অন্ন গ্রহণ পাপ বলিয়া  
গণ্য—সাধারণে একুপ ধারণার বশবর্তী রহিয়াছে; কোন ধর্মগ্রন্থে এ সম্বন্ধে কিছুই দৃষ্ট  
হয় না। বরং শ্রুতি ও শ্রুতিতে এ মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধপক্ষ সমর্থিত হইয়াছে।

ও তাহার হস্ত লিপির অভাব নাই, তথাপি ইহারা ইহাদের সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বের পূর্বপুরুষদের ন্যায় গুরু মুখে শুনিয়া সমস্ত ঋগ্বেদ অভ্যাস করেন। বেদ-শিক্ষার সম্বন্ধে প্রাচীন রীতি রক্ষার জন্যই ইহারা এইরূপ করিয়া থাকেন (১)। এইরূপ বেদ-শিক্ষা ইহারা পুণ্য কৰ্ম বলিয়া মনে করেন। যদিও দিন দিন ইহাদের সংখ্যার হ্রাস হইতেছে, তথাপি ইহাদের ক্ষমতা ও প্রাধান্য পূর্ববৎ রহিয়াছে। সমুদ্র পারে যাইতে অনিচ্ছুক বলিয়া ইহারা ইংলণ্ডে আইসেন না। ইহাদের কোন কোন ছাত্র দেশীয় ও বিদেশীয় পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষিত হইয়া এখন দেশান্তর গমনে কুণ্ঠিত হন না। আমি এমন অনেক ভারতবর্ষীয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি, যাহাদের বেদের অধিকাংশই কণ্ঠস্থ আছে। এমন অনেক লোকের সঙ্গে আমার চিঠি পত্র লেখা লেখি হয়, যাহারা ছাদশ কি পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে সমস্ত বেদ আবৃত্তি করিতে পারিতেন (২)। তাহারা প্রতিদিন কয়েক পঙক্তির শিক্ষা করেন এবং কয়েক ঘণ্টা কাল ধরিয়া তাহা উচ্চারণ করিতে থাকেন। উচ্চারণ-শব্দে সমস্ত গৃহপ্রতিধ্বনিত হইতে থাকে, এইরূপ শিক্ষা-পদ্ধতি তাহাদের স্মরণ-শক্তি আরও সুদৃঢ় করিয়া তুলে। তাহাদের পাঠ সমাপ্ত হইলে তাহারা এক এক খানি জীবিত বেদস্বরূপ হইয়া উঠেন। বেদের অন্তর্গত যে অংশ জিজ্ঞাসা করা যায়, তাহার স্বরগ্রাম ঠিক রাখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহারা

---

(১) এই মৌখিক শিক্ষার বিষয় ঋগ্বেদের প্রতিশাখ্যে বিবৃত আছে। সম্ভবতঃ ইহা খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম কি ষষ্ঠ শতাব্দীর সময়ের হইবে। ব্রাহ্মণে ইহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে; কিন্তু ইহা তাহা হইতেও প্রাচীন সময়ের; কারণ ঋগ্বেদের একটা স্তোত্রে (৭ম, ১০৩) বর্ষাগম এবং তজ্জনিত উন্নাস ও ভেকগণের মক্ মক্ শব্দের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। এতৎসম্বন্ধে লেখা আছে—“একটা ভেক আর একটা ভেকের ঠিক অনুকরণ করিতেছে, যেমন ছাত্র শিক্ষকের উচ্চারিত কথার পুনরুচ্চারণ করে।” ছাত্রের নাম শিক্ষমান। শিক্ষকের নাম শস্ত্র; শিক্ষাও এই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ইহা আধুনিক সময়ের শব্দবিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দে পরিচিত হইতেছে।

(২) “ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারী” ১৮৭৮ অঙ্গ। ১৪০ পৃষ্ঠা। এই পত্রের সম্পাদক বলেন, “এমন সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ আছেন, সমগ্র ঋগ্বেদ যাহাদের জিহ্বাগ্রে রহিয়াছে। যখন ইচ্ছা হয়, তখনই ইহারা ঋগ্বেদের সাহায্য না লইয়া অনাগ্রাসে স্তোত্রাবলী আবৃত্তি করিতে পারেন।”

সেই অংশ আবৃত্তি করেন। শঙ্কর পাণ্ডুরং নামক জনৈক ভারতীয় পণ্ডিত আমার ঋগ্বেদের সংস্করণ জন্য পাঠ সংগ্রহ করিতেছেন। লিখিত কি মুদ্রিত বিভিন্ন ঋগ্বেদ হইতে এই পাঠ সংগৃহীত হইতেছে না। কেবল বৈদিক শ্রোত্রীয়দের মুখে শুনিয়া তিনি উহা সংগ্রহ করিতেছেন। গত ১৮৭৭ অব্দের ২রা মার্চ আমি তাঁহার এক খানি পত্র পাই, তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন, “আপনার ঋগ্বেদের মূল অবলম্বন করিয়া আমি এই বেদের অনেক ভ্রমশীল পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিতেছি, কিন্তু তাহাতে অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হইতেছে। বোধ হয় শীঘ্রই পরীক্ষা করিয়া বলিতে পারিব যে, তৎসমুদয় ঐ বেদের ভিন্ন ভিন্ন পাঠ কি না। আপনাকে এই বিষয় না জানাইয়া আমি প্রকাশ্যরূপে উহার কোন ব্যবহার করিব না। আমি যখন আপনার জন্য পাঠ সংগ্রহ করি, তখন একজন বৈদিক শিষ্য উহা পরীক্ষা করেন। তাঁহার পাশ্বে তাঁহার পাণ্ডুলিপি সকল থাকে মাত্র, কিন্তু তিনি প্রায়ই তাহা খুলেন না, সমস্ত সংহিতা তাঁহার কণ্ঠস্থ রহিয়াছে। এই যজ্ঞোপবীতধারী, ধূতি-পরিহিত প্রাচীন ঋষির প্রতিকৃতি স্বরূপ বেদ-পাঠকের মূর্তি আপনাকে দেখাইতে ইচ্ছা হইতেছে।”

তিন চারি হাজার বৎসর হইতে যে স্তোত্রাবলী মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে, যিনি ভারতীয় আকাশতলে বসিয়া সেই পবিত্র স্তোত্রমালা আবৃত্তি করিতেছেন, সেই অর্দ্ধ-উলঙ্গ হিন্দুর বিষয় ভাবিয়া দেখুন। যদি লিপি-প্রণালী উদ্ভাবিত না হইত, যদি মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি না হইত, যদি ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের অধিকারে না থাকিত, তাহা হইলে এই তরুণবয়স্ক ব্রাহ্মণ-কুমার তাঁহার সহস্র সহস্র সমপাঠীর সহিত সমবেত হইয়া, যে গান পঞ্জাবের সরস্বতী প্রভৃতি নদীর তীরে বসিয়া একদিন বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিগণ গাইয়াছিলেন, আজিও সেই বেদ গান করিতেন। দেশ, কাল, বর্ণ ও ধর্ম আমাদের অপেক্ষা পৃথগ্ভূত হইলেও যে মানব-হৃদয় সর্বত্রই একরূপ, সেই মানব-হৃদয়ের গভীর গুপ্ত বিষয় বুঝিবার আশায় আমরা ইউরোপের—সমস্ত পৃথিবীর জ্ঞান-গরিমার কেন্দ্র-ভূমি ওয়েস্টমিন্স্টার আবির ছায়ায় বসিয়া মনে মনে সেই পবিত্র স্তোত্র গুণিতেছি, এবং তৎসমুদয় বুঝিবার (সময়ে সময়ে তাহা অতি দুর্কোধ্য হইয়া উঠে) চেষ্টা করিতেছি।

আজ আমি আপনাদের সমক্ষে এই গল্প বলিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। আপনাদের কেহ কেহ ইহা উপন্যাসের কথা মনে করিতে পারেন। 'আমার কথায় বিশ্বাস করুন, সমসাময়িক ইতিহাসের অধ্যায় অপেক্ষাও ইহা অধিকতর সত্য।

---

## পূর্ব প্রস্তাবের পরিশিষ্ট ।

আমি উল্লেখ করিয়াছি যে, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য লোকের মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছে এবং আজ পর্যন্তও এই ভাবে উক্ত সাহিত্য রক্ষিত হইতেছে। আমার এই কথায় কেহ কেহ বিশ্বাস স্থাপন করিতে চাহেন না দেখিয়া, আমি ঋগ্বেদের প্রতিশাখ্য হইতে কতিপয় অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। ঋগ্বেদের অন্ততঃ পাঁচ শত বৎসর পূর্বে বেদ রূপে মুখে মুখে শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহা ইহাতে জানা যাইবে। বর্তমান সময়ে রূপে এই পদ্ধতি রক্ষিত হইতেছে, তাহা দেখাইবার জন্য দুইজন ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতের লিখিত বিবরণও এই স্থলে প্রদত্ত হইল।

ঋগ্বেদের প্রতিশাখ্যে উক্ত বেদের উচ্চারণ-বিধি কথিত হইয়াছে। যাস্ক ও পাণিনি এই দুই ব্যক্তির আবির্ভাব-সময়ের মধ্যে খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাচীন প্রতিশাখ্য লিখিত হইয়া থাকিবে। অন্য বলবৎ প্রমাণের অভাবে উপরিউক্ত অনুমিত কালই সত্য বলিতে হইবে। প্রাচীন ভারতের শিক্ষা-গৃহে কি পদ্ধতি অবলম্বিত হইত, উক্ত প্রতিশাখ্যের পঞ্চদশ অধ্যায়ে তাহার বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। শিক্ষককে নির্দ্ধারিত সমস্ত বিষয়ে পারদর্শী হইতে হইত। ব্রহ্মচারীর করণীয় সমুদয় কার্য সম্পন্ন না করিলে কোন শিক্ষকই অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত হইতে পারিতেন না। আবার শিক্ষক সমুদয় ব্রতপালনোন্মুখ ছাত্র ব্যতীত অন্য কাহাকে শিক্ষা ও দিবেন না। আচার্য্য উপযুক্ত স্থানে বাস করিবেন। যদি তাঁহার একটা বা দুইটা শিষ্য থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা দক্ষিণে উপবেশন করিবে। তাহার অধিক হইলে তাহাদিগকে স্থানের সচ্ছলতা বিবেচনায় বসিতে হইবে। প্রত্যেক নূতন পাঠ আরম্ভ করিবার পূর্বে ছাত্রগণকে গুরুদেবের পদবন্দনা করিয়া “পাঠ আরম্ভ করুন” বলিতে হইবে। তৎপরে শিক্ষক “ওঁ হ্রী” বলিয়া উত্তর দিয়া দুইটা কথা উচ্চারণ করিবেন। কথাটি সংযুক্ত বর্ণ-বিশিষ্ট হইলে কেবল একটা মাত্র উচ্চারণ করিবেন। অধ্যাপক দুই একটা কথা

উচ্চারণ করিলে পর প্রথম ছাত্র প্রথম কথাটি পুনরায় উচ্চারণ করিবেন। কিন্তু উহার অর্থবোধনা হইলে পুনরায় “মহাশয়” বলিয়া সোধন করিবেন। এবং অধ্যাপক উহার ব্যাখ্যা করিয়া “ওঁ হাঁ—মহাশয়” বলিবেন।

একটি প্রশ্নের মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ অধ্যাপনা চলিতে থাকিবে। এই রূপ প্রশ্ন সচরাচর তিনটি পদ লইয়া গঠিত হয়। কিন্তু যদি চল্লিশ কি বিয়াল্লিশ শব্দের ছন্দোবদ্ধ বাক্য হয়, তাহা হইলে তাহার দুইটি বাক্য লইয়া একটি প্রশ্ন হইবে। আর যদি চল্লিশ কি বিয়াল্লিশ শব্দের পঙ্ক্তি ছন্দে সকল-গুলিই হয়, তাহা হইলে উহার দুই তিনটি লইয়া একটি প্রশ্ন হইবে। কিন্তু যদি একটি স্তোত্রে একটি মাত্র বাক্য থাকে, তবে উহাও একটি প্রশ্ন বলিয়া পরিগণিত হইবে। প্রশ্নটি শেষ হইলে পর শিষ্যদিগকে উহা আর একবার অভ্যাস করিতে হইবে, এবং প্রত্যেক শব্দ উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিয়া কণ্ঠস্থ রাখিতে হইবে। যতক্ষণ সমস্ত পাঠ সমাপ্ত না হইবে, ততক্ষণ অধ্যাপক একে একে সকল ছাত্রকে তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে লইয়া গিয়া এক একটি প্রশ্ন করিবেন। ৬০টি প্রশ্ন লইয়া এক একটি পাঠ হইবে। মঙ্গলশেষের বাক্যটি শেষ হইলে অধ্যাপক বলিবেন, “মহাশয়” এবং শিষ্য “ওঁ হাঁ মহাশয়” বলিয়া পাঠের মঙ্গলশেষ বক্তব্য বাক্যটি উচ্চারণ করিবেন। পরে ছাত্রবর্গ অধ্যাপকের চরণ বন্দনা করিয়া বিদায় লইবেন। ২১, ০৬৪

পাঠ সম্বন্ধে সাধারণতঃ এই সকল নিয়ম অবলম্বিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাতিশাখ্যে এসম্বন্ধে আরও অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নিয়ম দৃষ্ট হয়। এমন কি ছোট কথা পরিত্যক্ত হইবার ভয়ে অধ্যাপককে দীর্ঘ উচ্চারণবিশিষ্ট বা একস্বর-বর্ণ-সংযুক্ত শব্দকে দুই বার উচ্চারণ করিতে হইবে। কতকগুলি ছোট কথার পর “ইতি” শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে, এবং আর কতকগুলি কথার পর “ইতি” শব্দ প্রযুক্ত হইলে ঐ কথা পুনরায় উচ্চারণ করিতে হইবে। যথা—“চ ইতি চ”

আর অর্দ্ধ বৎসর ব্যাপিয়া এইরূপ অধ্যাপনা-কার্য চলিত। সচরাচর ব্রূষা কালেই পাঠ আরম্ভ করিবার রীতি ছিল। অনেক পক্ষদিনে পাঠ বন্ধ থাকিত। এই সম্বন্ধে গৃহ ও ধর্মসূত্রে অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নিয়ম দেখা গিয়া থাকে।

খ্রীষ্টের ৫০০ বৎসর পূর্বে কিরূপে অধ্যাপনা-কার্য চলিত, তৎসম্বন্ধে এই চিত্রই বোধ হয় পর্যাপ্ত হইবে। এখন বর্তমান সময়ে এই প্রাচীন শিক্ষা-প্রণালীর কি কি অংশ অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহা দেখা যাউক।

১৮৭৮ অব্দের ৮ই জুন ষড়দর্শনচিন্তনিকার সুশিক্ষিত-সম্পাদক মহাশয় পুণা হইতে যে পত্র লিখেন, তাহা এই—

“যদি ঋগ্বেদ পাঠক বুদ্ধিমান ও অধ্যবসায়ী হন, তাহাহইলে তাঁহার দশ গ্রন্থ পাঠ করিতে অন্যান ৮ বৎসর লাগে। দশগ্রন্থে এই সকল বিষয় আছে। যথা—

১। সংহিতা বা স্তোত্র।

২। ব্রাহ্মণ। যজ্ঞাদি সম্বন্ধে গদ্য গ্রন্থ।

৩। আরণ্যক বা অরণ্য গ্রন্থ।

৪। গৃহ্যসূত্র। সাংসারিক আচার ব্যবহারের নিয়ম।

(৫-১০) ষড়ঙ্গ, শিক্ষা, জ্যোতিষ, কল্প, ব্যাকরণ, নিঘণ্টু ও নিরুক্ত, এবং ছন্দ।

এই ৮ বৎসরের মধ্যে অনধ্যায় বা পর্কদিন বাদে শিষ্যকে সকল দিনই পড়িতে হয়। এক চাক্স বৎসরে ৩৬০ দিন, সূত্রাং ৮ বৎসরে ২৮৮০ দিন হয়। তন্মধ্যে ৩৮৪ পর্কদিন বাদ দিলে ৮ বৎসরে ২৪৯৬ দিন পাঠাভ্যাসের জন্য থাকে।

এখন এই দশ গ্রন্থে স্থূল স্থূল হিসাবে ২৯,৫০০ শ্লোক থাকিলে ঋগ্বেদ-পাঠককে প্রতিদিন ১২টী করিয়া শ্লোক পড়িতে হয়। প্রতি শ্লোকে ৩২টী করিয়া শব্দ আছে।

আমি কিরূপে এতবিষয়ক বিবরণ জানিয়াছি, তাহা বলা আবশ্যক। পুণা নগরীতে বেদশাস্ত্রোত্তেজক সভা নামে আমাদের একটি সভা আছে। এই সভা প্রতিবৎসর সংস্কৃতবিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য অনেক পুরস্কার বিতরণ করিয়া থাকেন। ষড়দর্শন, অলঙ্কার শাস্ত্র, বৈদ্যক শাস্ত্র, জ্যোতিষ, পদ্য ক্রম, ঘন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী অনুসারে বেদ পাঠ, এবং ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে দশ গ্রন্থে যে যে বিষয় উক্ত হইয়াছে, সাধারণতঃ তৎসমুদয়ের জন্য এই সকল পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে। একটি পরীক্ষক-সমিতি



পুরস্কার যোগ্য ব্যক্তিদিগকে নির্বাচন করেন। প্রক্রিয়া (শাস্ত্রের উপপত্তি-মূলক জ্ঞান,) উপস্থিতি (শাস্ত্রগত সাধারণ জ্ঞান), এবং গ্রন্থার্থ পরীক্ষা (ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র-সংক্রান্ত গ্রন্থ হইতে বাক্য-রচনা) এই তিন বিষয়ে প্রত্যেক শাস্ত্রে তিন প্রকার প্রশ্ন দেওয়া হয়। পুণার সম্ভ্রান্ত ভদ্ৰ লোকেরা ইহাতে প্রায় ১০০০ সহস্র মুদ্রা বিতরণ করিয়া থাকেন। গত ৮ই মে যে সভা হয়, তাহাতে প্রায় ৫০ জন সংস্কৃত ও বৈদিক পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে পুণা নগরীর এক মহামান্য প্রাচীন বৈদিক পণ্ডিতের নিকট এই সকল বিষয় অবগত হইয়াছি।”

এতৎ সম্বন্ধে অধ্যাপক রামকৃষ্ণ গোপাল ভণ্ডারকর, এম্.এ, (ইণ্ডিয়ান এন্টিকোয়ারী ১৮৭৪, পৃঃ ১৩২) আর একটা আমোদ-জনক বিবরণ লিখিয়াছেন;—

“প্রত্যেক ব্রাহ্মণ-বংশ কোন এক বিশেষ বেদ এবং বেদের কোন এক বিশেষ শাখা অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকেন। সেই সেই বেদের সূত্র অনুসারে এই ব্রাহ্মণ বংশের গার্হস্থ্য ব্যাপারও সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে বেদ কণ্ঠস্থ করিবার নাম “বেদপাঠ করা”। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীর আবাসভূমি বারাণসী ব্যতীত উত্তর ভারতের আর সকল স্থানে এই বেদ পাঠ একরূপ বিলুপ্ত হইয়াছে। এই সকল স্থানে কেবল গুরু যজুর্বেদ এবং তাহার মাধ্যন্দিন শাখা প্রচলিত আছে। গুজরাটেও অনেককে বেদাধ্যয়ন করিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু মহারাষ্ট্রদেশেই ইহার বহুল প্রচার দৃষ্ট হয়। তৈলঙ্গেও বেদের আলোচনা হইয়া থাকে। তৈলঙ্গে অদ্যাপি এমন অনেক ব্রাহ্মণ আছেন, যাহারা সমস্ত জীবন বেদাধ্যয়নে অতিবাহিত করিয়া থাকেন। তাঁহারা দান প্রাপ্তির জন্য সমস্ত দেশে ভ্রমণ করেন। সম্পন্ন লোকেরা তাঁহাদের মুখে বেদ শুনিয়া আপনাদের সামর্থ্য অনুসারে তাঁহাদিগকে অর্থ দিয়া থাকেন। এই বেদের মধ্যে কৃষ্ণযজুঃ এবং আপস্তম্ব সূত্রই অধিক প্রচলিত। এখানে এমন সপ্তাহ নাই, যে সপ্তাহে তৈলঙ্গ হইতে ব্রাহ্মণেরা দক্ষিণা গ্রহণ জন্য আমার নিকট না আইসেন। আমি এই সুযোগে তাঁহাদের মুখে বেদ শুনিয়া আমার নিকট যে মুদ্রিত বেদ আছে, তাহার পাঠের সহিত তৎসমুদয়ের তুলনা করিয়া থাকি।



‘বৈদিক ব্রাহ্মণেরা আচার ভেদে সাধারণতঃ গৃহস্থ ও ভিক্ষুক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। গৃহস্থেরা সংসার-যাত্রা নির্বাহ করেন এবং ভিক্ষুকেরা ধর্ম-কর্মের অন্বেষণ ও বেদ পাঠ করিয়া কালাতিপাত করিয়া থাকেন।

‘সম্ভাষননার প্রণালী বেদ-বিশেষে বিভিন্ন হইলেও উভয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা প্রতিদিন তাহা উচ্চারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু এই অন্বেষণের প্রধান অংশ গায়ত্রী মন্ত্র—“তৎসবিতুর্বরেন্যম্” ইত্যাদি, সকলকেই আবৃত্তি করিতে হয়। কেহ ৫ বার, কেহ ১০ বার, কেহ ২৮, কেহ বা উহা ১০৮ বার আবৃত্তি করেন।

‘এতদ্ব্যতিরিক্ত অনেকেই প্রতিদিন ব্রহ্মযজ্ঞ সম্পাদন করিয়া থাকেন। সময়ে সময়ে উহা সকলেরই কর্তব্য হইয়া উঠে। ঋগ্বেদাদিগকে উহার অন্বেষণ করিতে হইলে, প্রথম মণ্ডলের প্রথম স্তোত্র, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রারম্ভের অংশ, ঐতরেয় আরণ্যকের পাঁচ অংশ, যজুঃসংহিতা, সাম-সংহিতা, অথর্বসংহিতা, আশ্বলায়ন কল্প সূত্র, নিরুক্ত, ছন্দ, নিঘণ্টু, জ্যোতিষ, শিক্ষা, পাণিনির সূত্র, যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি, মহাভারত এবং কণাদ, জৈমিনি ও বাদরায়ণের সূত্র আবশ্যক হয়।

‘যে সকল ভিক্ষুক সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা প্রথম স্তোত্র পাঠ করিবার পরে ও ইচ্ছামত পরের অনেক স্তোত্র আবৃত্তি করিয়া থাকেন।

‘যাজ্ঞিক বলিয়া কতকগুলি ভিক্ষুক আছেন। তাঁহারা পৌরহিত্য কর্ম করিয়া থাকেন। তাঁহারা বেদোক্ত ধর্ম-কর্মের অন্বেষণে অতি দক্ষ। কিন্তু ভিক্ষুকদের মধ্যে বৈদিক নামে আর এক সম্প্রদায় আছে। ইহাঁদের অনেকে আবার যাজ্ঞিক। বেদ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখা এবং উহা অভ্রান্ত রূপে পাঠ করাই ইহাঁদের জীবনের একমাত্র কর্তব্য কর্ম। ভাল ঋগ্বেদী বৈদিকের সংহিতা, স্তোত্রের পদ, ক্রম, গতা, ঘন, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, কল্প এবং আশ্বলায়নের গৃহ্যসূত্র, নিঘণ্টু নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, শিক্ষা এবং পাণিনির ব্যাকরণ কণ্ঠস্থ থাকে। তাঁহাকে জীবিত বৈদিক পুস্তকালয় বলা যাইতে পারে।

‘স্তোত্র সমূহের বিন্যাসের জন্য সংহিতা, পদ, ক্রম, গতা ও ঘন এই ভিন্ন ভিন্ন নাম স্থান পরিগ্রহ করিয়াছে।

‘সংহিতাতে সমস্ত কথাই সংস্কৃতের উচ্চারণ অনুসারে যুক্ত হইয়াছে।

“পদে” বাক্য সকল বিভক্ত এবং সমাসবাক্য বিযুক্ত হইয়াছে।

‘মনে করুন এক পঙ্ক্তিতে এগারটি কথা আছে। সন্ধির সূত্র অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া তৎসমুদয় ক্রমে এইরূপ বিন্যস্ত হয় :—

১, ২; ২ ৩; ৩ ৪; ৪, ৫; ৫, ৬; ৬; ৭; ৭ ৮; ইত্যাদি। প্রত্যেক ছন্দো-বদ্ধ বাক্যের শেষ কথা ও প্রত্যেক বাক্যার্দ্ধের শেষ কথাও “ইতি” শব্দের সহিত পুনরুচ্চারিত হয়।

সংহিতা, পদ ও ক্রম এই তিনটি অঙ্গকৌশলময়। এগুলি ঐতরের আরণ্যকে ভিন্ন নামে উক্ত হইয়াছে। এই নাম অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। সংহিতা নির্ভূজ নামে উক্ত হইয়াছে। পদ প্রতিপদ নামে এবং ক্রম উত্থঃ অন্তরেণ অর্থাৎ উভয়ের মধ্য নামে অভিহিত হইয়াছে (১)।

গতায় বাক্যসমূহ নিম্নলিখিত রূপ বিন্যস্ত হইয়া থাকে :—

১,২,২, ১,১,২;২,৩,৩,২,২,৩; ৩,৪,৪,৩,৩, ৪; ইত্যাদি। প্রত্যেক ছন্দোবদ্ধ বাক্য ও বাক্যার্দ্ধের শেষ দুটি কথা “ইতি” শব্দের সহিত পুনরুচ্চারণ করিতে হয়।

ঘনতে বাক্য-বিন্যাসের নিয়ম :—

১,২,২,১,১,২,৩,৩,২,১,১,২,৩;২,৩,৩,২,২,৩, ৪,৪,৩,২,২,৩; ২,৩,৩,২,২,৩,৪, ৪,৩, ২, ২, ৩,৪;৩, ৪,৪, ৩, ৩, ৪,৫,৫,৪, ৩, ৩, ৪, ৫; ইত্যাদি।

প্রত্যেক ছন্দোবদ্ধ বাক্য ও বাক্যার্দ্ধের শেষ দুটি কথা “ইতি” শব্দের সহিত পুনরায় আবৃত্তি করিতে হয়।

যথা:—৭,৮,৮,৭,৭,৮; ৮ ইতি ৮; আবার ১০, ১১, ১১, ১০, ১০, ১১; ১১ ইতি ১১। ইহাতে সমাস-বাক্য বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে।

(১) ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্য। পৃ: ৩। সংহিতোপনিষদ ব্রাহ্মণে সম্পূর্ণ বিভিন্ন নাম দৃষ্ট হয়। উহাতে তিন সংহিতা, শুদ্ধা, অদ্বঃস্পৃষ্টা এবং অনিভূজা নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রথমটি পবিত্র স্থানে স্থানের পর পঠিতব্য। দ্বিতীয়টি উচ্চারণের দোষ না থাকে, এমন ভাবে পড়িতে হইবে। বাহ্যিক হাঁটুর বাহিরে প্রচারিত হইতে না পারে, এই ভাবে থাকিয়া অঙ্গুষ্ঠাগ্রভাগ দ্বারা অঙ্গুলিতে আঘাত দিয়া স্বরগ্রাম প্রকাশ পূর্বক, এই শ্রেণীতে “অনিভূজা” পাঠ করিতে হইবে।

‘পবিত্র বেদ রক্ষা করাই এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীর একমাত্র উদ্দেশ্য। বেদ পাঠ কেবল আবৃত্তি মাত্র নহে। ইহাতে স্বরগ্রাম ও বিশেষ বিশেষ উচ্চারণ-প্রণালীর প্রতি সর্বদা মনোযোগ দিতে হয়। স্বরের উচ্চতা ও নীচতা দ্বারা বিভিন্ন উচ্চারণ-প্রণালী দেখাইতে হয়। ঋগ্বেদী, কন্ব এবং অথর্ষবেদীরা তৈত্তিরীয়দিগের অবলম্বিত প্রণালীর অনুসরণ না করিয়া ভিন্নরূপে ইহা করিয়া থাকেন। মাধ্যন্দিনেরা দক্ষিণ হস্ত সঞ্চালন করিয়া স্বরগ্রামের বিভিন্নতা প্রদর্শন করেন।

‘ঋগ্বেদীরা ঘন পর্য্যন্ত না বাইয়া সংহিতা, পদ ও ক্রমেতেই সন্তুষ্ট থাকেন। তৈত্তিরীয়দিগের মধ্যে অনেক বৈদিক ব্রাহ্মণও আরণ্যক শিক্ষা করণার্থ স্তোত্রের ঘন পর্য্যন্ত গিয়া থাকেন। কেহ কেহ অথর্ষবেদী প্রাতিশাখাও পড়িয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা বেদাঙ্গে মনোযোগ দেন না। ফলতঃ ঋগ্বেদী ভিন্ন আর কোন সম্প্রদায়ই উহার আলোচনা করেন না। মাধ্যন্দিনেরা তাঁহাদেব স্তোত্রের সংহিতা, পদ, ক্রম, গতা ও ঘন পর্য্যন্ত কণ্ঠস্থ রাখেন। কিন্তু তাঁহাদেব পাঠ ইহাতেই শেষ হইয়া থাকে। প্রায় কাহাকেও সমগ্র শতপথ ব্রাহ্মণ কণ্ঠস্থ করিতে দেখা যায় না। অনেকে উহার কিয়দংশ মাত্র অভ্যাস করিয়াই নিরন্তর থাকেন। বোধহই প্রেসিডেন্সিতে অথর্ষবেদীর সংখ্যা অতি অল্প। সামবেদীগণের সাম গান করিবার নানা উপায় আছে। তাঁহারা ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদও অভ্যাস করিয়া থাকেন।

‘শ্রোত্রিয়, সাধারণতঃ শ্রৌতী নামে আর এক শ্রেণীর বৈদিক আছেন। যজ্ঞ-সম্পাদন-কার্য্যে ইহাদের অভিজ্ঞতা আছে। ইহারা সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট বৈদিক। অধিকন্তু ইহারা কল্প সূত্র ও প্রয়োগ অভ্যাস করিয়া থাকেন। ইহাদের সংখ্যা অতি অল্প।

‘কোথাও আবার অগ্নিহোতৃদিগকেও দেখা যায়। তাঁহারা তিনটি যজ্ঞাগ্নি রক্ষা করেন, এবং পাক্ষিক ইষ্টি ও চাতুর্মাস্য সমাধান করিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে সুমহান্ সোমযজ্ঞেরও অনুষ্ঠান দেখা যায়। কিন্তু তাহা কদাচিৎ সম্পন্ন হইয়া থাকে।”

প্রাচীন সাহিত্য সংরক্ষণে স্মৃতি-শক্তির কতদূর প্রয়োজন, উপরি উক্ত

বিষয়গুলি দ্বারা তাহা বুঝা যাইতেছে। প্রাচীনকালে বেদ যেমন প্রসূত হইয়াছে, অদ্যাপি তেমনই রহিয়াছে। উহাতে একটীও প্রকৃত পাঠান্তর ঘটে নাই, এমন কি ঋগ্বেদে একটীও অস্পষ্ট স্মরণ-প্রণালী দেখা যায় না। সূক্ষ্মরূপে অনুসন্ধান করিলে বৈদিক পাঠের অপভ্রংশ দেখা যায় বটে, কিন্তু বেদের মূল অবধারিত হওয়ার সময় হইতেই বোধ হয়, ঐ অপভ্রংশ গুলিও বেদের প্রকৃত পাঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকিবে। ভিন্ন ভিন্ন শাখায় এইরূপ অনেক পাঠ দৃষ্ট হয় এবং তৎসমুদয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রাচীন পণ্ডিতগণের বিচারও দেখা যায়।

ভারতে ধর্ম সম্বন্ধীয় সমুদয় প্রশ্নে বেদের প্রমাণ সম্মান সহকারে পরিগৃহীত হইয়া আসিতেছে। আজ পর্য্যন্ত এই সম্মানের কোনও ব্যত্যয় হয় নাই। অন্যান্য ধর্ম-গ্রন্থের ন্যায় বেদের প্রমাণ অবিসংবাদিত নহে বটে, কিন্তু খ্রীষ্টানদিগের বাইবেল ও মুসলমানদিগের কোরাণের ন্যায়, বেদ শাস্ত্রানুগত হিন্দুদিগের সর্ব প্রধান, অভ্রান্ত, ও মহা প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

---

## স্পৃশ্য, ঈষৎস্পৃশ্য এবং অস্পৃশ্য পদার্থের আরাধনা ।

কোথা হইতে আমরা আসিতেছি, কোথায় উপনীত হইবার ইচ্ছা করিতেছি এবং এজন্য কোন পথই বা অবলম্বনীয় প্রথমতঃ তাহাই স্থির করা আবশ্যিক। আমরা আপাততঃ ধর্ম্যভাবের প্রথমোৎপত্তির স্থলে উপস্থিত হইতে চাহি। কিন্তু এই অভিলষিত স্থলে উপস্থিত হইতে হইলে এক দিকে পৌত্তলিকতা ও অপর দিকে আদিম প্রকটীকরণ, এই দুইটা পূর্ব-প্রসারিত পথ উপেক্ষা করিয়া যাইতে হইবে। পঞ্চেন্দ্রিয় হইতে যে জ্ঞান উদ্ভূত হয়, সেই জ্ঞান হইতে যাত্রা করিয়া যে পথ অবলম্বন করিলে, পরিশেষে ধীরে ধীরে ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, অনন্ত ভাববাজক ও অপ্রাকৃত স্বর্গীয় বিষয়ে বিশ্বাস জন্মিতে পারে, আমাদেরকে এরূপ কোন পথেই অগ্রসর হইতে হইতেছে।



### ধর্মের প্রমাণ কদাপি সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে।

জগতের সকল ধর্ম নানা রূপ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইলেও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অন্তর্ভূতিই যে ধর্মের একমাত্র প্রমাণ নহে, সকল ধর্মেই তাহার ঐকমত্য দৃষ্ট হয়। এমন কি অসভ্যজাতির পৌত্তলিকতাতেও উহার স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। অসভ্যগণ সহজ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রস্তর, মৃত্তিকা বা বৃক্ষাদির পূজা করিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহাতেই যে, তাহারা কেবল ঐ সামান্য জড়েরই পূজা করে, এমন নহে। তাহারা যাহার প্রকৃত পূজা করে, তাহাতে সামান্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রকৃতির বিদ্যমানতা ভিন্ন আরও কোন বিষয় আছে। এই “আরও কোন বিষয়” আমাদের হস্ত, আমাদের কণ, কিংবা আমাদের চক্ষুর সম্পূর্ণ অগোচর।

কিরূপে এই ভাবের উৎপত্তি হইল? কোন্ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া-বলে এই ধারণার আবির্ভাব হইল যে, আমাদের ইন্দ্রিয়াদির অগোচর — অদৃশ্য, অনন্ত, অমাহুষ, স্বর্গীয় কোন বিষয় আছে? স্বীকার করিলাম;

ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়কে অদৃশ্য, অনন্ত ও স্বর্গীয় বলিয়া কল্পনা করা অবশ্য ভ্রমাত্মক, কিন্তু মানব অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে বুদ্ধিমান হইয়াও সৃষ্টির প্রথম হইতে আজ পর্যন্ত কেবল এই বিষয়ে উন্নত ভাবে চলিতেছে কেন? ইহার কারণ জানিবার জন্য আমাদের মনে স্বভাবতঃই কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। এই কৌতূহলের তৃপ্তি সাধনে অসমর্থ হইলেই ধর্মকে বৈজ্ঞানিক সমালোচনার অযোগ্য বলিয়া আমাদের কাছে স্বীকার করিতে হইবে।

### বাহ্য প্রকটীকরণ।

কেবল এক কথায় এ গুরুতর বিষয় মীমাংসিত হইতে পারে, একরূপ মনে করিলে আমরা অনায়াসে বলিতে পারিতাম যে, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অনুভূতির বিষয়াতীত ধর্মভাব সকল কোন প্রকার বাহ্য প্রকটীকরণ বশতঃই উদ্ভূত হইয়া থাকিবে। জগতে একরূপ প্রকৃতির ধর্ম বিবল—একথাটি সহজ ও শুনিতে মিষ্ট বটে। কিন্তু এ যুক্তিগত পৌত্তলিক ভাষায় পরিবর্তিত করিলেই বুঝা যাইবে যে, উহা ধর্মভাবের উৎপত্তি ও উন্নতি বিষয়ক গবেষণার পক্ষে যে সকল বিঘ্ন রহিয়াছে তাহা অতিক্রম করিতে কত অল্প সাহায্য করিতে পারে। যদি আসান্টী পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করা যায়, “তুমি কেমন করিয়া তোমার উপাস্য প্রস্তরাদিকে কেবল প্রস্তর না ভাবিয়া অনাক্রূপ কল্পনা করিয়া থাক?” এবং তাহাতে ঐ আসান্টী পুরোহিত যদি এই উত্তর দেয় যে, “আমার উপাস্য আমাকে আত্ম পরিচয় দিয়াছেন, এবং ঐরূপ করিতে আদেশ করিয়াছেন,” তবে আমরা আর কি বলিতে পারি? আর ইহাই যদি আদিম ঐশ্বরোপদেশের উপপত্তি বলিয়া বোধ হয়, তবে দেবতার যে আছেন মানুষ তাহা কিরূপে জানিল? এ প্রশ্নের উত্তর, “দেবতার বলিয়াছেন যে, তাঁহারা আছেন”।

কি অসভ্য, কি সুসভ্য ও সুশিক্ষিত, এই উভয় শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই দেবতাসম্বন্ধীয় একরূপ বিশ্বাসের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে। আফ্রিকাদেশীয় লোকদের মধ্যে একরূপ একটা প্রবাদ আছে

যে, এক্ষণকাব অপেক্ষা পূর্ব্ব কালে স্বর্গধাম মনুষ্যের নিকটবর্তী ছিল, এবং দেবপ্রধান বিশ্ববিধাতা তখন সময়ে সময়ে অসং লোকসমাজে উপস্থিত হইয়া জ্ঞান দান করিতেন। কিন্তু অতঃপর তাঁহারা তাহাদের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়া স্বর্গে অবস্থিতি করিতেছেন (১)। হিন্দু (২) এবং গ্রীকগণও (৩) প্রায় এইরূপ বলেন। এই উভয় জাতিরই বিশ্বাস আছে যে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ দেবতাদিগের সহিত দেখা করিতে ও কথা কহিতে পারিতেন। দেবতাগণের সম্বন্ধে এক্ষণে তাঁহাদের যে বিশ্বাস আছে, তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণকে ঐ বিষয়ের প্রমাণ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া থাকেন।

এখন ইহাই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, কিরূপে আদিম মনুষ্যগণের মনে দেব-কল্পনা বা ইন্দ্রিয়াদির অগোচর কোন পদার্থের ধারণা উদ্ভূত হইয়াছিল? সমস্যা এই যে, মানুষ 'ঈশ্বর' এই বিশেষক কিরূপে জানিতে পারিল? প্রত্যেক পরিদৃশ্যমান বা অদৃশ্য কোন পদার্থে ঐ বিশেষক আরোপিত করিবার পূর্ব্বে মানুষ নিশ্চয়ই উহা জানিতে পারিয়াছিল।

### অন্তর-প্রকটীকরণ।

যখন ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, অসীম অদৃশ্য এবং ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ধারণা আমাদের বহির্দর্শন হইতে আসিয়া বলক্রমে অন্তরে প্রবিষ্ট হইতে পারে না, তখন এবিষয়ের বিশদীকরণ জন্য আর একটী কথার অবতারণা হইতেছে। কথিত আছে, মানবের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বা কুসংস্কারমূলক একটী সাধারণ সংস্কার আছে। ঐ সংস্কার-প্রভাবেই মানুষ অনন্ত, অসীম, অদৃশ্য এবং ঐশ্বরিক ধারণা পরিগ্রহ করিতে পারে। ফলতঃ এরূপ যুক্তি সরল পৌত্তলিক ভাষায় অনুবাদ করিতে গেলে বোধ হয়, আমরা আমাদের নিজ আদিমত্ব সম্বন্ধে একান্ত বিস্মিত হইব।

যদি কোন আনান্টী কহে যে, তাহার এমন একটী সংস্কার আছে,

( ১ ) ওয়েইজ, ২য়। ১৭১ পৃঃ।

( ২ ) ঋগ্বেদ ১ম, ১৭৯, ২ ; ৭ম, ৭৬, ৪ ; মুইর, " সংস্কৃত মূল " ৩য়, ২৪৫ পৃঃ।

( ৩ ) Homerische Theologie. p.151



যদিও সে তাঁহার উপাস্য প্রস্তর খণ্ডের পাষণ্ড ব্যতীতও এমন কিছু দেখিতে পায়, যাহা কোনক্রমে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না, তাহা হইলে হয়ত একথা শুনিয়া আমরা ইয়ুরোপীয় জ্ঞান-মত্ততায় বিন্মিত হইব। আমরা এমন মনে করি না যে, জ্ঞানশূন্য কি অশিক্ষিত অসভ্য হইতে এই বিষয় শিথিলে আমাদের উপকার আছে। ধর্ম ভাবোৎপত্তির মূল অন্বেষণ করিতে গিয়া অন্যান্য মানসিক বৃত্তির উপর একটা ধর্মসম্বন্ধীয় সংস্কার স্বীকার করা, আর ভাষার মূল নির্ণয় বা গণিত প্রশ্ন সমাধা করিতে গিয়া ভাষার সংস্কার বা গণিতের সংস্কার কল্পনা করা ঠিক একই কথা। কোন কোন পদার্থের নিদ্রা উৎপাদন করিবার শক্তি আছে বলিয়া উহাতে নিদ্রা উৎপাদন করিয়া থাকে। এভাবে ধর্মোৎপত্তির ব্যাপারে সংস্কারের কল্পনা সর্বথা অযৌক্তিক।

এই দুইটা উত্তরে যে অন্ততঃ কণা প্রমাণ সত্যও নাই, একথা একবারে অস্বীকার করা যায় না। ঐ কণাপ্রমাণ সত্যটুকু সূতাপাকার অসত্য আলোড়ন করিয়া বাহিরা বাহির করিতে হয়। সংক্ষেপে আদিম প্রকটীকরণ শব্দে কি বুঝায় এবং ধর্মসম্বন্ধীয় সংস্কার শব্দেই বা কি বুঝায়, তাহা বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া ঐ শব্দ আবার আমরা ব্যবহার করিলেও করিতে পারি। কিন্তু উহা এত অধিক বার ভুল অভিপ্রায়ে ব্যবহৃত হইয়াছে যে, ভবিষ্যতে তৎসমুদয় আর ব্যবহার না করাই ভাল।

যে সেতু অবলম্বন করিলে ধর্ম-ভাবোৎপত্তির মূল অন্বেষণের বাধা বিঘ্ন সহজেই উত্তীর্ণ হওয়া যাইত, এক্ষণে সেই সেতু ভস্মসাৎ পূর্বক আদিম প্রকটীকরণ ও ধর্মসম্বন্ধীয় সংস্কার পরিত্যাগ করিয়া কেবল ধর্মভাবোৎপত্তির মূল অনুসন্ধান তৎপর হওয়াই আবশ্যিক। আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়ের অধিকারী, পরিদৃশ্যমান জগৎ আমাদের সম্মুখে বিরাজমান, এই জগতের সহ্য ইন্দ্রিয়গণেব সাক্ষ্য সপ্রমাণ হইতেছে। এক্ষণে ইহাই মীমাংসা করা কর্তব্য যে, কেমন করিয়া আমরা পর জগতে যাই, অথবা কেমন করিয়াই বা আমাদের পূর্ব পুরুষেরা তথায় যাইতে পারিয়াছিলেন।



## ইন্দ্রিয়গণ ও তৎসমুদয়ের সাক্ষ্য।

আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য অনুভূত হয়, তাহাকেই আমরা যথার্থ ও পরিদৃশ্যমান বলিয়া থাকি। আমাদের ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় কি না, আপাততঃ সে কথার প্রয়োজন নাই। বরঞ্চ, হিউম্ এমন কি এমপেদক্লেস্ বা জেনোফেনের সহিতও আমরা তর্কে প্রবৃত্ত হইতেছি না। আমাদের এখন কেবল তৃতীয় বা চতুর্থ যুগস্থ নীলনদের তীর-বাসী জাতিবিশেষের সহিত তর্কের প্রয়োজন। তাহারা যে কঙ্কাল বা অস্থিখণ্ড সংস্পর্শ করিতে, আঘাত করিতে, আশ্বাদন করিতে, দেখিতে এবং আবশ্যক হইলে উহা ভগ্ন করিয়া সেই ভঞ্জন-শব্দ শুনিতে পারে, তাহাকেই প্রকৃত বলিয়া থাকে। তাহাদের মতে আর কোন বিষয় ইহা অপেক্ষা প্রকৃত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

পঞ্চেন্দ্রিয়গণকে দুই ভাগে বিভক্ত করা আবশ্যিক। স্পর্শ, ঘ্রাণ এবং আশ্বাদন এই তিনটী ইন্দ্রিয় এক শ্রেণীভুক্ত এবং ইহাদিগকে প্রাচীন ইন্দ্রিয় বলা গিয়া থাকে। শ্রবণ ও দর্শনেন্দ্রিয় প্রভৃতি অপর শ্রেণীভুক্ত, ইহাদিগকে আধুনিক বা নূতন ইন্দ্রিয় কহে (১)। পদার্থের অস্তিত্ব নির্ধারণে প্রথম তিনটী সর্বাপেক্ষা কার্যকারী। শেষোক্ত দুইটী মেরুপ না হওয়ায় বা সন্দেহাত্মক হওয়ায় প্রমাণ-বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর ইন্দ্রিয়-সাপেক্ষ।

যাথার্থ্য নিরূপণে স্পর্শেন্দ্রিয়কে অব্যর্থ প্রমাণ স্বরূপ ধরিতে হয়। ইহাব ন্যায় স্বতন্ত্র-ভাব-যুক্ত ও পরিপুষ্ট ইন্দ্রিয় আর নাই। ইহার পুষ্টিতে ও স্বভাবে ইহাকে সর্বপ্রাচীন বলিয়া গণনা করা যায়। অধিকতর স্বতন্ত্র-ভাব যুক্ত ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে ঘ্রাণ ও আশ্বাদনকে স্পর্শের অব্যবহিত পরে গণনা করিতে হয়। সত্যসমর্থনের জন্য পশুদিগকে প্রথমটীর ও বালক-দিগকে দ্বিতীয়টীর পরিচালক দেখা গিয়া থাকে।

উচ্চ শ্রেণীর জীবগণের মধ্যে ঘ্রাণশক্তিকেই এক মাত্র প্রমাণ স্বরূপ বলিয়া দেখা যায়। মনুষ্যে বিশেষতঃ সভ্য-সমাজে এই অভিপ্রায়ে উহার পরিচালনা প্রায়ই দেখা যায় না। কোন পদার্থের যাথার্থ্য নির্ণয় করিতে

(১) সুইয়হেড প্রণীত “ইন্দ্রিয়-জ্ঞান”।

হইলে বালকগণ. ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের ব্যবহার অত্যন্তই করিয়া থাকে। উহারা কোন দ্রব্য পাইলে সৰ্ব্ব প্রথমেই উহা ধরে, কিংবা তুলিয়া লয়, পরে সক্ষম হইলে মুখ-মধ্যে প্রবেশিত করে। আমাদের বয়োবৃদ্ধির সহিত শেষোক্তটি পরিত্যক্ত হইয়া প্রথমটি অর্থাৎ পদার্থের স্বরূপ নির্ণয় জন্য স্পর্শ করা অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। যে পদার্থ প্রকৃত, তাহার যে অবশ্য গন্ধ ও আশ্বাদ থাকিবে, একথা স্বীকার না করিলেও অনেকে আজ পর্যন্ত বলিয়া থাকেন যে, যাহা স্পর্শ-গ্রাহ্য নহে, তাহা প্রকৃত হইতে পারে না।

### প্রত্যক্ষ শব্দের অর্থ।

ভাষা দ্বারা এই শব্দের অর্থ অবধারিত হইয়াছে। কোন পদার্থের সত্তার আর সন্দেহ নাই, যখন আমরা এই রূপ বলিতে ইচ্ছা করি, তখনই উহাকে প্রত্যক্ষ বলিয়া থাকি। রোমকেরা যখন এই বিশেষণ-পদের সৃষ্টি করেন, তখন তাঁহারা ইহার অর্থ প্রকৃষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাঁহারা হস্ত দ্বারা যাহা স্পর্শ বা আঘাত করিতে পারিতেন, তাহাকেই প্রত্যক্ষ কহিতেন। লাতিন Fendo ধাতু আঘাত অর্থে ব্যবহৃত হইত। offendo বা defendo শব্দে ঐ ধাতু অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে। Festus একটি প্রাচীন নিষ্ঠাস্ত পদ, ইহা Fend এবং tus যোগে নিম্পন্ন, যেমন Fus-tis, যষ্টি, Fos-tis, (১) Fons-tis, Fond-tis.

Fustis যষ্টি, এই কথার সঙ্গে Fist (২) কথার কোন সম্বন্ধ নাই। ইংরেজীতে F অক্ষরটি লাতিন ও গ্রীকের P স্থানীয়। গ্রীক pux কথার সঙ্গে ইংরেজী Fist কথার সম্ভবতঃ সংশ্রব থাকিবে। লাতিন Pugna যুদ্ধ, আদৌ মল্লযুদ্ধ এবং Pugil মল্লযোদ্ধা; লাতিনে Pungo এই ক্রিয়া পদে, এই সমস্ত কথার ধাতু দৃষ্ট হয়। এমতে মল্লযুদ্ধ হইতে জ্যামিতির অদৃশ্য বিন্দুর এবং ন্যায়শাস্ত্রের ছেজের বিষয়ের নামকরণ হইয়াছে।

সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতু হইতে Fendo, Fustis এবং Festus পদ গুলি সিদ্ধ

(১) Corssen, 'Aussprache' I. 149 ; II. 190.

(২) Grimm, 'Dictionary,' S. V. Faust.

হইয়াছে। উহা ধন বা হন, গ্রীকে উহা আঘাত করা, সংস্কৃতে হন, বধ করা, নিধন, মৃত্যু ইত্যাদি।

একগে দেখা যাউক, জগতের প্রাচীন অধিবাসীরা কোন্ কোন্ পদার্থকে প্রত্যক্ষ বা প্রকৃত কহিতেন। প্রস্তর, অগ্নি, কড়ি, বৃক্ষ, পর্কত, নদী, জীব, ও মনুষ্য প্রভৃতিই প্রকৃত বলিয়া উক্ত হইত। কারণ উহাদিগকে হস্তদ্বারা আঘাত বা স্পর্শ করা যাইত; বস্তুতঃ, ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের সমস্ত বিষয়কেই তাঁহারা প্রকৃত কহিতেন।

### ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের স্পৃশ্য এবং অর্দ্ধ-স্পৃশ্য, এই দুই বিভাগ।

(আমরা এই আদি জ্ঞান ভাণ্ডারকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি,  
(১) যে সকল সামগ্রীকে প্রকৃষ্ট রূপে স্পর্শ করা যায়। যথাঃ—প্রস্তর, হাড়, কড়ি, পুষ্প, ফল, বৃক্ষ-শাখা, জলবিন্দু, পৃথ্বীপিণ্ড, পশুচর্ম, এবং জীবগণ। এই সকল পদার্থ আমাদের ইন্দ্রিয়ের অগোচর নহে। উহাদের মধ্যে অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় কিছুই নাই। উহারা আদিম সমাজে অতি পরিচিত, কথার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল।

(২) বৃক্ষ, পর্কত, নদী ও পৃথিবীর সম্বন্ধে কিন্তু পূর্কোক্ত রূপ বলা যাইতে পারে না।)

### বৃক্ষ।

এমন কি প্রাচীন বনের বনস্পতিতেও কোন অপূর্ক বিষয়-সূচক পদার্থ আছে। উহার স্পর্শের মূল আমরা স্পর্শ করিতে পারি না। উহা আমাদের শিরোভাগের অতি উর্দ্ধদেশে শোভা পায়। (আমরা উহার তলায় দাঁড়াইয়া উহাকে স্পর্শ করিতে ও অবলোকন করিতে পারি। কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয়গণ এক কালে উহাকে গ্রহণ করিতে পারে না।) আমরা অটোলিকার কাষ্ঠকে মৃত মনে করিয়া থাকি। কিন্তু বৃক্ষকে জীবিত বলিয়া থাকি। প্রাচীনেরা এই রূপই বোধ করিতেন। তাঁহারা উহাকে

জীবিত ভিন্ন আর কিই বা বলিবেন ? কিন্তু তাঁহারা উহার খাস প্রাধাস বা মজীব হৃদয় কল্পনা করিতেন না । কিন্তু এই বৃক্ষকে তাঁহাদের সমক্ষে অকুরিত হইতে, বৃদ্ধি পাইতে, শীথা, প্রশাথা, পত্র ও ফল পুষ্প প্রসব করিতে, শীত কালে পত্র ত্যাগ করিতে এবং অবশেষে উহা কর্তিত বা মৃত হইতে দেখিয়া উহাকে প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করিলেও উহাতে ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের অগ্রাহ্য কোন অজ্ঞাত ও বিস্ময়-সূচক পদার্থের আরোপ বা কল্পনা করিতেন না । ভাবকের কাছে এই অজ্ঞাত এবং বুদ্ধির অগম্য পদার্থ, বিস্ময়ের ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল । যেমন একদিকে উহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বলিয়া বোধ হইত, তেমনি আবার অপর দিকে উহা ইন্দ্রিয়ের বিষয়াতীত হইয়া উঠিয়াছিল ।)

### পর্বত ।

পর্বত, নদী, সমুদ্র ও পৃথিবী অবলোকন করিয়াও মনে এই রূপে বিস্ময়ের অবির্ভাব হইত । পর্বতের অধোদেশে দণ্ডায়মান হইয়া উহার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আপনাদিগকে প্রকাণ্ড রাক্ষস সমক্ষে বামন বলিয়া বোধ হয় । অনেক পর্বত একবারেই ছরতিক্রমণীয়, উপত্যকা-বাসীরা উহাদিগকে তাহাদিগের ক্ষুদ্র জগতের সীমা স্বরূপ জ্ঞান করিয়া থাকে । উষা, সূর্য্য, চন্দ্র, ও তারকাগণ বোধ হইত যেন পর্বত হইতে উঠিতেছে । গগনমণ্ডল বোধ হইত যেন উহাদের উপর বিস্তৃত রহিয়াছে । উহাদের অত্যাচ্চ শৃঙ্গোপরি দৃষ্টিপাত করিলে উহা অপর জগতের দ্বার-দেশ বলিয়া বোধ হইত । যেদেশে বৈদিক স্তোত্র মর্ক প্রথমে উচ্চারিত হইয়াছিল এবং যে দেশে ডাক্তর হকর একস্থানে দাঁড়াইয়া ২৮,০০০ ফুট উচ্চ ২০টী তুষার শৃঙ্গোপরি বিশাল নীলিম গগনমণ্ডল ১৬০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেখিয়াছিলেন, একবার তাহার দৃশ্য ভাবিয়া দেখিলেই প্রতীত হইবে যে, প্রকৃত অনন্তের সমক্ষে এবম্বিধ মন্দির সন্দর্শনে অতি সুদৃঢ় অন্তঃকরণও কেমন কম্পিত হইয়া উঠিতে পারে ।)

## নদী ।

পৰ্ব্বতগণের অব্যবহিত পরেই জলপ্রপাত ও নদীর উল্লেখ করা উচিত। নদী নামে প্রকৃত কোন পদার্থ বুঝা যায় না। (আমাদের গৃহ-পার্শ্বে প্রতিদিন জলরাশি প্রবাহিত হইতে দেখি বটে, কিন্তু কখনই সেই সরিৎ বা সমস্ত সরিৎ অবলোকন করিতে পাই না। নদী আপাততঃ পরিচিত বলিয়া বোধ হইলেও উহার অজ্ঞাত উদ্ভব ও পতন-স্থান আমাদের পক্ষেদ্রিয়ার অগোচর ও অগম্য।

সেনেকা তাঁহারা এক পত্রে লিখিয়াছেনঃ—“বড় বড় নদীর উৎপত্তির বিষয় মনে হইলে ভক্তির উদ্রেক হয়। অন্ধকার হইতে হঠাৎ নিঃসৃত কোন নদীর পূজার জন্য বেদী প্রস্তুত করিয়া থাকি। উষ্ণ প্রস্রবণের পূজা করি, এবং কোন কোন হ্রদের জল অতি গভীর ও গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হওয়ায় আমরা পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি।”

নদী হইতে মৃত্তিকার উর্বরতা সম্পাদন, মেষপালন, আশ্রয় দান, ও শত্রুর আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে রক্ষণ প্রভৃতি তীরবাসীর যে সকল উপকার হইয়া থাকে, তৎপ্রতি দৃষ্টি না করিলে এবং প্রচণ্ড নদীর বেগে জীব-ধ্বংস, উহার প্রবল তরঙ্গে লোকের হঠাৎ নিমজ্জন ও সৰ্ব্ব নাশের কথা মনে না হইলেও দূর-সমাগত অপরিচিত উদাসীনের ন্যায়—কোথা হইতে আদি-য়াছে, এবং কোথায় যাইবে, তাহা অবিদিত—এই বেগবতী নদীর উপস্থিতি অবলোকন মাത്രেই প্রাচীন জগৎবাসিগণের মনে তাঁহাদের অধিষ্ঠানভূতা ক্ষুদ্র পৃথিবী ভিন্ন অন্য দেশের অস্তিত্বে বিশ্বাস জন্মিত এবং তাঁহারা আপনাদিগকে অদৃশ্য, অনন্ত ও স্বর্গীয় শক্তিতে পরিবেষ্টিত বলিয়া মনে করিতেন। )

## পৃথিবী !

যে ধরা-পৃষ্ঠে আমরা দণ্ডায়মান রহিয়াছি, তাহা অপেক্ষা প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু যখন উহাকে এক খণ্ড প্রস্তর বা একটী আতা স্বরূপ বলিয়া মনে করা যায়, তখনই উহা

আমাদের ইঙ্গিতের বিষয়াতীত, কিংবা অন্ততঃ প্রাচীন ভাষাপ্রণেতাদের সম্বন্ধেও ইঙ্গিতের অগোচর হইয়া উঠে। (তাহারা একটি নাম যোজনা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু এই নামে কি পর্যাস্ত বুঝাইত, তাহা অবধারিত বা সীমাবদ্ধ না হইয়া যেন অসীম ও কিয়ৎপরিমাণে দৃশ্য, প্রত্যক্ষ এবং অধিকাংশ অপ্রত্যক্ষ ও অদৃশ্য এমন পদার্থবিশেষ বুঝাইত।)

অতি প্রাচীন কালে আদিম অধিবাসীগণ এসম্বন্ধে যে সকল উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহা আপাততঃ সামান্য বলিয়া বোধ হইলেও তাহাতে যে যথেষ্ট উপকার এবং উহাই যে মানব-জ্ঞানের পথ প্রদর্শক-প্রায় হইয়াছে, একথা বলা বাহুল্য। (যাহা সীমাবদ্ধ নহে, যাহা মুষ্টি-মধ্যে ধরা যায় না এবং যাহা সর্বত্র দর্শন করা যায় না, আদিম অধিবাসী কর্তৃক নাম-কল্পনায় ঠিক এই কয়টি অবস্থা অনুভূত না হইয়া একটি সংকীর্ণ ভাবমূলক কি সীমা-বিশিষ্ট জ্ঞান-জ্ঞাপক শব্দ উদ্ভাবিত হইয়াছে। কিন্তু এই সামান্য উদ্ভাবনাই মানবকে ক্রমে অজ্ঞাত, অনন্ত, ও স্বর্গীয় পদার্থ-বাচক শব্দের ও ভাব-পূর্ণ সংজ্ঞা-দান-ক্ষমতার প্রথম উচ্ছ্বাস দিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

### ঈষৎ-স্পৃশ্য পদার্থ।

স্পৃশ্য পদার্থের অনুভূতি গুলিকে প্রথম শ্রেণী ভুক্ত করা গিয়াছে। এবং দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত গুলিকে প্রথম হইতে পৃথক করিবার জন্য ঈষৎ-স্পৃশ্য নামে অভিহিত হইয়াছে।

এই দ্বিতীয় শ্রেণী অতি বিপুল এবং এই শ্রেণীভুক্ত অনুভূতির মধ্যে অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। একটি পুষ্প কিংবা ক্ষুদ্র বৃক্ষকে কখন কখন এই শ্রেণী-ভুক্ত বলিয়া বোধ হয়। কেন না ইঙ্গিত-গ্রাহ্য নহে, এমন কোন পদার্থ ইহাতে বর্তমান নাই। আবার এই শ্রেণীভুক্ত পদার্থেই এমন অনেক বিষয় আছে যে, তাহার অননুভূত অংশ পরিদৃশ্যমান অংশ হইতে অনেক অধিক। পৃথিবী ইহার এক উদাহরণ স্থল। আমরা উহা স্পর্শন, দর্শন, আশ্বাদন এবং শ্রবণাদি সকলই করিতে পারি বটে;

কিন্তু উহাতে উহার সমগ্র অংশে এবং সমস্ত অবস্থায় অনুভূতি জন্মে না। আমরা ক্ষুদ্রাংশ মাত্র অনুভব করিয়াই বিরত হই। স্মৃতরাং আদিম জগৎবাসীরাও পৃথিবীর সামগ্র্য ধারণা করিতে পারেন নাই। তাঁহারা আবাস-ভূমির সন্নিহিত ভূখণ্ড, ক্ষেত্রের তৃণ, বন, বা নয়ন-পথের শেষ সীমাস্থিত কোন পর্বত মাত্র অবলোকন করিতেন। তাঁহার নয়নপথের বাহিরে যে অসীম বিস্তৃতি বিরাজমান রহিয়াছে, তাহা তিনি স্বাক্ষাৎ সম্বন্ধে না দেখিলেও মানস-নেত্র দ্বারা দেখিতেন, এমন বলিলেও বলা যায়।

ইহা কেবল বাগাড়ম্বর মাত্র নহে। আমরা স্বয়ং ইহার বাথার্থ্য প্রতিপাদন করিতে পারি। যখন আমরা কোন উচ্চ পর্বতের শৃঙ্গ হইতে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করি, তখন আমাদের চক্ষু চূড়া হইতে চূড়ান্তরে ও অত্র হইতে অভ্রান্তরে সঞ্চরণ করিতে থাকে। দ্রষ্টব্যের অসত্তাব না হইলেও কেবল চক্ষুর দূরদর্শনে অসামর্থ্য প্রযুক্ত আমরা ক্ষান্ত হই। নয়নপথাভীতে যে অসংখ্য দ্রষ্টব্য বিরাজমান রহিয়াছে, তাহা যে কেবল যুক্তি দ্বারা অনুভব করি, এমন নহে। বস্তুতঃ আমরা উহা অবলোকন ও অনুভব করিয়া থাকি। আমাদের দর্শনের অসীম শক্তি নাই, ইহাতে আমাদের বিলক্ষণ বিশ্বাস থাকায় পরজগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে। কোন সীমা অনুভব করিতে হইলে ঐ সীমান্তে কি আছে তাহাও অনুভব করিতে হয়।

যে ভাষায় পরিবর্তিত হইলে এই ভূতার্থ গুলি স্পষ্টীকৃত হইতে পারে, অসঙ্কচিত ভাবে তাহা করা আবশ্যিক। আমাদের সম্মুখে, আমাদের ইন্দ্রিয়গণের সমক্ষে দৃশ্য ও স্পৃশ্য অনন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। যেহেতু কেবল সীমাভীতই অসীম নহে, যাহার সীমা অবধারণে ও অবলোকনে আমরা অসমর্থ, তাহাকেও আমরা এবং আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা অনন্ত বলিয়াছেন।

### অস্পৃশ্য পদার্থ।

এই সকল ঐষৎ-স্পৃশ্য পদার্থগুলিকে ইচ্ছাক্রমে আর কতকগুলি ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায়, এবং উহাদের অনেকের অংশবিশেষ হস্ত দ্বারাও স্পর্শ করা গিয়া থাকে।



তৃতীয় শ্রেণীর আর একরূপ পদার্থ আছে। তাহারা আমাদের চক্ষু-  
কর্ণের গোচর হইলেও আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয়ের অগোচর। তবে উহাদের  
সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা হইবে?

দৃশ্য অথচ অস্পৃশ্য পদার্থ আছে, তাহা শুনিতে আপাততঃ বিস্ময়  
জন্মে। কিন্তু এইরূপ পদার্থে সমস্ত জগৎ পরিপূর্ণ রহিয়াছে, বলা যায়।  
আদিম অসভ্যেরা যে উহা দ্বারা উদ্ভাস্ত হইয়াছিল, এমনও বোধ হয় না।  
মেঘ প্রায় সকলেরই দৃশ্য, কিন্তু স্পৃশ্য নহে, এবং পর্বত-সমাকীর্ণ দেশে  
মেঘ অর্কস্পৃশ্য পদার্থের মধ্যে পরিণত হইলেও আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য,  
নক্ষত্রাদি আমাদের অস্পৃশ্য রহিয়াছে। এই শ্রেণীর পদার্থকে অস্পৃশ্য  
বলা যায়।

এই রূপে সামান্য বিজ্ঞান-বলে আমরা তিন প্রকার পদার্থ নির্ণয়  
করিলাম। উহারা সকলেই ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হইলেও উহাদের অস্তিত্ব ও  
প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের মনে তিনটী স্তম্ভ ধারণা হইয়া থাকে।

✓ (১) স্পৃশ্য পদার্থ, যথা, প্রস্তর, কড়ি, অস্থি প্রভৃতি। যে সকল দার্শনিক  
পৌত্তলিকতাকে সকল ধর্ম্মের আদি বলিয়া থাকেন এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য  
পদার্থকে ধর্ম্মের আদিম উদ্দীপক বলিয়া নির্দেশ করেন, তাহারা এই  
স্পৃশ্য পদার্থগুলিকে পূজার সামগ্রী মনে করিতেন।

(২) অর্কস্পৃশ্য পদার্থ, যথা, বৃক্ষ, পর্বত, নদী, সমুদ্র ও পৃথিবী। এই  
সকল হইতেই উপদেবতা বা অর্কদেবতার সৃষ্টি হইয়াছে।

(৩) অস্পৃশ্য পদার্থ, যথা, আকাশ, নক্ষত্র, সূর্য্য, উষা এবং চন্দ্র, এই  
গুলিকে ভবিষ্যৎ দেবতার অঙ্কুর বলিতে পারা যায়। ✓

### দেবতাদিগের প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রাচীনগণের প্রমাণ।

দেবতাদিগের প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রাচীন-লেখকেরা কি বলিয়াছেন, সর্ব্ব-  
প্রথমে তাহা দেখা আবশ্যক। এপিকুরস্, বায়ু, জল, পৃথিবী, সূর্য্য, অগ্নি  
ও নক্ষত্রগণকে দেবতা বলিয়াছেন।



প্রদীকশ্ বলিয়াছেন, মিশরদেশীয়গণ যেমন নীলনদকে দেবতা বলিত, প্রাচীনেরা তেমনি, চন্দ্র, সূর্য্য, নদী নির্ঝর এবং সাধারণতঃ ব্যবহার্য্য সমস্ত পদার্থকেই দেবতা জ্ঞান করিতেন। বোধ হয় এই জন্য অন্ন লক্ষ্মী বলিয়া, মদ্য বারুণী বলিয়া, জল বরুণ বলিয়া, এবং অগ্নি ব্রহ্মা বলিয়া পূজিত হইত।

কাইসরের এইরূপ ধারণা ছিল যে, জরমানেরা চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির পূজা করিত।

হিরদোতস্ বলিয়াছেন, পারস্য-বাসিগণ সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, অগ্নি, জল ও মরুতের উদ্দেশে বলি দিত।

কেলসস্ এ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন যে, পারসিকেরা পর্ব্বত-শৃঙ্গোপরি দিসের উদ্দেশে বলি দিত। দিস্কে তাহারা পৃথিবীর বৃত্ত মনে করিত। ইহা দিস্ অর্থাৎ সর্কোচ্চ, কিংবা জিউস বা অদোনাই, সাবোধ বা আমন অথবা সিথীসদিগের পাপা এক কি না, তাহা নির্দেশ করার প্রয়োজন নাই।

কুইন্তস্, কর্টিয়স্, ভারতবাসিদের ধর্ম্মসম্বন্ধে বলিয়াছেন, যে কোন পদার্থকে তাঁহারা সমাদর বা ভক্তি করিতেন, তাহাকেই দেবতা কহিতেন। এমন কি তাঁহারা একটি বৃক্ষ নাশ করাও ঘোর অপরাধের কারণ মনে করিতেন।

### বেদের প্রমাণ।

সেকেন্দর সাহের সহচরবর্গ ও তাঁহাদের উত্তরাধিকারীরা ভারতের ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, বেদের প্রাচীন স্তোত্র গুলি অধ্যয়ন করিলেই বুঝা যাইবে যে, তাঁহাদের নির্দেশ স্বার্থ কি না; যে স্তোত্রাবলী আমাদের সমক্ষে আর্য্য-জগতে মানবগণের কবিতার প্রাচীন অংশ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, তাহা কাহার উদ্দেশে প্রয়োজিত হইত? দেখা যাইতেছে যে বেদের স্তোত্র গুলি প্রস্তরাদি স্পৃশ্য পদার্থে প্রযুক্ত না হইয়া, নদী, পর্ব্বত, মেঘ, পৃথিবী, আকাশ, উষা ও সূর্য্য প্রভৃতি অস্পৃশ্য বা জীবৎস্পৃশ্য পদার্থের উদ্দেশেই প্রযুক্ত হইয়াছে।)

ইহা একটা সামান্য প্রমাণ নহে। আশ্চর্য্য, শত বর্ষ পূর্বে কেহই ইহার প্রতি প্রণিধান করেন নাই। আমরা যে এক দিন, সেকন্দের আক্রমণের সহস্র বৎসর পূর্ব-প্রসূত, আৰ্য্য-সাহিত্য বা সমসাময়িক প্রমাণ দ্বারা, ভারতবাসিদের সম্বন্ধে সেকন্দের ইতিহাস-লেখকেরা যেক্রপ লিখিয়া গিয়াছেন তাহার প্রতিরোধ করিব, কে তাহা মনে করিতে পারিয়াছিলেন ?

এই পর্য্যন্ত অবধারণ করিয়াই আমাদেরকে ক্ষান্ত হইতে হইবে না। আৰ্য্যবংশ পৃথগ্ভূত হইবার পূর্বে উহাদের মধ্যে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, ভারতীয় আৰ্য্য-ভাষার সহিত গ্রীস, ইতালি প্রভৃতি দেশের আৰ্য্যগণের ভাষার তুলনা করিয়া আমরা কিয়দংশে সেই ভাষার উদ্ধার করিতে পারি।

### আৰ্য্যভাষা যে অবিভক্ত, তাহার প্রমাণ।

প্রাচীন আৰ্য্যেরা নদী, পর্বত, পৃথিবী, আকাশ, উষা এবং সূর্য্য সম্বন্ধে কিরূপ চিন্তা ও ধারণা করিতেন, আমরা অদ্যাপি তাহা কিয়ৎ পরিমাণে অবধারণ করিতে পারি। কারণ যে উপায়ে তাঁহারা উহাদের নামকরণ করিতেন, তাহা আমরা এক প্রকার জানি। (তাঁহারা উহাতে আঘাত, ঘর্ষণ ও মর্দন প্রভৃতির ন্যায় কোন প্রকার চাপল্য বা চাঞ্চল্য অবলোকন করিয়া উক্ত প্রকৃতির অনুসারে উহাদের নাম নির্দেশ করিতেন। এই আঘাত, ঘর্ষণ প্রভৃতিতে প্রথম হইতেই এক এক প্রকার শব্দ সংযুক্ত থাকিত। পরিশেষে এই শব্দগুলি ভাষা-বিজ্ঞানে ধাতুরূপে পরিবর্তিত হইয়াছে।)

আপাততঃ যতদূর অবলোকন করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাতে ইহাকে সকল ভাষার ও সকল চিন্তার আদি বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। নোয়রির নানা বিসংবাদিত মতে ভীত না হইয়া উহা আমাদেরকে বিশদ রূপে বুঝাইয়াছেন। তাহাতে তাঁহার দর্শন-শাস্ত্রের গুণপনা ও গৌরব সামান্য বর্দ্ধিত হয় নাই (১)।

(১) ১৮৭৮ অব্দের কেম্ব্রিজ মাসের “কন্টেম্পারারি রিবিউ” নামক সাময়িক পত্র “কারণের মূল” শীর্ষক প্রবন্ধে এই বিষয় বিবৃত করিয়াছি। উহাতে অধ্যাপক নোয়রির প্রবন্ধ বিষয় সবিস্তর উল্লিখিত হইয়াছে।

### ভাষার উৎপত্তি ।

ক্রিয়াতেই ভাষার প্রথম বিকাশ হয়। আঘাত, ঘর্ষণ, ঠেলন, ক্ষেপণ, কঠন, যোজন, মাপন, কৰ্ষণ, বন্ধন প্রভৃতি কতকগুলি সহজ ক্রিয়ার সহিত একরূপ সাধারণ ধ্বনি পূর্বে যেমন থাকিত, এখনও তেমন রহিয়াছে। এই ধ্বনি প্রথমে অনিশ্চিত ছিল, কালক্রমে উহাই সুনিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। পূর্বে এই সকল ধ্বনি কেবল ক্রিয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপে “মর্” এই ধ্বনির উল্লেখ করা যাইতে পারে (১)। “মর্” প্রথমে ঘর্ষণ, প্রস্তুতসমূহ পরিষ্করণ, অন্তসমূহ তীক্ষ্ণকরণ বুঝাইত। এতদ্বারা বক্তা বা অন্য কাহারও পরিব্যক্তি হইত না। কিছুকাল পরে “মর্” কেবল এই লক্ষণ-বোধক হইল না যে, পিতা স্বয়ং কার্য্য করিতে, ঘর্ষণ করিতে এবং প্রস্তুতসমূহ অন্ত পরিষ্কার করিতে যাইতেছেন; কোন নির্দিষ্ট স্বরে এবং নির্দিষ্ট ভাবে উচ্চারিত হইয়া উহা এমন লক্ষণবোধক হইয়া উঠিল যে, পিতা তাহার সম্মুখীন এবং ভৃত্যাদিগকে কাজের সময় অলস হইতে নিষেধ করিতেছেন। আমরা যাহা অনুজ্ঞা বলিয়া থাকি, “মর্”! ক্রমে তাহাই হইল। ইহা প্রথম হইতে কেবল একব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহৃত হইত না, যখন অনেকে এক ব্যবসায় নিয়োজিত থাকিত, তখন সকলেই ইহা ব্যবহার করিত।

সময়ের পরিবর্তনের সহিত ক্রমে আবার অভিনব উপায় অবলম্বিত হইল। “মর্” কেবল অনুজ্ঞাবোধক লক্ষণে পর্য্যবসিত হইল না। পরিষ্কৃত ও সমীকৃত প্রস্তুতসমূহ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে—মাগরতট হইতে গহ্বর-সমীপে বা বহির্দেশ হইতে কুটীরে অনিবার প্রয়োজন হইলে “মর্” কেবল পরিষ্কার এবং তীক্ষ্ণ করিবার জন্য সমানীত প্রস্তুত-সমূহের বোধক হইল না, প্রত্যুত যে সকল প্রস্তুত খণ্ডীকৃত, তীক্ষ্ণ বা পরিষ্কৃত করা যায়, তাহারও জ্ঞাপক হইয়া উঠিল। এইরূপে অনুজ্ঞা-বোধক “মর্” কেবল ক্রিয়াতে আবদ্ধ রহিল না, ক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন বিষয়েও প্রযুক্ত হইতে লাগিল।

“মর্” শব্দের এই রূপ ক্ষমতার বিস্তৃতিতে অনেক গোলযোগের উৎপত্তি

হইয়াছিল। ভবিষ্যতে বাহাতে এইরূপ পোলযোগ না ঘটতে পারে, স্বভাবতই তাহার জন্য কোন উপায় অবলম্বনের ইচ্ছা জন্মিয়াছিল।

যখন এক “মর্” শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে নির্দেশ করা আবশ্যক হইত, তখন ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে তাহা করা যাইত। প্রাচীন সময়ে বিভিন্ন ধ্বনিতে স্বরগ্রামের পরিবর্তন দ্বারা ইহা সংসাধিত হইত। চীনদেশের ভাষাতে দেখা যায় যে, একবিধ ধ্বনি ভিন্নভিন্ন স্বরে উচ্চারিত হইলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ-বোধক হইয়া উঠে।

আমরা বাহা সর্বনাম-ধাতু বলিয়া থাকি, তাহাও উল্লিখিত ভিন্নার্থ বোধের একটা উপায়। এই উপায়ে এক “মর্” শব্দে ভিন্নার্থ বোধ হইতে পারে।

এইরূপ একমূল শব্দ সহজ উপায়ে উদ্ভূত হইয়া উচ্চারণ বৈষম্যে মানবের অসুভূতি এবং কল্পনা-পরম্পরায় নানা রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। নোররির বৈজ্ঞানিক গ্রন্থপাঠে এবিষয় বিশিষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। যে শব্দ যে ভাবেই উচ্চারিত হউক, শব্দ-বিজ্ঞানে উহার বিশ্লেষণ করিতে গেলে অবশেষে উহার মূল অবধারণ করা যায়।

বাহাহউক, এই সকল বিষয় যদিও ভাষা-বিজ্ঞানের উপযোগী, তথাপি ধর্ম-বিজ্ঞানের আলোচনা-শ্রমকে আমরা ইহা একবার পরিত্যাগ করিতে পারি না।

### আদি কল্পনা।

(নদী বলিলে প্রাচীনগণের মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইত, তাহা স্থির করিতে হইলে, তাহার উহাদের কিরূপ নাম রাখিতেন, তাহা জানা আবশ্যক। তাহার উহাকে বাহা বলিয়া ডাকিতেন, উহাদিগকে তাহাই ভাবিতেন। তাহাদের মধ্যে নদীর ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল। যথা :— (নদীর ক্রুত অর্থে) সরিৎ, (নদীর শব্দার্থে) ধুনী, সরলভাবে বহিলে সীর, অথবা শর, উহাকে ভূমির উর্বরতা-সম্পাদক ভাবিলে মাতা, এক দেশকে অন্য দেশ হইতে যাত্রা করিতে দেখিলে সিদ্ধ ইত্যাদি। নদীর এই সমস্ত নামেই কল্পনা আরোপিত হইয়াছে। মনুষ্য যেমন দৌড়িয়া থাকে, নদীও তেমনি

দৌড়িতেছে ও তাহার ন্যায় শব্দ করিতেছে। মনুষ্যের ন্যায় কৰ্ণন করিতেছে এবং মনুষ্য যেমন রক্ষা করিয়া থাকে, নদীও তেমনি রক্ষা করিতেছে।) নদী সৰ্ব্বপ্রথমে লাজল নামে না হইয়া লাজলকৰ্ণক নামে অভিহিত হইয়াছে। এমন কি লাজল বহুকাল হইতে যন্ত্রের পরিবর্তে যন্ত্রচালক বলিয়া অভিহিত হইতেছে। লাজল, বিভাজক ছেদক ও এবং তন্নিবন্ধন বৃক বা বরাহের নাম প্রাপ্ত হইয়াছে (১)।

### সকল পদার্থই সকলক বলিয়া অভিহিত।

(আদিম মনুষ্য কি রূপে তাঁহার চতুর্দিকস্থ সমস্ত জড় জগতের রহস্যানুভব করিয়াছিলেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তিনি ইতস্ততঃ নিজ কার্যের ন্যায় কার্য দেখিয়া তাঁহার স্বীয় কার্যবাচক শব্দগুলি ঐ ঐ পদার্থে প্রয়োগ করিতেন।)

ভাষার এই অধোদেশে অলঙ্কার প্রভৃতির অঙ্কুর লক্ষিত হইয়া থাকে। আমরা উহাদিগকে (কবিকাল্পনিক না বলিয়া চিন্তা ও ভাষার আবশ্যিক পদার্থ বলিয়া স্বীকার করি।) মনুষ্য স্বয়ং প্রস্তুতকৃত তীক্ষ্ণ করিয়া যখন উহাকে অস্ত্র না বলিয়া আপনায় প্রতিনিধি ও “কর্তৃক” বলিতেন, মানদণ্ডকে মাপক কহিতেন, লাজলকে বিদারক ও পোতকে পক্ষী কহিতেন, তখন যে নদীকে শব্দকারী, পৰ্ব্বতকে রক্ষক ও চন্দ্রকে মাপক বলিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? তাঁহারা চন্দ্রকে তাহার আন্থিক গতির জন্য আকাশ-মাপক মনে করিতেন। চান্দ্র মাসের দৈর্ঘ্য-নির্ণয়ে চন্দ্র মনুষ্যের সহায়তা করিতেন। এই রূপে চন্দ্র ও মনুষ্য উভয়েই এক যোগে কার্য করিতেন, একত্রে মাপিতেন। যেমন কোন ক্ষেত্র বা কাঠ-মাপকারীকে মাপক কহা যায় সেই রূপ চন্দ্রও মাস অর্থাৎ মাপক বলিয়া বাচ্য হইতেন। সংস্কৃত “মাস” শব্দই চন্দ্রের প্রকৃত নাম। লাতিনের মেনসিস্ ও ইংরেজী “মুন” শব্দের সহিত উহার নিকট সম্বন্ধ দেখা যায়।)

এই গুলি ভাষাতত্ত্ব বুঝিবার অতি সহজ ও অব্যর্থ উপায়। আমরা

(১) যেদে বৃকশব্দে লাজল এবং ব্যাঘ্র উভয়ই বুঝায়।

উহাদের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে অশক্ত হইলেও উহারা স্বয়ং অতি সহজ ও সম্পূর্ণ বোধগম্য। অতি সাবধানে ও ধীরে ধীরে মানবের ভাষা ও কল্পনার উৎপত্তি অনুধ্যান করিলে উহা স্পষ্টরূপে স্বদয়ঙ্গম হইতে পারে।

### সকল্মক শব্দ মানব অর্থবাচক নহে।

প্রাচীন ভাষাকারকেরা চন্দ্রকে মাপক ও সূর্য্যপথ বলিয়াছেন বলিয়া, তাঁহারা যে মনুষ্য ও চন্দ্রের মধ্যে কোন প্রভেদ দৃষ্টি করেন নাই, এমন নহে। আদিম লোকদিগের মনের ভাব যে আমাদের মনের ভাব হইতে ভিন্নরূপ ছিল, তাহা সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে আমরা তাঁহাদিগকে কখন মূর্খ বা নির্বোধ বলিতে পারি না। (তাঁহারা আপনাদের কার্যের সহিত, নদী, পর্ব্বত, চন্দ্র, সূর্য্য ও আকাশের কার্যের সাদৃশ্য দেখিয়া নিজ নিজ কার্যের নামকরণ করিয়াছেন। ইহাতে আমরা কখনই মনে করিতে পারি না যে, তাঁহারা মনুষ্য-মাপক ও চন্দ্র-মাপক এবং প্রকৃত মাতা ও নদী-মাতার মধ্যে কোন প্রভেদ দেখেন নাই।)

যখন প্রত্যেক বিদিত ও নাম-নির্দ্ধারিত পদার্থেই কর্তৃত্ব আরোপিত হইত এবং কর্তৃত্ব আরোপণের সঙ্গে উহা ব্যক্তি-বাচক হইয়া উঠিত, যখন প্রস্তুত হইত ও দস্তকে খাদক বলা যাইত, তখন উহাদিগকে সমাসোক্তি-বিরহিত করিতে, মাপক ও চন্দ্রের বিভিন্নতা দেখাইতে, মনুষ্য হইতে হস্ত ও হস্ত হইতে যন্ত্রের প্রভেদ করিতে, এমন কি প্রস্তুত যে পদদলিত পদার্থ মাত্র, তাহা প্রকাশ করিতে যে, সাতিশয় অশ্লুবিধা হইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অঙ্কারে, সচেতনত্বে বা সমাসোক্তিতে এরূপ কোন কষ্ট ছিল না।

এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, ধর্ম্ম ও পুরাণ-পাঠকের পক্ষে সমাসোক্তি এত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহা একবারে পর্য্যুদস্ত হইয়া পড়িল। ভাষা কিরূপে সমাসোক্তি আরোপ করিতে শিখিল, আমরা সে প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছি না, ভাষা কিরূপে তাহার বিপরীত বিষয়ে কৃতকার্য হইল, তাহাই আমাদের আগ্রহ হইতেছে।

### ব্যাকরণ-সম্বন্ধীয় লিঙ্গ ।

ব্যাকরণের লিঙ্গকে অনেকে সমাসোক্তির কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন। কিন্তু ইহা কারণ নহে, কার্য্য। যে যে ভাষায় এই লিঙ্গ সম্পূর্ণরূপে স্থিরীকৃত বিশেষতঃ চরমাবস্থায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সেই সেই ভাষার কবিগণ সহজেই লিঙ্গ-প্রয়োগে সমাসোক্তি কল্পনা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা অতি প্রাচীন কালের কথা বলিতেছি। লিঙ্গ-প্রকাশক ভাষারও এমন এক সময় ছিল, যখন লিঙ্গবাচকের উদ্ভব হয় নাই। যে আৰ্য্য ভাষায় অতি সূক্ষ্মতঃ লিঙ্গ-প্রথা দেখা যায়, তাহাতেও অনেক প্রাচীন কথা লিঙ্গ-শূন্য রহিয়াছে। পিতৃ শব্দ পুংলিঙ্গ নহে এবং মাতৃ শব্দও স্ত্রীলিঙ্গ নহে। এমন কি নদী, পর্ব্বত, বৃক্ষ প্রভৃতি শব্দেও লিঙ্গের কোন বাহ্য চিহ্ন দেখা যায় না। কিন্তু লিঙ্গ-চিহ্ন না থাকিলেও প্রাচীন বিশেষ্যপদগুলি কার্য্যকারিতা-প্রকাশক ছিল।

ভাষার এই অবস্থায় সাক্ষ্যক ও ব্যক্তিবাচক নহে, এমন কোন পদার্থের ব্যবহার করা অসম্ভব ছিল। প্রত্যেক নামেই কোন সাক্ষ্যক পদার্থ বুঝাইত। যদি Calx—গুল্ফ শব্দে পদাঘাতকারী বুঝাইত তবে Calx—প্রস্তর শব্দেও তাহাই বুঝাইত। সুতরাং অন্যরূপে ইহা ব্যাখ্যা করিবার আর উপায় ছিল না। গুল্ফ প্রস্তরকে আঘাত করিলে প্রস্তরও গুল্ফকে আঘাত করিত। উহার উভয়েই Calx। বেদে বি অর্থে পক্ষী উদ্ভয়নকারী, কিন্তু এই কথারই আবার “শর” অর্থ হইয়া থাকে। “যুধ” অর্থে যোদ্ধা, শস্ত্র ও যুদ্ধ বুঝায়।

যখন বাহ্য চিহ্ন দ্বারা পদাঘাতকারী এবং পদাবাতিত, এবং নির্জীব এবং সজীবের প্রভেদ করা সম্ভব হইয়াছিল, তখন ভাষার অনেক উন্নতি হইয়াছিল, বলিতে হইবে। অনেক ভাষা ইহা অপেক্ষা আর অধিক দূর যাইতে পারে নাই। আৰ্য্যভাষা সজীব পদার্থের মধ্যে স্ত্রীপুরুষ ভেদ করিয়া আর এক পদ উন্নত হইয়াছিল। পুংলিঙ্গ বিশেষ্য অবধারণ না করিয়া বরং স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্য পদ অবধারণ করাতেই ঐরূপ প্রভেদ আরম্ভ হইয়াছিল, অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয় বাছিয়া রাখায় অবশিষ্ট গুলি পুংলিঙ্গ হইয়াছিল। আবার ইহার দীর্ঘকাল পরে ক্লীবলিঙ্গ নির্দ্ধারিত হইয়া



ছিল। কিন্তু সাধারণতঃ কৰ্ত্ত্ব ও কৰ্ম পদেই একরূপ নির্বাচিত হইবার  
রীতি প্রবর্তিত হইয়া থাকিবে।

বৈয়াকরণ লিঙ্গ পৌরাণিক বিষয়ে কবিদিগের যথেষ্ট সহায়তা  
করিলেও উহাকে ভাষার উদ্দেশ্য-শক্তি বলা যাইতে পারে না। এই  
শক্তি ভাষা ও ভাবের প্রকৃতির মধ্যে স্বভাবতঃই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।  
মনুষ্যের মধ্যে প্রয়োজন সৌকর্য্যার্থে অনেক স্বর-চিহ্ন বা সংকেত প্রচলিত  
আছে। মানব আপন কার্যের অনুরোধে নানা কৰ্ত্ত্বচিহ্ন ব্যবহার করিয়া  
থাকেন। তিনি বাহ্য জগতেও তাঁহার কার্যের অনুরূপ অনেক কার্য দর্শন  
করেন। স্বর-চিহ্ন দ্বারা বাহ্য জগতের এই সকল পদার্থ তিনি আরও  
ভাল করিয়া বুঝিতে সক্ষম হন। তিনি সর্ব প্রথমে নদীকে রক্ষক  
বলিয়া স্বপ্নেও কখন উহার হস্ত পদাদি বা অন্ত শব্দাদি কল্পনা করেন  
না, অথবা চন্দ্রকে গগন পরিমাণ করিতে দেখিয়া সূর্যধরও মনে করেন  
না। পশ্চাতে এইরূপ অনেক গোলযোগ উপস্থিত হওয়ার সম্ভব। আমরা  
এখনও চিন্তার অপেক্ষাকৃত নিম্নতর স্তরে সঞ্চার করিতেছি।

### সহকারী ক্রিয়া পদ।

আমরা মনে করি যে, বাক্য ব্যতিরেকে ভাষা অসম্ভব, এবং ক্রিয়া  
ব্যতিরেকে বাক্য অসম্ভব। ফলতঃ একরূপ ধারণা সত্যও বটে এবং ভ্রমাত্মকও  
বটে। বোধগম্য ভাব ব্যক্ত করাই যদি বাক্যের প্রকৃত অর্থ হয়, তবে  
একথা সত্য। কিন্তু বাক্য অর্থে যদি কৰ্ত্ত্বপদ, বিশেষক ক্রিয়া প্রভৃতির সমবায়  
বুঝায়, তাহা হইলে একথা ভুল। কেবল অনুজ্ঞা বাক্য হইতে পারে এবং  
ক্রিয়া পদের যে কোন রূপকে বাক্য বলা যাইতে পারে। আমরা  
একগুণে যাহাকে বিশেষ্য পদ বলি, অগ্রে উহা ধাতু প্রত্যয়সম্বিত  
বাক্য মাত্র ছিল, এবং উহাতে যে বিষয় বা বস্তু বুঝাইত, ধাতুটা তাহারই  
গুণবাচকের কার্য্য করিত। সেইরূপ আবার যখন কৰ্ত্ত্বপদ ও বিশেষক দেখি,  
তখন আমরা মনে করিতে পারি যে, মধ্যে ক্রিয়া উহ্য আছে। ফলতঃ  
প্রথমে উহার পরিব্যক্তি হইত না, বা পরিব্যক্তির আবশ্যকতা ছিল



না। এমন কি আদিম ভাষার উহা ব্যক্ত বা ব্যবহার করা এক প্রকার অসম্ভবই ছিল।

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, প্রাচীন আর্য্যগণ অচেতন কোন পদার্থই ধারণা করিতে পারিতেন না। কোন পদার্থের বর্তমান বা ভূতকালীন অস্তিত্ব প্রকাশ করিতেও তাহাদের এইরূপ অনুবিধা হইত। সর্ব প্রথমে এই ভাব প্রকাশ করিতে হইলে ঐ ঐ পদার্থ তাহাদের “নিজ কার্য্যের ন্যায় কোন কার্য্য করিতে পারে” এইরূপ বলিতেন। নিশ্বাস প্রশ্বাস মনুষ্যের সাধারণ ধর্ম্ম। উহা দেখিয়া যখন আমরা এই বিষয় আছে এইরূপ বলি, তাহারা তখন এই বিষয় “নিশ্বাস প্রশ্বাস লইতেছে” এইরূপ কহিতেন।

### As, — নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগকরা।

“Ho is” পদের as অতি প্রাচীন ধাতু। আর্য্যগণের পৃথক্ হওয়ার পূর্বে উহা সংক্ষিপ্তভাবে ব্যবহৃত হইত। অদ্যাপি আমরা জানি যে, as ধাতুর অস্তিত্ব অর্থের পূর্বে as ধাতুর শ্বাস অর্থ ছিল।

সংস্কৃতে ইহা অস্-উ—শ্বাস্ এইরূপ ছিল, এবং উহা হইতেই বোধ হয় শ্বাসবস্ত, জীবন্ত এবং অবশেষে জীবিত দেবগণের প্রাচীন নাম বৈদিক অম্বর হইয়া থাকিবে (১)।

### ভূ—হওয়া।

বৃক্ষ প্রভৃতি শ্বাসহীন পদার্থের অস্তিত্ব প্রকাশে ধাতুর যোগ্যতা না থাকায় “ভূ” ধাতুর সৃষ্টি হয়। ইহা কেবল প্রাণি-জগতে ব্যবহৃত না হইয়া

(১) সংস্কৃতে যাহা “অম্ব” জ্ঞেয়ে তাহা “অহ”—আবেস্তায় এই গেষোক্তটির অর্থ মাত ও পৃথিবী। যদি জ্ঞেয়ের অম্ব শব্দের অর্থ প্রভু হয়, তাহাইহলেও অহর মজদার অহর শব্দে প্রভু অর্থ কদাপি হইতে পারেনা। অম্ব শব্দের সহিত কেবল একটীর প্রত্যয় যোগ হইয়াছে। জ্ঞেয়ে অম্ব শব্দের দুইটি অর্থ করা যাইতে পারে। একটি শ্বাস ও অপরটি প্রভু। ‘রত্ন শব্দের অর্থও ঠিক ঐ রূপে আদেশ ও আদেশদাতা হইয়া থাকে। অম্ব জ্ঞেয়ে যে অর্থে প্রভু হইয়া থাকে, সে ভাবে সংস্কৃতির অম্বর অর্থে প্রভু, স্বীকার্য্য বলিয়া অনুভূত হয় না।

উদ্ভিদজগতের উন্নতিশীল ও বর্ধমান বস্তুতে প্রয়োজিত হইত। পৃথিবী স্বয়ং 'ভূ' শব্দে অভিহিত হইত।

### বস, বাস করা।

পরিশেষে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে অনুভূতির আবশ্যকতা হইলে বাস অর্থে বস্-ধাতুর সৃষ্টি হয়। সংস্কৃত বাস, বাটী এবং ইঙ্গরেজী Iwas এই বাক্যে উহার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। বাস ও উৎপত্তি-ধর্মবিহীন পদার্থ মাত্রে উহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহা জীবন-হীন পদার্থ-প্রকাশের প্রথম উপায়। পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্রীবলিঙ্গ বিশেষ্য পদের গঠন ও এই তিনটি সহকারী ক্রিয়া পদ ব্যবহার-প্রথা, এই উভয়ের মধ্যে কোনরূপ নৈকট্য বা সৌমাদৃশ্য আছে।

### আদিম ভাব-ব্যক্তি।

একগে দেখা যাউক পূর্বোক্ত ব্যবহার আর্থাগণ চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ, পৃথিবী, পর্বত ও নদী প্রভৃতির বিষয়ে কিছু বলিতে হইলে কিরূপ বলিতেন, যখন আমরা বলি, চন্দ্র আছে, সূর্য্য রহিয়াছে, কিংবা বায়ু বহিতেছে, বৃষ্টি হইতেছে, তখন বলিতেন, সূর্য্য নিঃখাস লইতেছে (সূর্য্যঃ অস্তি) চন্দ্র হইতেছে (মা ভবতি), পৃথিবী বাস করিতেছে, (ভূর্বসতি), বায়ু বহিতেছে, (বায়ুর্বাতি), বৃষ্টি হইতেছে (ইন্দ্র উনত্তি বা বৃষা বর্ষতি বা সোমঃ সুনোতি) এই রূপ বলিতেন।

একগে দেখিতে হইবে, মনুষ্য প্রতিদিন তাঁহার সম্মুখে স্বভাবের কার্য্য দেখিয়া সর্ব প্রথমে কিরূপে তাহা বুঝিতে ও প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেন। কেবল ভাষানুশীলন-প্রথার উদাহরণ স্বরূপ এস্থলে আমরা সংস্কৃত ব্যবহার করিতেছি। ধারণা হইতে কিরূপে ব্যক্ত করিবার উপায় নির্দ্ধারিত হইল, ব্যঞ্জনা প্রভৃতি প্রবাদ-মূলক হইয়াই বা কিরূপে ধারণার উপর প্রতিফলিত হইল এবং উহার ঘাত প্রতিঘাতই বা কিরূপে প্রাচীন পৌরানিক-গ্রন্থ উৎপাদনে সমর্থ হইল, এই সকল অটল বিষয় পরে বিচার করা যাইবে।

এখন কেবল ইহাই বক্তব্য যে, প্রাচীন আর্যেরা সূর্যকে আলোকের উদ্বোধক, চন্দ্রকে মাপক, উষাকে আগরণকারক, বজ্রকে শাসকারক, বৃষ্টিকে বর্ষক এবং অগ্নিকে ক্ষতগমনকারী বলিয়া নির্দেশ করিলেও আমরা কখন (এমন মনে করিব না যে, তাঁহারা উহাদিগকে হস্তপদবিশিষ্ট মানব বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।) তাঁহারা “সূর্য্য নিখাস প্রস্থান লইতেছে” বলিতেন বলিয়া উহাকে মনুষ্য বা পশু কি জ্ঞানেন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীব কল্পনা করিতেন না। আমাদিগের গৃহবাসী পূর্বপুরুষেরা নির্কোষও ছিলেন না, কবিও ছিলেন না। (“সূর্য্যঃ অস্তি,” এই রূপ বলিয়া তাঁহারা কেবল তাহাকে আমাদের ন্যায় কার্যক্রম ও গতিশীল বুঝিতেন। প্রাচীন আর্যেরা কখনই অত পূর্বে চন্দ্রের মুখ, চক্ষু, নাসিকা আছে বলিয়া বর্ণন করেন নাই।)

### আদিম কালে সাদৃশ্যের অপভ্রব।

আমরা যে সময়ের কথা কহিতেছি, বোধ হয় সেই সময়ে আমাদের আর্য্য পূর্বপুরুষেরা অর্ক-স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্য পদার্থের সাদৃশ্য কল্পনা না করিয়া এবং আপনাদের ও উহাদের মধ্যে কোন কাল্পনিক সাদৃশ্য না দেখিয়া, বরং (আপনাদের ও উহাদের মধ্যে বিভিন্নতা দর্শন করিয়াই অধিকতর মুগ্ধ হইতেন।)

বেদে এই মত সমর্থনের উপযোগী অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা তাহাকে সাদৃশ্য বা তুলনা বলি, অনেক বৈদিক স্তোত্রে তাহা অসাদৃশ্যযুক্ত। আমরা বলিয়া থাকি “পাহাড়ের ন্যায় দৃঢ়” কিন্তু বৈদিক কবির ঐ রূপ না বলিয়া “দৃঢ়, পাহাড় নহে” এইরূপ কহিয়াছেন (১)। তাঁহারা সাদৃশ্য অনুভব করাইতে অসাদৃশ্যের উপর দৃষ্টি রাখিতেন। এমন কি তাঁহারা দেবতার উদ্দেশে মিষ্ট খাদ্য উৎসর্গ না করিয়া শুদ্ধ প্রশংসা-স্তোত্রেই উহা পর্যাবসিত করিতেন। তাহাদের মতে উহাই যেন মিষ্ট খাদ্য (২)। নদী প্রচণ্ড

(১) ঋগ বেদ ১ম, ৫২, ২। সঃ পর্বতঃ ন অচূতঃ; ৯ম, ৬৪, ৭, গিরয়ঃ ন যতবসঃ। স যে শস্যের পরে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা সাদৃশ্যবাচক। এই হেতু আদিম অনুভূতি এই রূপ ছিল যে, সে, পর্বত, নদী; অর্থাৎ সে সর্বত্রই নদী, কোন কোন অংশে পর্বত।

(২) ঋগ বেদ ১ম, ৬১, ১।

বা ভীম নামে আসিতেছে, কিন্তু বৃষ নহে, অর্থাৎ বৃষের ন্যায়। এই রূপ কথিত আছে যে, মরুৎগণ তাঁহাদের উপাসকগণকে ক্রোড়ে লইয়া থাকেন, যথা পিতা, পুত্র নহে, অর্থাৎ পিতা যেমন পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া থাকেন (১)।

এইরূপ চন্দ্র সূর্য্যকে পরিভ্রমণশীল মনে করিতেন, কিন্তু জন্তু বলিতেন না। নদী শব্দ করিতেছে ও যুদ্ধ করিতেছে, কিন্তু তাহা মনুষ্য নহে, পক্ষীগণকে পরাভব করা অসাধ্য, কিন্তু তাহারা যোদ্ধৃর্গ নহে। দাবানল বন-ভক্ষক বটে, কিন্তু সিংহ নহে।

বেদের এই সকল স্থান অনুবাদ কালে আমরা “না” স্থানে ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু ইহা মনে রাখা আবশ্যিক যে, কবির আদৌ সাদৃশ্য দেখিয়া যেরূপ মুগ্ধ হইতেন, অসাদৃশ্য দেখিয়াও তদধিক না হউক, অস্তুতঃ সেইরূপ মুগ্ধ হইতেন।

### চলিত বিশেষণ।

কবির স্বভাব বর্ণন করিতে করিতে স্বভাবতঃ অনেক বিশেষণ বারংবার ব্যবহার করিয়া থাকেন। স্বভাবের অনেক পদার্থ পরস্পর বিভিন্ন হইলেও উহাদের অনেকের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ ধর্ম্ম দেখা গিয়া থাকে। সুতরাং তৎসমুদয় একটি সাধারণ বিশেষণে অভিহিত হয়। তৎপরে উহারা প্রত্যেক বিশেষণের অধীনে এক এক শ্রেণী ভুক্ত হইয়া একটি নূতন ভাবায়ক হইয়া উঠে। এইরূপ হওয়াই সম্ভব। কার্য্যতঃ ইহা কত দূর হইয়াছিল, তাহাই এস্থলে আলোচ্য।

বেদ দেখিলে বুঝা যায় যে, ভারতবর্ষীয় পরমার্থবিদগণের মতে উহার স্তোত্রগুলি কোন না কোন দেবতার উদ্দেশে প্রযুক্ত হইয়াছে (২)। “দেবতা” শব্দ ইঙ্গরেজি ডীটি (Deity) শব্দের সমান। কিন্তু বেদের স্তোত্রে দেবতা কেবল এই অর্থে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায় না। দেবতা শব্দের ধারণা

(১) ঋগ্বেদ ১ম, ৩৮, ১।

(২) অনুক্রমণিকা। যস্য বাক্যং স ঋষিঃ, বা তেনোচ্যতে সা দেবতা। তেষাং বাক্যেন প্রতিপাদ্যং যৎ বস্তু সা দেবতা।

এপর্যন্ত অবধারিত হইয়া উঠে নাই। এমন কি প্রাচীন টীকাকারেরা বলিয়াছেন যে, “স্তোত্রে বা কিছু বা যে কেহ সম্বুদ্ধ হয়, তাহাই স্তোত্রের আরোপ্য দেবতা শব্দের অর্থ। যিনি কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া স্তোত্রের প্রয়োজ্য বিষয় উল্লেখ করেন, তাহাকে ঋষি বা দর্শক বলিয়া নির্দেশ করা যায়। এইরূপে যখন কোন বনি, যজ্ঞশাত্র, বা যুদ্ধাস্ত্র সম্বোধিত হয়, তখন তাহার দেবতা বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। স্তোত্রের মধ্যে যে সকল কথোপকথন দেখা যায়, তাহাতে বক্তা ঋষি বলিয়া ও শ্রোতা দেবতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। বস্তুতঃ দেবতা একটি পরিভাষা তুল্য হইয়াছে। পরমার্থবিৎদের ভাষায় কবি-সম্বোধিত পদার্থ ভিন্ন উহাতে আর কিছুই বুঝায় না। যদিও এ পর্য্যন্ত ঋগ্বেদের স্তোত্রে দেবতা শব্দের ব্যবহার দেখা যায় নাই, কিন্তু প্রাচীন কবিগণ যে সকল বিষয়কে সম্বোধন করিয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশই দেবতা বলিয়া কথিত হইয়াছে। যেমন আমরা অর্থের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া গ্রীক দিয় শব্দ দেবগণ অর্থে ব্যবহার করি, এই দেব শব্দ অনুবাদ করিতে বোধ হয় গ্রীকেরা তেমনি “দিয়স্” শব্দ প্রয়োগ করিতেন, কিন্তু বৈদিক কবিগণ দেব শব্দের সহিত কি অর্থ সংযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহা জানিলে বুঝা যায়, দেব এবং ইঙ্গরেজী god ঈশ্বর, শব্দের অর্থের সহিত উহার কতদূর বিভিন্নতা আছে। এমন কি বেদে, ব্রাহ্মণে আরণ্যকে ও সূত্রে উহার অর্থ ক্রমাগত পরিবর্তিত হইতে দেখা যায়। দেবতা শব্দের প্রকৃত অর্থ জানিতে হইলে ধাতু হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ সূত্র পর্য্যন্ত সমস্ত ইতিহাস পাঠ করিতে হয়।

দিব্ ধাতু হইতে দেব শব্দ হইয়াছে। দিব্-ধাতুর অর্থ দীপ্তি পাওয়া আদৌ উজ্জল। অভিধানে দেবতার অর্থ ঈশ্বর, স্বর্গীয়। দেবতা শব্দের আমরা এক্ষণে যে অর্থ বুঝি, তৎকালে উহার এই অর্থ হয় নাই, তখন উহার আধুনিক অর্থ কেবল গঠিত হইতেছিল। সূত্র পদার্থের চিন্তা করিতে করিতে মনুষ্য ক্রমে ঈশ্বর-সমীপে উপনীত হইয়াছেন(১)। ইহাই বৈদিক স্তোত্রের

(১) Brown, 'Diorysiak Myth,' I. p. 60.

প্রকৃত ভাবার্থ। হিসিস্রচ্ আমাদিগকে দেবত্ব সম্বন্ধীয় ইতিবৃত্ত দিয়াছেন।  
আবার আমরা বেদেও দেবোৎপত্তি দেখিতেছি। দেবগণের জন্ম ও বৃদ্ধি  
অর্থাৎ দেবতাবাচক শব্দের জন্ম ও বৃদ্ধি দেখিতে পাইতেছি। আধুনিক  
প্রকৃতির স্তোকে স্বর্গীয় ভাবের উদ্ভাবনে আধুনিক ধারণাই কেবল  
দেখা গিয়া থাকে।

বেদে ঋষিরা অনেক পদার্থের কোন একটা সাধারণ শব্দ দিয়া সকল  
গুলিকেই সম্বোধন করিয়াছেন। পরিশেষে যে, ঐ শব্দ ঈশ্বরের সাধারণ  
নাম হইয়াছে, দেবতা শব্দ উহার এক মাত্র প্রমাণ নহে। বেদে অনেক  
দেবতার সাধারণ নাম বস্তু, অদৌ ঐ শব্দে দীপ্তি কিংবা উজ্জল বুঝাইত।

এই সমস্ত পদার্থের মধ্যে কতকগুলিকে প্রাচীন কবিরা অপরিবর্তনশীল  
ও অক্ষয় বলিয়া মনে করিতেন, এবং অপর গুলিকে নশ্বর ও ধূলিসাৎ  
হইবার উপযোগী ভাবিতেন। একদা তাঁহারা তাহাদিগকে অমর ও অজর  
প্রভৃতি শব্দে বিশেষিত করিতেন।

তাঁহারা মনুষ্য প্রভৃতি জীবের পরিবর্তন ও মরণ দেখিয়া এবং আকাশ  
পৃথ্বী প্রভৃতিতে ঐ ঐ ধর্মের অসম্ভাব দেখিয়া উহাদের প্রকৃত জীবন আছে  
মনে করিতেন। সুতরাং ঐ তাব প্রকাশার্থেই অমর (খাস) ধাতু-সিদ্ধ অমর  
শব্দের ব্যবহার করিয়াছিলেন, পক্ষান্তরে কেবল ধাতুধানুসারে যে দেব  
শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা প্রকৃতির উজ্জল ও সৌম্য মূর্তি বুঝাইত।

অমর শব্দের প্রয়োগে ওরূপ কোন প্রতিবেদ না থাকায় উহা প্রাচীন  
কাল হইতে শিব অশিব, সকল শক্তিতেই প্রযুক্ত হইত। আদৌ খাস  
পরিশেষে ঈশ্বর-দ্যোতক এই অমর শব্দ হইতেই আমরা আধুনিক ধর্মতত্ত্বে  
ইহাই বুঝিতে পারি যে, আত্মা দেহের জীবনী শক্তির ও পরিপূষ্টির প্রধান  
উপাদান।

ইষির আর একটা বিশেষণ শব্দ। আদৌ উহাও প্রায় অমর অর্থে  
ব্যবহৃত হইত। উহা ইষ্, রস, শক্তি, জীবন, বেগ অর্থবোধক ধাতু হইতে  
সিদ্ধ হইয়া অনেক বৈদিক দেবতার বিশেষতঃ ইন্দ্র, অগ্নি, অশ্বিন, মরুৎ,  
এবং বায়ু, শকট ও মন প্রভৃতিতে প্রযুক্ত হইত। গ্রীকে ইহার ব্যুৎপত্তিগত  
অর্থ চঞ্চল এবং সুন্দর ধান্য, পক্ষান্তরে সাধারণ অর্থ স্বর্গীয় এবং পবিত্র।

এই শেখোক্ত অর্থ, সংস্কৃত অর্থের ন্যায়, এই অর্থের ন্যায় অবশ্য পরিগণিত হইতে পারে।

### বৈদিক দেবগণের মধ্যে স্পৃশ্য পদার্থ।

পূর্বে যে তিন শ্রেণীর পদার্থের কথা বলা গিয়াছে, ঋগ্বেদের দেবতা-গণের মধ্যে তাহার প্রথম শ্রেণীর নিদর্শন পাওয়া যায় না।) আধুনিক স্তোত্রে বিশেষতঃ অথর্ববেদে, প্রস্তুত, কড়ি, কঙ্কাল প্রভৃতি উপাস্য বলিয়া কথিত হইলেও প্রাচীন স্তোত্রে উহাদের ব্যবহার একবারেই বিরল। ঋগ্বেদে রথ, ধনুক, তুণী, বজ্রপাত, কুঠার, পটহ প্রভৃতি যে সকল কৃত্রিম পদার্থ উল্লিখিত ও সমাদৃত হইয়াছে, বলিতে কি প্রসিদ্ধ কবি ওয়ার্ডন্‌ওয়ার্থ, টেনিসন প্রভৃতিও তৎসমুদয়ের প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন নাই। এই সকল পদার্থকে কোন স্বতন্ত্র প্রকৃতি ধারণ করিতে দেখা যায় না। তাহারা কেবল ব্যবহার্য্য, বহুমূল্য এবং কখন বা পবিত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে। (১)

(১) এরূপ কথিত হইয়া থাকে যে তৈজস পত্র এবং বজ্রাদি কখনও পুণ্ডিত হইত না (see kapp, Grundlinien der Philosophie der Technik, 187, 8p. 104) কিন্তু স্পেনসর সাহেবের Principles of Sociology I. গ্রন্থের ৩৪৩ পৃষ্ঠায় আমরা ইহার বিপরীত মত দেখিতে পাই। উহাতে লিখিত আছে, ভারতবর্ষের জীলোকেরা গৃহব্যবহার্য্য ধামা, সাজি প্রভৃতির পূজা করে এবং উহার উদ্দেশ্যে বলি প্রদান করিয়া থাকে। এইরূপ অন্যান্য যে সকল দ্রব্য দ্বারা গৃহকার্য্যের সাহায্য হয়, তৎসমুদয়েরও পূজা হইয়া থাকে। সূত্রধর হাতুড়ি, বাটালি প্রভৃতি অস্ত্রাদির পূজা করে। ব্রাহ্মণ যখন লিখিতে আরম্ভ করেন, তখনও লেখনী প্রভৃতির সম্বন্ধে এইরূপ করিয়া থাকেন। সৈনিক পুরুষ তাহার যুদ্ধব্যবহার্য্য অস্ত্রাদির পূজা করিতে কুণ্ঠিত হয় না, রাজমিস্ত্রী কর্ণিশ পূজা করিয়া থাকে। সুতরাং ডুয়র সাহেব এ সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহা নিঃসন্দেহ। ইহাদের অপেক্ষা এতৎসম্বন্ধে অধিকতর অভিজ্ঞ ল্যাএল সাহেব তাহার 'ভারতীয় প্রদেশ সকলের ধর্ম্ম' নামক পুস্তকেও ঠিক এইরূপ যে বলিয়াছেন এ কেবল যে, কৃষকেরাই লাঙল পূজা করে, জালজীবী জাল পূজা করে, তাঁতী তাঁত পূজা করে তাহা নহে। মসীজীবগণ কলম পূজা, ব্যবসায়গণ হিসাবের খাতা পূজাও করিয়া থাকে। এখন কথা এই, এরূপ পূজার উদ্দেশ্য কি।



## বৈদিক দেবগণের মধ্যে ঈষৎ স্পৃশ্য পদার্থ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর পদার্থের ব্যবহার সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। যে সমস্ত পদার্থ ঈষৎ-স্পৃশ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে তাহাদের প্রায় সমস্ত গুলিই বৈদিক দেবগণের মধ্যে দেখা যায়। ঋগ্বেদের ১ম, ২০, ৬-৮ শ্লোকে আছে :—

“হে বারু! ধার্মিকগণের উপর মধু বর্ষণ কর, হে নদীগণ! তোমরাও মধু বর্ষণ কর। হে লতাসকল! তোমরা মধুময় হও। ৬।

“হে রজনি! হে উষে! মধুময় হও। হে পৃথিবীর উপরিস্থিত আকাশ! মধু-পূর্ণ হও। হে ঈশ্বর! হে পিতৃগণ! মধুময় হও। ৭।

“হে বৃক্ষগণ! মধুপূর্ণ হও! হে গাভীগণ! স্তমিষ্ট হও। ৮।”

আমি এস্থলে আক্ষরিক অনুবাদ করিলাম, তৎসঙ্গে মধু শব্দও ব্যবহৃত হইল। কিন্তু সংস্কৃতে এ শব্দের আরও অনেক অর্থ আছে। মধু শব্দে খাদ্য আছে। মধু শব্দে খাদ্য ও পানীয়, মিষ্ট খাদ্য ও মিষ্ট পানীয় বুঝায়। সুতরাং স্নিগ্ধ বৃষ্টি, জল, দুগ্ধ ও প্রত্যেক প্রীতিকর সামগ্রী মধু নামে পরিচিত হইত। এই সকল প্রাচীন শব্দ সম্পূর্ণ রূপে ভাষান্তরিত ও ব্যাখ্যা করা দুঃসাধ্য। তবে বিশেষ অধ্যয়ন ও দীর্ঘকাল আলোচনার পর আমরা এই মাত্র অনুমান করিতে পারি যে, এই সকল শব্দ প্রাচীন কথক ও কবিগণ কি ভাবে গ্রহণ ও ব্যবহার করিতেন।

ঋগ্বেদ, ১০ ম, ৬৪, ৮ শ্লোকে লেখা আছে:—

“হে তৃপ্ত-ধাবমান নদী, সমুদ্র, বৃক্ষগণ! হে পর্কতগণ! এবং হে অগ্নি! তোমাদিগকে আমরা সাহায্যার্থ আহ্বান করি।

ঋগ্বেদ, ৭ ম ৩৪, ২৩, হে পর্কত! সমুদ্র! লতা এবং স্বর্গ! হে বৃক্ষারা হরিৎ পৃথিবী! হে উভয় লোক! আমাদের ধন রক্ষা কর।

ঋগ্বেদ ৭ ম, ৩৫, ৮, দূরদৃশ্য সূর্য! ভূভোদয় হও, চতুর্দিক! প্রসন্ন হও; সুদৃঢ় পর্কতগণ! নদী ও জল! প্রসন্ন হও।

ঋগ্বেদ ৩, ৫৪, ২০। হে সুদৃঢ় পর্কতগণ! আমাদের কথায় কর্ণপাত কর।

ঋগ্বেদ ৫ম, ৪৬, ৬, হে প্রশংসিত পর্কতগণ! এবং উজ্জল নদীগণ! আমাদের রক্ষা ও আশ্রয়দান কর।”



ঋগ্বেদ ৬ষ্ঠ, ৫২, ৪। “উদিত উষে ! আমাকে রক্ষা কর, হে উচ্ছৃঙ্খিত নদীগণ ! আমাকে রক্ষা কর, হে সূদৃঢ় পর্বতগণ ! আমাকে রক্ষা কর ! হে পিতৃগণ ! ঈশ্বরোদ্দেশে যাইতে আমাকে রক্ষা কর।”

ঋগ্বেদ ১০ম, ৩৫, ২। “আমরা স্বর্গ ও মর্ত্যের আশ্রয় কামনা করি। দুষ্কর্ম হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমরা নদীগণ, মাতৃগণ, শপ্পপূর্ণ পর্বতগণ, এবং সূর্য্য ও উষার আরাধনা করি। সোম অদ্য আমাদের স্বাস্থ্য ও সম্পত্তি বর্দ্ধন করুক।”

আমরা বৈদিক ইতিহাসের যে ষংক্খিৎ অবগত আছি, তাহা পঞ্জা-পেব নদীকুল-সম্বন্ধীয়, এক্ষণে দেখা যাউক, সেই নদীগণ কিরূপে সম্বোধিত হইয়াছে।

ঋগ্বেদ ১০ম, ৭৫। “হে নদীগণ ! কবিগণ বিবস্বতের এই স্থানে তোমাদের মহত্ব প্রচাব করুন। সাত সাতটা করিয়া তাহারা তিনটা গতিতে আসিয়াছে। কিন্তু সিন্ধু (সিন্ধুনদ) বেগে ও বলে অপরাপরকে পরাভূত করিয়াছেন।”

“তুমি যখন পুষ্কার লাভেব জন্য ধাবমান হইয়াছিলে, বরুণ তোমার পরিভ্রমণের পথ খনন করিয়াছিলেন। তুমি সকল সরিতের প্রভু হইয়াও পৃথিবীর একটা বক্র দেশ দিয়া গমন করিতেছ।”

“পৃথিবী হইতে স্বর্গে ধ্বনি উথিত হয়; সিন্ধু গৌরবের সহিত অবিশ্রান্ত ধ্বনি করিতেছেন, সিন্ধু বৃষের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দে আনিতেন, মেঘ হইতে যেন বজ্র নিনাদ বাহির হইতেছে।”

“মাতৃগণ যেমন শাবকের প্রতি ধাবমান হয়, শব্দায়মান গাভীগণ (নদী-গণ) তেমনি দুগ্ধ লইয়া তোমার প্রতি ধাবমান হইতেছে। রাজা যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী ছুই দল চালনা করিয়া থাকেন, তেমনি তুমি নিম্নপ্রবাহিনী এই নদীর সম্মুখে উপস্থিত হইতেছ।”

“হে গঙ্গে ! হে যমুনে ! হে সরস্বতি ! হে শতদ্রু ! হে পরুষ্ণি ! (বিতস্তা) তোমরা আমার স্তব গ্রহণ কর। হে মরুত্বা ! অসিন্ধুর সহিত এবং বিতস্তার সহিত, হে অর্জ্জিকীয়া ! সূমোমার সহিত শ্রবণ কর ;” ৫।

“ভ্রমণের জন্য প্রথমে ত্রিষতামার সহিত একত্র হইয়া হে সিন্ধু ! তুমি

সুশৰ্ত্তু, রাস এবং শ্বেতির সহিত যাইতেছ ; কুভার (কাবুলনদী) সহিত গোম-  
তীতে, মেহতুর সহিত ক্রুরমুতে উপস্থিত হইতেছ । তুমি সকলের সহিতই  
একপথে অগ্রসর হইতেছ ;” ৬ ।

“ক্রত হইতেও ক্রত, অদমনীয়, সুন্দর বড়বার ন্যায় দর্শনযোগ্য, ফেনিল,  
উজ্জল ও ঐশ্বর্যশালী সিন্ধু মেঘদিগকে প্রবাহিত করিতেছে ;” ৭ ।

“অশ্বযানে, পরিচ্ছদে, স্বর্ণে, হুর্কাদলে, পশমে ও তুণে সমৃদ্ধিশালী, সুন্দর,  
যুবা সিন্ধু মধু-প্রবাহিত দেশে প্রবাহিত হইতেছে ;” ৮ ।

“সিন্ধু তাঁহার সুখদায়ক যানে অশ্ব যোজনা করিয়াছেন ; যুদ্ধে যেন তিনি  
আমাদিগেব জন্য দ্রবাদি লুণ্ঠন করিতে পারেন । যে হেতু সেই অনিবার্য  
বা অপ্রতিহত বিখ্যাত এবং গৌরবান্বিত যানের গৌরব অতি মহৎ ;” ৯ ।

সহস্র সহস্র স্তোত্রের মতো এই কয়েকটি মাত্র নির্দিষ্ট করিলাম ।  
এই গুলি অদ্যাপি সম্পূর্ণ বোধগম্য ঈষৎস্পৃশ্য ও অর্ধ দেবতার উদ্দেশে  
কথিত হইয়াছে ।

এক্ষণে, জিজ্ঞাস্য এই, এই সকল পদার্থকে দেবতা বলা যাইতে পাবে  
কি না । কোন কোন স্থানে কখনই তাহা বলা যায় না । এমন কি  
যাঁহারা বহুদেবতার উপাসক নছেন, তাঁহারাও বলিয়া থাকেন যে, বৃক্ষ,  
পর্বত, নদী, পৃথিবী, আকাশ, উষা প্রভৃতিকে মধুগয় হইতে বলাতে তাঁহাদের  
কোন আপত্তি নাই ।

(মধুগাকে আশ্রয় দানের জন্য যখন নদী পর্বতকে সম্বোধন করিতে দেখা  
যায়, তখন কিছু নূতন বোধ হয় বটে, কিন্তু ঐবিষয় বোধের অগম্য নহে ।  
প্রাচীন মিসরদেশবাসিগণ নীল নদের বিষয় কিরূপ ভাবিত, তাহা আমরা  
জানি, এবং অদ্যাপি দেশ-হিতৈষী সুইসদিগকে শত্রুর আক্রমণ হইতে  
গৃহ রক্ষার জন্য নদী, পর্বতকে ঐরূপ সম্বোধন করিতে দেখা যায় ।  
প্রার্থনার কর্ণপাত করিতে পর্বতগণকে অমুরোধ করা হইত, ইহাও কিয়ৎ  
পরিমাণে বোধ-গম্য, যে হেতু পর্বত যদি কর্ণপাত না করিবে, তবে আমরা  
কেন তাহাদিগকে আহ্বান করিব ?

সূর্য্য দূবদর্শী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন । কেনই বা না হইবেন ? আমরা

কি অন্ধকার-ভেদী নবোদিত সূর্যের অংশু-মালাকে প্রতিদিন প্রাতঃকালে আমাদের গৃহের ছাদোপরি পতিত হইতে দেখি না? ঐ রশ্মিজাল কি আমাদের দর্শন-সামর্থ্য প্রদান করে না? তবে সূর্য কেনই বা দূরদর্শী বলিয়া উক্ত হইবে না।

✓ (নদীগণ মাতৃগণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কেনই বা না হইবে? নদী কি তাহার তীরভূমি উর্ব্বা করে না? এবং তদুপরি গোমেষকে প্রতিপালন করে না? যখন ইচ্ছা তখনই প্রাণ ভরিয়া জল পান করি, সুতরাং আমাদের জীবন কি নদীদ্বারা একরূপ রক্ষা পাইতেছে না?)

আকাশ যদি পিতা বা পিতাব ন্যায় বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে, তাহাতেই বা দোষ কি? আকাশ কি আমাদের উপর চন্দ্র বাধিতেছে না? আমাদের এবং সমস্ত জগৎকে রক্ষা করিতেছে না? আকাশের ন্যায় প্রাচীন, উচ্চ, কখন শাস্তমূর্ত্তি ও কখন বা প্রচণ্ডরূপধারী আর কি কোন পদার্থ আছে?(১)

এই সমস্ত পদার্থকে যদি আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ আনন্দ, ধান্য ও সুখের জন্য দেবতা (২) বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকেন, আমাদের তাহাতে

---

(১) এক ও অবিভীর্ণ ঈশ্বর যাহা বা বিশ্বাস স্থাপন কবে, তাহারা, যদি প্রকৃতির শক্তিতে বিশ্বাসকারিদিগের সহিত তর্ক উপস্থিত কবে, তাহা হইলে প্রায় কোন লেখককেই এই শেষোক্ত পক্ষ সমর্থন করিতে দেখা যায় না। একবার অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপিত হইলে আবার যে ভিন্ন ভিন্ন দেবতায় বিশ্বাস জন্মে, তাহা একরূপ অসম্ভব বোধ হয়। কিন্তু ঈদৃশ অসম্ভব বিষয়ও সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়। “True Story” লেখক কেলসস ইহুদী কিংবা খ্রীষ্টান অদ্বৈতবাদীদের আক্রমণ হইতে গ্রীক বহুদেবোপাসকদিগকে রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। Origen এই লেখকের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া উহা খণ্ডন করিয়াছেন। কেলসস্ লিখিয়াছেন, ইহুদীরা স্বর্গ এবং স্বর্গবাসীদের সম্মান করে। কিন্তু তাহারা সেই প্রদেশের অতি মহৎ, অতি উচ্চ পদার্থের সম্মান করে না। তাহারা অন্ধকারে ভূত যোনির, নিদ্রায় অস্পষ্ট স্বপ্নের আরাধনা করে, কিন্তু যে সকল মঙ্গলসূচক পদার্থ রহিয়াছে, যে শক্তিতে শীত, বৃষ্টি, গ্রীষ্মের উত্তাপ, মেঘ, বিদ্যুৎ, বজ্র, পৃথিবীর ফল এবং সমুদয় সজীব পদার্থ হইতেছে, যে সমুদয়ে ঈশ্বর আমাদের সম্মুখে তাহাব বিদ্যমানতা প্রকাশ করিতেছেন সেই সমস্ত স্বর্গীয় বিষয়ে তাহারা কিছু মাত্র মনোযোগ দেয় না। Froudo, ‘On Origen and Celous’ in Fraser’s Magazine, 1878, P. 157.

(২) উপনিষদে ‘দেব’ শব্দ বেগ বা বৃত্তি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে দেবগণ বৃত্তি এবং ‘প্রাণ’ নামে সর্বদাই উক্ত হইয়া থাকেন। হনুপা উপনিষদ, ৬, ৩, ২।

বিস্মিত হইবার কারণ নাই। আমরা অদ্যাপি প্রত্যক্ষ করিতেছিঁযে, উহারা আমাদের কত উপকার করিতেছে।)

যে স্তোত্রে আমাদের পাপ হইতে রক্ষা কবিবার জন্য ঐ সকল পদার্থ আহূত হইয়াছে, সেই স্তোত্রই সর্ব প্রথমে আমাদের বিশ্বয় উৎপাদন করিয়া থাকে। ফলতঃ উহা নিশ্চয়ই আধুনিক ভাব, এবং উহারা বেদা-গত বলিয়া আমরা কখন এমন মনে করিব না যে, উহারা এক সময়ে সন্তুত হইয়াছিল। খ্রীঃ পূঃ ১,০০০ শতাব্দীতে বৈদিক স্তোত্র সকল একত্র হইলেও উহারা যে, একত্র হইবার সুদীর্ঘকাল পূর্বে হইতে বিরাজমান ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই সকল ভাবের প্রকৃষ্টরূপে বর্দ্ধিত হইবারও যথেষ্ট সময় ছিল এবং এই সকল স্তোত্রে যে সকল স্বাধীন ভাব পরিব্যক্ত দেখা যায়, তৎ সমুদয় যে, শত শত বৎসর পূর্বে হইতে ভবিষ্যতে সত্যের বিজয়-জন্য ক্রমে সৈন্য সংগ্রহ করিতেছিল, তাহাও আমাদের মনে রাখা কর্তব্য।

অতি সামান্য ও সহজ উপায় অবলম্বন করিয়া আমরা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি। যে কবিগণ নদীগণকে মাতা বলিয়া এবং আকাশকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, যাহারা উহাদের নিকট তাঁহাদের কথা শুনিতে ও তাঁহার পাপ দূর করিতে প্রার্থনা করিয়াছেন, এক্ষণে আমরা সেই সকল বৈদিক কবিগণের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছি। আমরা যদি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতাম যে, আকাশ, পর্বত এবং নদী প্রভৃতিকে কি আপনারা দেবতা জ্ঞান করিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা এ কথার কি উত্তর দিতেন? আমার বোধ হয়, কোন উত্তর দেওয়া দূরে থাকুক, আমাদের প্রকৃত অভিপ্রায়ও তাঁহারা হয়ত বুঝিতে পারিতেন না। মনুষ্য, বোটক, পতঙ্গ, মৎস্যাদি জীব কি না, এবং ওক প্রভৃতি বৃক্ষ উদ্ভিদ কি না, একথা একটী শিশুকে জিজ্ঞাসা করিলে সে যাহা বুঝিবে, তাঁহারাও আকাশ, পর্বত ও নদী, দেবতা কি না, এ প্রশ্ন ঐরূপ বুঝিতেন। উত্তর দিতে হইলে নিশ্চয়ই তাঁহারা “না” বৈ আর কিছুই বলিতেন না। (যেহেতু তাঁহারা তদবস্থায়ও এরূপ উচ্চ ধারণার অসিয়া উপনীত হন নাই, পরে যে ধারণা দ্বারা এক বিভিন্ন

প্রকৃতির পদার্থের অনুভূতি জন্মিয়া থাকে। মানব যখন ধীরে ধীরে জৈবঃ স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্য পদার্থের ধারণা করিয়া আসিতেছিলেন তখন নিশ্চয়ই উহার সঙ্গে ধীরে ধীরে ঐশ্বরিক ধারণাও জন্মিতেছিল। এই সমুদয় জৈবঃ স্পৃশ্য পদার্থে অভ্যস্ত হইয়া, অস্পৃশ্য ও অজ্ঞেয় পদার্থ প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত ছিল, তাহার তহানুসন্ধান, একটী, দুইটী, বা ততোধিক বৃত্তি, কোন একটী নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের অনুসন্ধান নিবস্ত হওয়াতেই, আরম্ভ হইয়াছিল। এইরূপে, পঞ্চেন্দ্রিয়ের গোচ্যবাতীত বিষয়কেও হয় স্বীকার করা হইয়াছে, নয় অন্যরূপে তাহাব্ তহানুসন্ধান হইয়াছে। যেমন দুটী কি একটী ইন্দ্রিয়ের বোধ্য পদার্থ-পরিপূর্ণিত একটী জগৎ পবিত্র-মান রহিয়াছে, তেমনি ইন্দ্রিয়ের বিষয়বাতীত পদার্থপূর্ণ আর একটী জগৎও ধারণামধ্যে উপস্থিত হইয়াছে। এই জগৎ প্রকৃত, এবং নদী, বৃক্ষ, পর্বতাদির ন্যায় মানবের উপকারী বলিয়াও স্বীকৃত হইয়াছে।)

এখন অর্ক স্পৃশ্য হইতে অস্পৃশ্য এবং স্বাভাবিক হইতে স্বভাবাতীত, এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্থান বলিয়া যাহা অনুভব হয়, তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। প্রথমেই অগ্নির বিষয় বলা যাইতেছে।

## অগ্নি।

অগ্নি কেবল দৃশ্য বলিয়া বোধ হয় না, স্পৃশ্য বলিয়াও বোধ হয়, বস্তুতঃও উহা তাহাই। কিন্তু আমরা আজি কালি অগ্নিকে যাহা বলিয়া জানি, তাহা ভুলিয়া জগতের আদিম বাসীরা উহাকে যে রূপ মনে করিতেন, সেই রূপ ভাবিতে চেষ্টা করিব। এমন হইতে পারে যে, মানব অগ্নি প্রজ্জ্বলন-বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিয়া বহুকাল কেবল ভাষা ও ভাবের গঠন বিষয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। অগ্নি-প্রজ্জ্বলন-ক্রিয়ার আবিষ্কারের সঙ্গে তাঁহাদের জীবনে নিশ্চয়ই একটী প্রবল বিপ্লব ঘটয়াছিল, এবং উহার আবিষ্কারের পূর্বে তাঁহারা বজ্রাগ্নির ক্ষুণ্ণ দৃশ্য দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা সূর্যের আলোক ও

উত্তাপ দর্শন ও অনুভব করিয়াছিলেন এবং বজ্রাগ্নি ও পরস্পর সংঘর্ষগোষ্ঠিত দাবাগ্নিতে বনরাজি ভস্মসাৎ হইতে দেখিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন। অগ্নির এইরূপ যুগপৎ আবির্ভাব ও তিরোভাব দেখিয়া তাঁহারা উহার স্বরূপ নির্ধারণে কিস্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই এখানে অগ্নি বিরাজমান ছিল, পরক্ষণেই উহা নির্ধাপিত হইল। কোথা হইতেই বা আসিয়াছিল, কোথাই বা গেল? যদি পৃথিবীতে ভূত প্রেত থাকে, তাহা হইলে উহা অগ্নি। উহা কি মেঘ হইতে আইসে নাই? উহা কি সমুদ্রে বিলীন হয় নাই? উহা কি সূর্য্যে ছিল না? উহা কি নক্ষত্র গণের মধ্যে পরিভ্রমণ করে নাই? আমাদের নিকট এইরূপ প্রশ্ন বালকের প্রশ্ন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু অগ্নিকে স্ববশে আনিবার পূর্বে মনুষ্যের মনে এইরূপ প্রশ্ন স্বভাবতই উত্থিত হইত। সংঘর্ষণ দ্বারা অগ্ন্যুৎপাদন করিতে জানিলেও তাঁহারা কার্য্য কারণ বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহারা হঠাৎ আলোক বা উত্তাপের আবির্ভাব দেখিতেন। তাঁহারা উহাতে স্তম্ভিত হইতেন এবং বালকদের ন্যায় অগ্নির সহিত ক্রীড়া করিতেন। যখন তাঁহারা উহার বিষয় ভাবিতে বা কহিতে শিখিলেন, তখন তাঁহারা কি করিলেন? তাঁহারা উহার কার্য্য দেখিয়া উহার নামকরণ করিলেন। তাঁহারা উহাকে দীপ্তিকারক ও দাহক কহিয়াছেন। তাঁহারা অগ্নিকে সূর্যালোকের ন্যায় দীপ্তিকারক ও বজ্রাগ্নির ন্যায় দাহক মনে করিতেন। তাঁহারা উহার সত্ত্ব সঞ্চরণ ও হঠাৎ আবির্ভাব ও তিরোভাব দর্শনে উহাকে দ্রুত বা চপল কহিয়াছেন। সংস্কৃতে উহাকে অগ্নি এবং লাতিনে ইগ্নিশ বলে।

অগ্নি ছই খণ্ড কাষ্ঠ-প্রস্তুত সস্তান, জন্ম মাত্র ইহা পিতামাতা-নাশক অর্থাৎ যে ছুইখণ্ড কাষ্ঠ হইতে ইহা জন্মিয়াছে, তাহাব ধ্বংসকাবক; জল স্পর্শ মাত্র ইহা নির্ধাপিত ও অদৃশ্য হয়। পৃথিবীর উপর ইহা বন্ধু-স্বরূপ বাস করে, ইহা বন-নাশক, ইহা যজ্ঞীয় উপহার স্বর্গ হইতে আকাশে লইয়া যায় এবং মনুষ্য ও দেবতার মধ্যে দৌত্যকার্য্য করে। অতএব অগ্নির অসংখ্য নাম ও সংজ্ঞা দেখিয়া এবং তৎসম্বন্ধে নানা গল্প ও পুৰাণ শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইবাব কারণ নাই। অগ্নিতে কোন অদৃশ্য, অজ্ঞেয়, অথচ অস্বীকারের অযোগ্য, দেবতা বলিয়া স্বীকৃত পদার্থ আছে, এই

বলিয়া যে এতটী অতি প্রাচীন কথা আছে, তাহা স্তনিয়া ও আমাদের চমৎকৃত হওয়া উচিত নহে।

### সূর্য্য।

অগ্নিব অব্যবহিত পরেই সূর্য্যের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্য্য ও অগ্নির মধ্যে কখন কখন একত্বও কল্পিত হইয়াছে। উহা দর্শনেন্দ্রিয় ভিন্ন আর সকল ইন্দ্রিয়ের অত্যর্ক বলিয়া অন্যান্য পদার্থ হইতে বিভিন্ন। সূর্য্য জগতের আদিম অধিবাসিদের মনে কি রূপ পদার্থ বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল তাহা স্থির করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য। সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ টিন্ডেল সূর্য্য সম্বন্ধে আজি কালি যে সকল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়াও সূর্য্য সম্বন্ধে প্রাচীনগণের কি রূপ ধারণা ছিল তাহা অবধারণ করা সহজ-সাধ্য নহে। ফলতঃ আর্য্যগণের মধ্যে সূর্য্য লইয়া এত কথাব সৃষ্টি হইল কেন? এই বলিয়া অনেকে চমৎকৃত হন। চমৎকৃত হইবার বিষয়ই বটে। সূর্য্যোব নাম অসংখ্য এবং তাহার গল্পও অসংখ্য। কিন্তু সূর্য্য কে? কোথা হইতে আসিল? এবং কোথায়ই বা যায়? এ রহস্য এপর্য্যন্ত অবিদিত ছিল। সূর্য্য অন্যান্য পদার্থ অপেক্ষা উত্তম রূপ পরিচিত হইলেও উহার মূল রহস্য আবিস্কৃত হইয়া উঠে নাই। যেমন মনুষ্য মনুষ্যের চক্ষু পানে চাহিয়া তাহার অন্তরায়্য দেখিতে প্রয়াস পায়, না দেখিলেও দেখিয়াছে বলিয়া মনে করে এবং তাহাতে সন্দেহ না করিয়া তাহার সমাদর করিয়া থাকে, সেই রূপ মনুষ্য সূর্য্যপানে চাহিয়া তাহার অন্তরায়্য নিরূপণে অসমর্থ হইলেও এবং উহার অচণ্ড প্রতাপে তাহার ইন্দ্রিয়গণ পর্য্যুদস্ত হইয়া গেলেও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দেখিয়াছি এই বলিয়া বিশ্বাস করিতেন ও অগ্নিপাত পূর্ব্বক পূজা করিতেন।

ভারতের অসভ্য সাওতাল জাতি সূর্য্যের পূজা করিয়া থাকে। তাহারা সূর্য্যকে চণ্ড কহিয়া থাকে। চণ্ড অর্থে উজ্জল। চন্দ্রও ঐ নামে পরিচিত। সম্ভবতঃ ইহা সংস্কৃত চন্দ্র। যে সকল খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারক সাওতালদের মধ্যে বাস করিয়া থাকে, সাওতালেরা তাহাদিগকে বলিয়াছে যে চণ্ড পৃথিবী



সৃজন করিয়াছেন। সূর্য্য পৃথিবী সৃজন করিয়াছেন, ইহা অসম্ভব এই রূপে  
ঘনিলে তাহারা বলিয়া থাকে, “না এ চণ্ড নচে, যে চণ্ড পৃথিবী সৃজন  
করিয়াছেন তিনি অদৃশ্য” (১)।

### উষা।

সর্ব্বাদৌ উদীয়মান সূর্য্য, অস্তমিত সূর্য্য ও গোপূর্ণি উষা বলিয়া কথিত  
হইত। কিন্তু কিছুকাল পবে এই দুইটি প্রাকৃতিক ক্রিয়া নামে পৃথক্ পড়ে।  
এতদ্বিষয়ে অসংখ্য গল্প ও উপকথা রহিয়াছে। প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যার  
পর দিবা ও রাত্রি ও তাহাদের নানা প্রতিনিধি দৃষ্ট হয় যথা, দিয়স্ কেরি দুই  
অশ্বিন, আশাশ, পৃথিবী ও তাহাদের অসংখ্য বংশাবলী। বস্তুতঃ আমরা  
একগুণে পুৰাণ ও ধর্ম্ম বিষয়ের নানা কাহিনীজালে ব্যাপ্ত রহিয়াছি।

### বৈদিক দেবতাগণের মধ্যে আরাধ্য পদার্থ।

যে সমস্ত অস্পৃশ্য পদার্থে বিষয় বিবৃত হইল, তাহাদের সকল গুণিই  
আমাদের সন্নিঃটবর্ত্তী ও দর্শনেন্দ্রিয়েব গোচর। যে সমস্ত পদার্থ অবগে-  
ন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ও অপবাপব ইন্দ্রিয়েব অগ্রাহ্য এখন তাহাদের বিষয়ই বিবৃত  
হইবে (২)।

(১) ‘What is the correct name for God in Santhali?’ by L. O. Skrefsrud  
1876, p. 7.

(২) জেনেফন কহিয়াছেন, (Mem IV. 3,14) সূর্য্য সব বস্তুই দৃষ্টিপথবর্ত্তী রহিয়াছে, কিন্তু  
কাহাকেও আপনাব দিক ভাল করিয়া দেখিতে দিতেছে না। যদি কেহ তাহায় দিকে  
চাহিয়া থাকে, তাহা হইলে সূর্য্য তাহার দৃষ্টি হরণকিবে। ঈশবাব প্রতিনিধি সকল অদৃশ্য।  
উপর হইতে নিচু প্রেরিত হয়, এবং বাহ্য পথে পান, সমস্তই পর্য্যবেক্ষিত করিয়া থাকে।  
কিন্তু ইহা যখন অদৃশ্যে, যখন আঘাত করে, যখন চলিয়া যায়, তখন দৃষ্টিগোচর হয় না। যদিও  
আমরা বায়ুর আগমন স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারি, তথাপি তাহা দেখিতে পাই না।

See also Municius Felix as quoted by Feuerbach ‘Wesender Religion,’ p. 145



## বজ্র ।

আমরা বজ্রনিদানই শ্রবণ করিয়া থাকি, কিন্তু উহা দেখিতে, অনুভব করিতে, আশ্রয় করিতে কিংবা আশ্বাসন করিতে পারি না। প্রাচীন আশ্রয়গণ অপ্রাণি-সম্ভূত কোন শব্দ বা নিদান ধারণা করিতে সমর্থ হইতেন না। কাননে ধ্বনি শুনিলে যেমন তাঁহারা কাননস্থ ধ্বনি-কারক ব্যাঘ্র কি সিংহ বা অন্য কিছু মনে করিতেন, তেমনি বজ্রধ্বনিকে তাঁহারা ধ্বনিকারক মাত্র জানিতেন, তদতিরিক্ত কিছু তাঁহাদের ধারণায় উপস্থিত হইত না। ফলতঃ অপ্রাণিসম্ভূত কোন শব্দ তাঁহাদের কাছে অসম্ভব বলিয়া বোধ হইত। আমরা সর্ব প্রথমে এই বজ্রীশব্দে কাহারও নাম বুঝি, এবং উহা অদৃশ্য হইলেও উহার অস্তিত্বে বা ইষ্টানিষ্ট উৎপাদন-শক্তিতে কোন সন্দেহ নাই, এইরূপ মনে করি। বেদে বজ্রী রুদ্র নামে অভিহিত হইয়াছে, এবং একবার ঐ নামের সৃষ্টি হইলে কিরূপে রুদ্র যে বজ্রধারী, ধনুর্ধর, দুষ্ট-নাশক, শিষ্টক-রক্ষক, অন্ধকারাবসানে আলোকদায়ক, গ্রীষ্মাবসানে তৃপ্তিদায়ক ও পীড়াবসানে শাস্ত্যদায়ক প্রভৃতি বলিয়া কথিত হইয়াছেন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারি। বৃক্ষের নবপত্রবোদ্ভেদ অবলোকন করিবার পর উহার পশ্চাছুদ্ভেদ দেখিয়া যেমন চমৎকৃত হইবার কোন কারণ নাই, সেইরূপ বজ্র শব্দের ধারণা, কি সূত্রে হইয়াছে এবং বেদে উহা কেন স্তুত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আশ্চর্যান্বিত হইবার কারণ দৃষ্ট হয় না।

## বায়ু ।

ইহার পরেই বেদে বায়ুব বর্ণন দেখিতে পাওয়া যায়। উহা কেবল আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য শ্রবণেন্দ্রিয়ও উহার পোষকতা করিতেছে এবং চক্ষুও প্রকারান্তরে উহা স্বীকার করিয়া থাকে।

এখানেও প্রাচীন ভাব ও ভাষাকে, বায়ু ও বায়ুবহের প্রভেদ করিতে দেখা যায় না। উভয়ই এক, এবং উভয়ই যেন আমাদের ন্যায় কোন পদার্থ। বেদে বায়ু ও বাত এই উভয় পদার্থের উদ্দেশে স্তোত্র দেখা যায়, কিন্তু তাহা পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত, ক্লীবলিঙ্গে নহে। বায়ু সর্বদা

প্রশংসিত না হইলেও গুণকীর্তনকালে উহা সমধিক সম্মানিত হইয়াছে।  
উহা জগৎপ্রভু, আদিভব, দেব-নিখাস এবং জগতের অক্ষর বলিয়া স্তুত  
হইয়াছে। আমরা উহার স্বর শুনিতে পাই, কিন্তু উহাকে দেখিতে পাই না(১)।

### মরুৎ ।

বায়ু ভিন্ন বেদে মরুৎগণেরও কথা লিখিত আছে। উহারা নাশক,  
বজ্রবিদ্যুৎসহ ক্ষিপ্রগামী, বৃক্ষ ও গৃহ-নাশক, জীব-নাশক, পর্বত ও শৈল  
বিদাবক বলিয়া কথিত হইয়াছে। উহারা আইসে ও যায়, কিন্তু উহাকে  
কেহই স্পর্শ করিতে পারে না, কিংবা কোথা হইতে আসিয়াছে ও  
কোথাই বা যায়, তাহা কেহ অবধারণ করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু তাই  
বলিয়া কে উহাদের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিতে পারে? কেইবা উহাদেব  
পদে মস্তক আনত না করিবে, এবং কেই বা উহাদিগকে কায়মনোবাক্যে  
শ্রদ্ধা ও স্তুতি না করিবে? উহারা আমাদের চূর্ণ করিতে পারে, কিন্তু  
আমরা উহাদিগকে চূর্ণ করিতে পারি না। এই বিশ্বাসে উহাদের প্রতি ধর্ম-  
ভাবের অক্ষুব লক্ষিত হয়। অগ্নির ন্যায় বায়ুতেও যে, কোন অদৃশ্য, অজ্ঞেয়  
অথচ অস্বীকারের অনোগ্য বিষয়—ইহাই প্রভু হইতে পারে—কল্পিত হইবে,  
তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

### বৃষ্টি ও বর্ষণ-কারী ।

সর্বশেষে বৃষ্টিব সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। বৃষ্টি কখনই অস্পৃশ্য পদার্থ  
মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। কিন্তু উহা যদি কেবল জল বলিয়া  
অবধারিত হইত এবং তদনুসারে উহার নাম হইত, তাহা হইলে উহা স্পৃশ্য  
পদার্থ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারিত। কিন্তু প্রাচীনেরা সাদৃশ্য দর্শন  
অপেক্ষা অসাদৃশ্য অবলোকনে বড়ই দক্ষ ছিলেন। আদিম মনুষ্য বৃষ্টির  
আগমন-স্থান অনিদিষ্ট থাকায় উহাকে কেবল সাধারণ জল মাত্র বলিয়া

ভাবিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি উহার দীর্ঘকাল অনুপস্থিতিতে উদ্ভিদ জীব ও মনুষ্য-ধ্বংস দেখিতেন এবং উহার আগমন সঙ্গেই প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করিতেন। কোন কোন দেশে বায়ু ও বজ্রী, বৃষ্টি-দাতা বলিয়া অবধারিত হইত। কিন্তু যে দেশে বার্ষিক বৃষ্টি-সমাগমের উপর জীবন-মৃত্যু নির্ভর কবিতেছে, তথাকার লোকেরা যে বজ্রী ও বায়ুর ন্যায় বর্ষকেরও পূজা করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? সংস্কৃত ভাষায় বাবিবিন্দু, “ইন্দু” (১) (পুংলিঙ্গ) নামে পরিচিত, এবং উহাদের প্রেরক ইন্দ্র নামে বিদিত। ইনিই বেদের দেবগণ-মধ্যে সর্ব-প্রধান। ভারতবর্ষের আৰ্য্য অধিবাসীরা ইহার পূজা করিতেন।

### বৈদিক বিশ্ব-দেবকুল।

আকাশ দীপ্তি-দায়ক, এবং জগৎ প্রভাকর বলিয়া কল্পিত এবং তন্নিবন্ধন দ্যৌস, জিউস বা জুপিটার বলিয়া উক্ত হইত, তাহা পূর্বে দেখান হইয়াছে। এক্ষণে দেখা গেল, কিরূপে এই আকাশ-স্থলে বজ্র, বর্ষা, ঝটিকা প্রভৃতি নৈসর্গিক ব্যাপার-সাধক নানা দেবতা কল্পিত হইয়াছে। (এতদ্ব্যতিরিক্ত উহার জগৎ-ব্যাপকতা শক্তি অবলোকন করিয়া ঈশ্বরের সর্ব-ব্যাপিত্ব কথা মনে হইতে পাবে এবং এই সর্ব-ব্যাপকতা-শক্তি-সম্পন্ন দেবতা পবিশেষে রাত্রি-দেবতা হইতে পারেন। তদনন্তর এই সঙ্গে সঙ্গে দিবা, রাত্রি, প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যা-কাল, এবং স্বর্গ ও পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী অনেক দেবতা কল্পিত হইতে পাবে।) এই সকল পরিবর্তন-ঘটনা বেদে প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। বেদে দেবগণের যুগল মূর্ত্তি-কল্পনাও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা বরুণ (সর্বব্যাপী দেবতা) এবং মিত্র (দিবসের প্রদীপ্ত সূর্য্য); অশ্বিনৌ (প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল) দ্যাবাপৃথিবী স্বর্গ ও পৃথিবী।

আমরা এই রূপে আৰ্য্য-জগতে এক একটা কবিয়া বৈদিক কবিগণ কল্পিত বিশ্বদেবকুলের অভ্যুত্থান প্রত্যক্ষ করিতেছি। আনন্দ ভাবনীয় দেবগণের

(১) Cf.—Sindhu and sidhra, mandu and mandra, ripu and ripra etc.

অক্ষুরিতাবস্থামাত্র অবলোকন করিতেছি। কবি-কল্পনালোকে ঐহাদের কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি হইয়াছে, তাহা আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারি। এরূপ হইলেও দেবতাগণকে তিন শ্রেণীভুক্ত করা গেল। ভূত, বল, শক্তি, আত্মা প্রভৃতি শব্দ গুলি অত্যন্ত স্বতন্ত্র ভাবাত্মক হওয়ায় দেব শব্দেই ব্যবহৃত হইল।

১। অর্দ্ধদেবতা বা উপদেবতা। যথা বৃক্ষ, পর্বত এবং নদী, পৃথিবী, সমুদ্র (অর্দ্ধ-স্পৃশ্য পদার্থ)।

২। আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র, উষা, অগ্নি (অস্পৃশ্য পদার্থ) এবং বজ্র, বিদ্যুৎ বায়ু, বৃষ্টি সাধারণতঃ দেবতা বলিয়া অভিহিত। শেষোক্ত চারিটিকে, অনিয়মিত আবির্ভাব বশতঃ ভিন্ন-শ্রেণী-ভুক্ত করা যাইতে পারে।

### দেবতাগণ।

কোন ভাষার কোন শব্দই দেবতা শব্দের বহুবচনে প্রতিক্রপ হইতে পারে না। ইংরাজিতে God শব্দের বহুবচন-প্রয়োগ আর বৃত্তের দুই কেন্দ্র কল্পনা করা উভয়ই সমান। এতদ্ভিন্ন Deities গ্রীক দীওই এবং লাতিন dii শব্দ প্রয়োগ করাতেও কালোনৌচিত্য দোষ দৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং সংস্কৃত দেবতা শব্দের প্রতিশব্দ প্রয়োগের চেষ্টা বৃথা। অগ্রে দেব শব্দে উজ্জল বুঝাইত এবং ইহা অগ্নি, আকাশ, উষা, সূর্য্য, নদী, বৃক্ষ ও পর্বত প্রভৃতি নৈসর্গিক পদার্থে প্রযুক্ত হইত। এইরূপে ইহা একটা সাধারণ শব্দ হইয়া উঠে। বেদে প্রায় এমন কোন প্রাচীন স্তোত্রই দেখা যায় না, যাহাতে এই দেব শব্দ উজ্জল ও স্বর্গীয় আত্মা অর্থে ব্যবহৃত না হইয়াছে। (দেব শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিলুপ্ত হইলেও ইহা সর্ব প্রকার উজ্জল শক্তি অর্থে প্রযুক্ত হইত। ইংরাজি deity ও লাতিন deus শব্দ অদ্যাপি ঐ অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। বেদের দেবতা শব্দে এবং ইংরাজি divinity শব্দে কেবল শাদিক একতা দৃষ্ট না হইয়া ভাবগত একত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে।)

### দৃশ্য ও অদৃশ্য ।

এক্ষণে কিরূপে প্রাচীন আৰ্য্যগণ দৃশ্য, নদীর ন্যায় স্পৃশ্য ও ত্রজের ন্যায় শ্রবণেন্দ্রিয় গোচর পদার্থ হইতে অদৃশ্য, অস্পৃশ্য, শ্রবণাতীত দেবতা ও ঈশ্বরের কল্পনা ও ধারণা করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহা এক প্রকার অবধারিত হইল। (আমাদের প্রাচীন পূর্ব পুরুষেরা যে, যথাক্রমে জড়জগৎ হইতে ইন্দ্রিয়ের অতীত জগতাস্তরে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন, দেব বা deus শব্দ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। প্রকৃতি স্বয়ং এই পথ প্রদর্শন করাইয়াছেন। অথবা প্রকৃতি প্রচ্ছন্নবেশধারী দেবতা হইলেও (১) তদপেক্ষা কোন শ্রেষ্ঠ পদার্থ এই পথ-প্রদর্শক হইয়া থাকিবে।) প্রাচীন আৰ্য্যগণ এই প্রাচীন পথ অবলম্বন করিয়া আমাদের ন্যায় বিদিত হইতে অবিদিত এবং প্রকৃতি হইতে প্রকৃতির ঈশ্বরে গমন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

অনেকে এমন বলিতে পারেন যে, ঐ উন্নতি অন্যায় রূপে হইয়াছে। এতদ্বারা আমাদেরকে বহু ও এক দেবতার উপাসনায় প্রবৃত্ত করিতে পারে, এবং পরিশেষে ভাবুক মাত্রকেই নাস্তিকতায় লীন করিতে সক্ষম হয়। মনুষ্যের কার্য্য এবং ক্রিয়া ভিন্ন কর্তা বা কৃতকর্মের সম্বন্ধে কোন কথা কহিবার অধিকার নাই।

পূর্ক্সাক্ত রূপ প্রতিবাদ দূরীকরণ জন্য এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, বৈদিক আৰ্য্যগণ এই পথ অবলম্বন করিয়া যে, বহু দেবতায় ও পরিশেষে নাস্তিকতাতে নিমগ্ন হইয়াছেন, তাহা সত্য। কিন্তু প্রাচীন দেবতাগণ অস্বীকৃত হইলে পর তাঁহারা দেবতা হইতেও শ্রেষ্ঠ পদার্থের তত্ত্ব অবধারণ না করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহারা জগতের প্রকৃত আত্মা ও অবশেষে তাঁহাদের স্থায় প্রকৃত আত্মা নিরূপণে সক্ষম হইয়াছিলেন। আৰ্য্যগণ হইতে আমাদেরই বা প্রভেদ কি? তাহাদের ন্যায় অদ্যাপি আমরাও কার্য্য দেখিয়া কর্তার কল্পনা করিয়া থাকি। কর্তা ব্যতিরেকে কার্য্যোৎপত্তি হইতে পারে, আমাদের মনে একবার এইরূপ বিশ্বাস জন্মিলে ঐ সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আত্ম-বিশ্বাস বিলুপ্ত হইবে, এবং আমাদের চক্ষু কাচ-চক্ষু হইয়া উঠিবে।

(১) Seneca, Benef. IV. 7, I.

আমাদের কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হইয়া কার্য্য মাত্রে পর্য্যাবসিত হইবে, এবং আমরা আশ্রয়শূন্য প্রাণী এবং উদ্দেশ্য-শক্তিশূন্য যন্ত্র হইয়া পড়িব।

(আর্য্যগণ যে পথ অবলম্বন করিয়া দৃশ্য হইতে অদৃশ্যের এবং সীমাবদ্ধ হইতে অসীমের করনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা সুদীর্ঘ ও বন্ধুব হইলেও উহাই প্রকৃত পথ। এই জগতে উহার শেষ সীমায় উত্তীর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা না থাকিলেও অপর পথের অভাবে আমরা উহাতেই বিশ্বাস করিতে পারি। মনুষ্য ঐ পথ অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃই অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে উন্নত হইয়াছেন। যতই উর্দ্ধে উঠা যায়, জগৎও তত ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয়, স্বর্গও তত নিকটবর্তী হয়, আমাদের অন্তঃকরণ ততই প্রশস্ত হইতে থাকে এবং আমাদের বাক্যের অর্থও ততই গূঢ় হইতে থাকে।)

এই স্থলে আমার একজন প্রিয়তম বন্ধুব—যাহার কণ্ঠধ্বনি দীর্ঘকাল অতীত হয় নাই এই ওয়েষ্টমিন্‌স্টার আবিতে শ্রুতি-প্রবিষ্ট হইয়াছিল, যাহার জীবন্তমূর্ত্তি আমার অধিকাংশ শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে বর্ত্তমান রহিয়াছে—বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি। চার্লস কিঙ্গস্‌ল বলিয়াছেন “আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ জগতের চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মনে মনে এইরূপ ভাবিয়াছিলেন যে, যদি সর্ব্ব-পিতা থাকেন, তবে তিনি কোথায়? তিনি থাকিলেও জগতে থাকিতে পারেন না, কারণ ইহা ধ্বংস হইবে। এমন কি সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র-গণেও থাকিতে পারেন না, যেহেতু, ইহারাও ধ্বংস হইবে। তবে সেই অবিনশ্বর কোথায়?

“তৎপর এইরূপ ভাবিয়া আর্য্যগণ চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র প্রভৃতি পরিবর্ত্তনশীল পদার্থ সমূহ অতিক্রম করিয়া নিশ্চল, নীল, অসীম স্বর্গরাজ্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন।

“ঐ অসীম স্বর্গরাজ্য পরিবর্ত্তনশীল নহে, সর্ব্বদা ই এক ভাবাপন্ন রহিয়াছে। মেঘ, ঝড় ও জগতের বাষ্পচয় উহার অতি অধোদেশে পড়িয়া রহিয়াছে। নভোমণ্ডল চিরদিনই স্থির ও উজ্জল রহিয়াছে। ঐ অবিনশ্বর, দীপ্তিমান বিশুদ্ধ অসীম প্রদেশেই অবিনশ্বর ও অসীম সর্ব্ব-পিতা অবস্থান করিতেছেন।”

উাহারা এই সর্ব্ব পিতাকে কি বলিয়া নির্দেশ করিতেন?

পাঁচ সহস্র বা ততোহধিক বৎসর পূর্বে যখন সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিন প্রভৃতি ভাষার অক্ষরও জন্মে নাই, আর্য্যগণ তাঁহাকে দ্যৌপিতা বা স্বর্গীয়-পিতা বলিতেন।

চারি সহস্র বা ততোহধিক বৎসর পূর্বে যে আর্য্যগণ দক্ষিণাভিমুখে আগমন করিয়া পঞ্চাবেব নদীতীরে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে দ্যৌপিতা বা স্বর্গীয় পিতা বলিয়াছেন।

তিন সহস্র বা ততোহধিক বৎসর পূর্বে হেলসপন্ট নদীতীরবাসী আর্য্যগণ তাঁহাকে জিউস্ পিতা বা স্বর্গ-পিতা কহিয়াছেন।

দুই সহস্র বৎসর পূর্বে ইতালিবাসী আর্য্যগণ উর্কদিকে উজ্জল স্বর্গাভিমুখে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক তাঁহাকে জুপিটার, স্বর্গ-পিতা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

এবং সহস্র বৎসর পূর্বে জন্মণীর অন্ধকারাবৃত বনমধ্যে টিউটন আর্য্যগণ-ঐ স্বর্গ-পিতাকে তাঁহার প্রাচীন নামে টিউ বা জিউ অর্থাৎ সর্ব্ব-শক্তিমান বলিয়া আহ্বান করিয়াছেন।

ফলতঃ কোন ভাব এবং কোন নামই একবারে বিলুপ্ত হয় নাই। আমরা যদি ঐ অদৃশ্য, অনন্ত, সর্ব্ববাপী, অবিদিত, জগতের প্রকৃত আত্মা এবং আমাদেরও প্রকৃত আত্মা স্বরূপ পরমেশ্বরের কোন নাম রাখিতে ইচ্ছা করি, তাহাহইলে আমরা পুনরায় বালকের ন্যায় বাল্যভাবাপন্ন হইরা অন্ধকারাবৃত ক্ষুদ্র কক্ষমধ্যে জানু পাতিয়া বসিয়া আমাদের “স্বর্গবাসী পিতা” ঈশ্বরের এই নাম ভিন্ন আর কি অধিক সুন্দরতর নাম বাহির করিতে পারি?

---



## অসীমত্ব ও বিধির সম্বন্ধে ধারণা ।

এখন ধর্মের কাল যে অগীত হইয়াছে এবং ধর্ম-বিশ্বাস যে স্বপ্ন বা ধালসুপ্ত ক্রীড়া মাত্র এই মত সমর্থন করিতে আজি কালি প্রাত্যহিক সাপ্তাহিক, মাসিক এবং ত্রৈমাসিক প্রভৃতি অনেক বহুলপ্রচার সাময়িক পত্রিকা দেখা যায় । ইহাদের মতে অবশেষে দেবগণ নির্ণীত ও দূরীকৃত হইয়াছেন । ইহাদের মত যে, ইন্দ্రిয়ের সাহায্য ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে জ্ঞানাগম অসম্ভব, ভূতার্থ ও সীমাবদ্ধ বস্তু মাত্র লইয়াই পরিতৃপ্ত থাকা কর্তব্য, এবং অসীম, স্বভাবাতীত ও স্বর্গীয় প্রভৃতি শব্দ গুলি ভবিষ্যতে অভিধান হইতে দূরীকৃত করা আবশ্যিক ।

কোন ধর্মের অনুকূল বা প্রতিকূলে কিছু বলা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে । কারণ সকল ধর্মের সপক্ষ ও বিপক্ষ লোকের অভাব নাই । সুতরাং আমার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন । ভাষা এবং ইতিহাসের সাহায্যে ধর্মের মূল-নির্ণয় যত দূর সম্ভবে, তাহাই প্রদর্শনীয় । কোন ধর্ম সম্পূর্ণ কি অসম্পূর্ণ, সত্য কি মিথ্যা, তাহার নির্ণয়ে ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, মোল্লা প্রভৃতি সকল ধর্মের তত্ত্ববিৎগণ ব্যাপৃত থাকুন । ধর্ম কিরূপে সমুৎপন্ন হইতে পারে, আমাদের ন্যায় মনুষ্যজাতিই বা কিরূপে ধর্ম লাভ করিল, ধর্ম বা কি এবং কিরূপেই বা উহা উহার বর্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইল, এই সমস্ত নির্ণয় করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ।

ভাষাবিজ্ঞানে ব্যাপৃত হইলে কোন্ ভাষা সম্পূর্ণ বা কোন্ ভাষা অসম্পূর্ণ, কোন ভাষাতে বিশেষ্য পদ বা ক্রিয়াপদ অধিক ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার নির্দ্ধারণে এস্থলে বিশিষ্ট প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হয় না । সর্ব প্রথমে এক মাত্র ভাষা ছিল, অদ্যাপি তাহাই আছে বা ভবিষ্যতে তাহাই থাকিবে, একরূপ বিশ্বাস প্রথমে কাহারও থাকে না । আমরা কেবল ভূতার্থ সমূহ সংগ্রহ ও বিভাগ করিয়া তৎসমুদয় উপলব্ধি করিতে যত্নবান্ হই । এতদ্বারা ক্রমে সকল ভাষায় প্রকৃত মূল নির্ণয় করিতে পারি, যে যে নিয়মানুসারে মানব-ভাষার বৃদ্ধি ও ক্ষয় হইতে পারে, এবং পরিণামে উহার যে দিকে ধাবিত হইবার সম্ভাবনা আছে, তৎসমুদায় অবধারণ করিতে সমর্থ হই ।



ধর্ম-বিজ্ঞানসম্বন্ধেও এইরূপ। প্রত্যেক লোকেরই স্বীয় মাতৃভাষা ও মাতৃধর্মসম্বন্ধে নিজের মত বা ধারণা থাকিতে পারে। কিন্তু আমরা ইতিহাস লেখক হইয়া সকল বিষয়েই একতা অবলম্বন করিব। ইতিহাস-মুখে জগতের সকল ধর্মের যে সকল প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমরা কেবল তাহাই সংগ্রহ করিব, এবং তৎসমুদয় বাছিয়া বাছিয়া সকল ধর্ম-বিশ্বাসেরই মূল নির্ণয় করিতে যত্নবান্ হইব। যে যে নিয়মানুসারে মানব-ধর্ম বর্দ্ধিত ও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং যেক্রমে সকল ধর্মেই ঈশ্বর কল্পিত হয়, তাহার আবিষ্করণে চেষ্টা পাইব। সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া একটা সুসম্পন্ন ভাষা চলিতে পারে কি না, এই প্রশ্নের মীমাংসা করা যেমন দুক্লহ, আর সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে একটা সুসম্পন্ন ধর্ম চলিতে পারে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরদানও তেমনি দুক্লহ। অতি অসম্পূর্ণ ভাষার ন্যায় অতি অসম্পন্ন ধর্মেও যে, ধারণাতীত কোন সূক্ষ্ম অদ্ভুত পদার্থ আছে, এখন কেবল এইটুকু মাত্র জানিতে পারিলেই আমরা নানা প্রকার পদার্থবিদ্যার বহুল জ্ঞান লাভ অপেক্ষাও আমাদের জ্ঞানের অগম্য থাকিবে।

এই রূপ প্রাচীন কথা আছে যে, কোন বিষয় জানিতে হইলে উহার মূল নিরূপণ করা অবশ্য কর্তব্য। আমরা ধর্মসম্বন্ধে অনেক জানিতে পারি, অনেক ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতে পারি। কিন্তু যে গূঢ় মূল হইতে ধর্মের আবির্ভাব হইয়াছে, যত দিন তাহা নিরূপণ করিতে না পারিব, ততদিন ধর্ম যে কি, তাহা আমাদের জ্ঞানের অগম্য থাকিবে।

ধর্মের প্রকৃত মূল অবধারণ করিতে হইলে দর্শনশাস্ত্রজ্ঞেয়া যাহা যাহা স্বীকার করিয়াছেন, তন্মিত্র আর কিছুই স্বীকার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহারা ধর্মসম্বন্ধে যে যে শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, এই প্রবন্ধের আদ্যোপান্ত সকল স্থানেই সেই সেই শব্দ ব্যবহার করাই আমরা অভিপ্রেত। তাঁহাদের মতে সকল প্রকার জ্ঞানই দুইটা মাত্র দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে সক্ষম বলিয়া, অবধারিত হইয়াছে। উহার একটীর নাম ইন্দ্রিয়দ্বার, অপরটীর নাম যুক্তিদ্বার। ধর্মজ্ঞান সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, অবশ্যই ঐ দুই দ্বার দিয়া আসিবার সম্ভাবনা। আমরা এখন এই দুই দ্বার-দেশেই অবস্থান করিব। এই দুইটা ভিন্ন, আদিম প্রকটীকরণ ও ধর্ম-সংস্কার প্রভৃতি দ্বার

দিয়া যে ধর্ম-জ্ঞান প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাগ আপাততঃ চিন্তার প্রতিকূল বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে, এবং সর্ব প্রথমে ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া না আসিয়া যে জ্ঞান একবারেই যুক্তি দ্বারা দিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহাও ত্যাগ করা যাইবে, অথবা উহা প্রথম দ্বার-পথে প্রবেশ করিতে আদিষ্ট হইবে।

আমি উল্লিখিত কয়েকটি নিয়ম স্থির করিয়া যে সকল ভাব ধর্মচিন্তার প্রধান উপাদান স্বরূপ, তাহাদের ইন্দ্রিয়গত ও পদার্থগত প্রারম্ভ নিরূপণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

সর্ব প্রথমেই এইটি প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে, যে, যে অনন্তের ধারণা সকল ধর্মের মূলে লক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা একবারে যুক্তি দ্বারা উদ্ভূত না হইয়া, ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা উহার আদিম আকারে পরিস্ফুট হইয়াছে। অনন্তের ধারণা যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থলাপেক্ষ না হইত, তাহা হইলে উপরোক্ত নিয়ম অনুসারে আমাদেরকে উহা কাজে কাজেই পরিত্যাগ করিতে হইত। এস্থলে হামিল্টন সাহেবের ন্যায় অনন্তের ধারণা ন্যায়শাস্ত্রের সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় বলিলেই যথেষ্ট হইবে না। স্থান ও সময়ের সীমা কল্পনা করিতে হইলে সেই সীমাভীত স্থান ও সময়ের কল্পনা করিতে হয়, এই সকল মত যে সত্য, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আমাদের প্রতিপক্ষগণকে যে, ঐ ঐ যুক্তি স্বীকার করিতেই হইবে, এমন বলিতে পারা যায় না।

এই জন্য আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি যে, সীমাবদ্ধ পদার্থ মাত্রেরই কি বহির্ভাগে, কি পশ্চাতে, কি অধোদেশে, কি অভ্যন্তরভাগে সর্বত্রই অসীম বা অনন্ত আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রহিয়াছে। উহা আমাদের চারি দিকেই ব্যাপ্ত রহিয়াছে। আমরা যে সমস্ত ও স্থানেকে সীমাবদ্ধ মনে করিয়া থাকি, তাহা কেবল অসীমের উপর একটি আবরণ নিক্ষেপ মাত্র। সীমাবদ্ধের কল্পনা ব্যতিরেকে যেমন অসীমের ধারণা অসম্ভব, সেইরূপ অসীমের কল্পনা ব্যতিরেকে সীমাবদ্ধের কল্পনা একবারেই অসম্ভব। জ্ঞান যেমন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সীমাবদ্ধ পদার্থের তত্ত্বানুসন্ধান ব্যাপ্ত, বিশ্বাসও সেইরূপ সীমাবদ্ধের অধঃস্থিত অসীমের অনুসন্ধান ব্যাপ্ত। আমরা যাহাদিগকে ইন্দ্রিয়, যুক্তি ও বিশ্বাস বলি, তাহারা সকলই এক আশ্রয়

তিনটি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য মাত্র। ফলতঃ আমাদের ন্যায় জীবগণের পক্ষে ইন্দ্রিয়ব্যতিরেকে যুক্তি ও বিশ্বাস উভয়ই অসম্ভব।

আমরা এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্মের ইতিহাসসম্বন্ধে যতদূর নির্ণয় করিতে পারিয়াছি, তাহাতে এই পর্য্যন্ত জানা যাইতেছে যে, উহা কেবল সীমাবদ্ধের আবরণের পশ্চাৎস্থিত অনন্তের বিবিধ নাম-কল্পনা চেষ্টার ইতিহাস মাত্র। আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি যে, ভারতবর্ষের প্রাচীন আৰ্য্যগণ ও বৈদিক কবিগণ ক্রমে সর্ব প্রথম বৃক্ষ, পর্বত, নদী, উষা ও সূর্য্য এবং অগ্নি, বায়ু ও বজ্র প্রভৃতি নৈসর্গিক পদার্থে অদৃশ্য, অবিদিত ও অনন্ত অবলোকন করিয়াছিলেন, তাঁহারা কি রূপে ঐ সকল নৈসর্গিক পদার্থে আত্মা, মূল পদার্থ বা ঐশ্বরিক আশ্রয় কল্পনা করিয়াছেন এবং ঐ রূপ করিতে করিতে কি রূপেই বা তাঁহারা দৃশ্যের পশ্চাদ্বর্তী অদৃশ্য অবলোকন করিতে অসমর্থ হইয়া অদৃশ্যের, স্বাভাবিক পদার্থের পশ্চাতে স্বভাবাতীত পদার্থের, এবং সীমাবদ্ধের বাহ্যে বা অভ্যন্তরে অসীমের অনুভব মাত্র করিয়াছেন, তাহাও দেখান গিয়াছে। তাঁহারা ঐ অনন্তের যে নাম দিয়াছিলেন, তাহা লম্বাঘৃক হইতে পারে, কিন্তু ঐ নামের অনুসন্ধান অর্থোক্তিক নহে। এই অনুসন্ধান-বলেই প্রাচীন আৰ্য্যগণ অপরাপর সভ্য জাতির ন্যায়, স্বর্গস্থ পরম পিতার অস্তিত্ব নিরূপণে সক্ষম হইয়াছেন।)

তাঁহারা কেবল এই পর্য্যন্ত করিয়াই স্থির হন নাই। ঈশ্বর যে পিতা নহেন, সর্ব প্রথমে এই ধারণা, তৎপরে পিতার ন্যায় এই রূপ ধারণা, এবং সর্বশেষে পিতাই এই রূপ ধারণা বেদের অতি প্রাচীন সময়ে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঋগ্বেদের প্রথমে অগ্নির উদ্দেশে যে স্তোত্র সম্বোধিত হইয়াছে, তাহার অর্থ “পুত্রের উপর পিতার ন্যায় আমাদের উপর সদয় হও।” উপর্যুপরি ঐ ভাব বেদের অনেক স্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা—ঋগ্বেদ ১ম, ১০৪, ৯, “হে ইন্দ্র! পিতার ন্যায় আমাদের কথায় কর্ণপাত কর।” ঋগ্বেদ ৩য়, ৪৯, ৩ শ্লোকে “ইন্দ্র আমাদের আহার দেন, আমাদের কথায় কর্ণপাত করেন, এবং পিতার ন্যায় আমাদের প্রতি প্রসন্ন হন” কবি এই রূপ লিখিয়াছেন। ৭ম, ৫৪, ২ তে পুত্রের প্রতি পিতার ন্যায় ইন্দ্র সদয় হইবার জন্য ষাচিত হইয়াছেন। ঋগ্বেদ ৭ম, ২১, ১৪তে আবার এই ভাব দেখা যায়:

“আপনি যখন বজ্রপাত করেন, এবং মেঘমালা একত্র করেন, তখন আপনি পিতার ন্যায় উক্ত হন।” ঋগ্বেদ ১০ম, ৮৩, ৬, “মুষিক যেমন তাহার লাঙ্গল গ্রাস করে, হে সৰ্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর ! আপনার এই উপাসককেও বিষাদ ও পরিতাপ সেই রূপ গ্রাস করিতেছে। হে প্রভাবশালী ইন্দ্র ! একবার আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও, আমাদের প্রতি পিতার ন্যায় আচরণ কর।” ঋগ্বেদ ১০ম, ৬৯, ১০, “পিতা যেমন পুত্রকে ক্রোড়ে বহন করেন, আপনিও তাহাকে সেই রূপ বহন করিতেছেন।” ঋগ্বেদ ৩য়, ৫৩, ২, “পুত্র যেমন বস্ত্রাগ্র ধরিয়া পিতার সমীপে অগ্রসর হয়, তদ্রূপ আমিও এই সুমধুর গীতি উপহার লইয়া আপনার সমীপে উপস্থিত হইতেছি।” বস্তুতঃ জগতের প্রায় এমন কোন জাতিই নাই, যাহারা তাহাদের দেবতা বা দেবতাগণের উদ্দেশে পিতৃশব্দ প্রয়োগ না করিয়াছে।

প্রাচীন আৰ্য্যগণ তাঁহাদের ধৰ্ম্মগত বিশ্বাসের আদিম অবস্থায় ঈশ্বরকে পিতৃসম্বোধন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা শীঘ্রই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ঐ শব্দ মানব-সমাজে ব্যবহৃত হওয়ায় উহার অর্থ-গৌরব অবশ্যই অতিপ্রেত অর্থোপক্ষা কম হইবে। যেমন কোন শিশুকে মৃত্যুর পর সে গৃহ হইতে গৃহান্তবে ও এক পিতা হইতে অন্য পিতার ক্রোড়ে যাইবে, এই রূপ বিশ্বাস করিতে দেখিয়া, আমরা তাহার অবস্থায় ঈর্ষান্বিত হই, তদ্রূপ আমরা আমাদের প্রাচীন পিতৃপুরুষগণকে হিংসা করিয়া থাকি। কিন্তু বালকেরা যেমন বয়োবৃদ্ধির সহিত শিথিল হইতে থাকে যে, তাহার পিতাও বালক ও অন্য কোন পিতার সন্তান এবং বালকেরা যেমন মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া পিতৃশব্দের অর্থ হইতে অর্থান্তর গ্রহণ করিতে শিক্ষা করে, প্রাচীনেরাও সেই রূপ করিয়াছিলেন। আমরা অদ্যাপি যদি ঐ শব্দ ঈশ্বরোদ্দেশে প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করি, তবে আমরাও ঐ পিতৃশব্দের এক বিশেষক হইতে অন্য বিশেষক, কার্য্যতঃ এক এক করিয়া সনস্ত বোধগম্য বিশেষক গ্রহণ করিতে শিক্ষা করিব। মনুষ্যের পক্ষে ঐ শব্দ প্রযুক্ত হইলে ঈশ্বরোদ্দেশে অপ্রযোজ্য, এবং ঈশ্বরের প্রযোজ্য হইলে মনুষ্যে অপ্রযোজ্য হইয়া উঠে। “জগতে কাহাকেও পিতৃ-সম্বোধন করিও না, কারণ তোমার পিতা যিনি, তিনি স্বর্গে অধিষ্ঠান

করিয়াছেন,” মথি, ২৩শ, ৯। অপহুতি হইতে তুলনা আরম্ভ হইয়া থাকে, এবং উহা এই অপহুতিতেই পরিসমাপ্ত হয়। মনুষ্য সর্বত্র অনন্তের আবির্ভাব মনে করিয়া তাহার প্রতি অগ্নি, ঝড়, বায়ু, স্বর্গ বা প্রভু প্রভৃতি যে সকল নাম আরোপ করিয়াছেন, পিতৃশব্দ যে, তন্মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ পিতৃশব্দও সামান্য মনুষ্য-বাচক শব্দ মাত্র। বৈদিক কবিগণ উহা সর্বোৎকৃষ্ট মনে করিয়া ব্যবহার করিলেও উহার অভিপ্রেত ও প্রকৃত অর্থগৌরবের বিভিন্নতা, পূর্বপশ্চিমের বিভিন্নতার ন্যায় অত্যন্ত অধিক।

প্রাচীন আর্যগণ কি রূপে প্রকৃতির সর্বদেশে অনন্তের অব্বেষণ করিয়া বেড়াইয়াছেন এবং তাঁহারা কি ভাবে কোন্ দ্রব্যের নামকল্পনা করিয়াছেন, কি রূপেই বা বৃক্ষ, নদী, পর্বত প্রভৃতি নাম প্রকৃতির নানা দ্রব্যে আরোপিত হইয়া অবশেষে “স্বর্গীয় পিতা” নামে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাহা বিবৃত করিয়াছি। তাঁহাদের কল্পনার ও ধারণার বিরাম নাই। আরও কতকগুলি ধারণার উৎপত্তির কারণ এখন আলোচ্য। আপাততঃ ঐ সমুদায় ধারণা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু উহার মূলদেশ যে, সীমাবদ্ধ এবং উহা যে প্রকৃতি-নহিত, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। আজি কালি আমরা অকারণে নৈসর্গিক জগতের অনুসন্ধান উপেক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছি। কিন্তু এই পথই সর্বত্র ও সর্ব কালেই অন্ত হইতে অনন্ত প্রাকৃতিক হইতে অপ্রাকৃতিকে এবং প্রকৃতি হইতে প্রকৃতির ঈশ্বরে উপনীত হইবার প্রশস্ত পথ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

### বেদোক্ত দেব-বংশ।

এই বিচিত্র জগতের কোন্ কোন্ পদার্থ আমাদের পিতৃপুরুষগণকে স্তম্ভিত, বিস্ময়াবিষ্ট ও আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাহা অবধারণ করিতে আমরা চেষ্টা পাইয়াছি। কিরূপেই বা তাঁহারা অবিস্মিত ভাবে ও এক দৃষ্টে উহাদের দিকে কেবল না চাহিয়া প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়েরও আলোচনা করা গিয়াছে, এবং যে বেদে অতি প্রাচীন ধর্মোৎপত্তির কল্পনা সমূহ সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহা হইতেও আমাদের উদ্দেশ্য নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাওয়া গিয়াছে। মনুষ্য-হৃদয়ে চিন্তাবিকাশের প্রথম দিন

আর অতি পরিমার্জিত ভাষায় সৃষ্টিত ছন্দে সর্ব প্রথমে প্রশংসা-স্তোত্র লিখনের দিন, এই উভয়ের মধ্যে যে শত শত সহস্র সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ কি। তথাপি, মানব-চিন্তার এমনই ক্রম-বিধান যে, মানব-ভাষা দ্বারা একবার সংযত হইয়া বৈদিক স্তোত্রগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিলে আশাতিরিক্ত ফল লাভ করিতে পারা যায়। (আমরা যে সকল পদার্থ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলেও অতীন্দ্রিয়, চিন্তামুগ্ধকর এবং বিস্ময়-সূচক বলিয়া স্থির করিয়াছি, তৎসমুদয়ই বেদের মতে প্রাচীন আর্য্যগণের অনন্ত দর্শনের গবাক্ষস্বরূপ হইয়াছিল।)

### অনন্ত শব্দের আদিম ধারণা।

অসীমরূপে অনন্ত ক্ষুদ্র ও অসীমরূপে অনন্ত বৃহৎ, এই দুই স্থলে অসীম শব্দটী যেমন পরিমাণ-অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে, সর্বত্র কেবল তেমন অর্থ বোধ হইবে না। যদিও অনন্ত শব্দের সাধারণতঃ এইরূপ ধারণাই সম্ভব, তথাপি উহা অতি সামান্য ও শূন্যগর্ভ বলিয়া বোধ হয়। প্রাচীন আর্য্যগণ অসীমের অবস্থাভেদের সঙ্গে সঙ্গে সীমাবদ্ধ পদার্থমাত্রের অবস্থার কল্পনা করিতেন, অর্থাৎ তাহাদের কাছে অসীম পদার্থ সীমাবদ্ধের পশ্চাৎভূমি বা পূরক বলিয়া বোধ হইত। মনুষ্যের বুদ্ধিতে এক দিকে দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, স্পৃশ্য বা সীমাবদ্ধের ভাগ যত অধিক হইত, অপর দিকে অদৃশ্য, অশ্রোতব্য, অস্পৃশ্য বা অনন্তের ভাগ তত কম হইত। ইন্দ্রিয়গণের গ্রাহকতাশক্তির নানাধিক্যের সহিত উহাদের অগ্রাহ্য বিষয়ের সম্বন্ধে সংশয়ের প্রভেদ হইত।

পর্বত ও নদীর অনুভূতি উষা ও ঝটিকার অনুভূতি অপেক্ষা অতি সহজে সিদ্ধ। প্রতিদিন প্রভাতে উষা আগমন করিয়া থাকে, কিন্তু ইহা কি এবং কোথা হইতেই বা আইসে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। বায়ু স্বেচ্ছাচারে প্রবাহিত হইয়া থাকে, তুমি উহার শব্দ শুনিতে পাও, কিন্তু উহা কোথা হইতে আইসে এবং কোথায়ই বা যায়, তাহা তুমি বলিতে পার না। নদীর প্লাবন ও পর্বত পতন দ্বারা যে অনিষ্ট ঘটিতে পারে, তাহা ধারণা করা সহজ, কিন্তু ঝটিকার আগমনে



কিরূপে বৃক্ষ শাখা অবনত ও ভগ্ন হইতে থাকে এবং প্রবল অন্ধকারময় ঝঙ্কাবাতের সময় কোন্ 'অদৃশ্য' শক্তির বলে পর্কত, কুটীর, অট্টালিকা প্রভৃতি পাতিত হয়, তাহা বুঝিয়া উঠা আখ্যা ঋষিগণের পক্ষে তত সহজ হইয়া উঠিত না।

এইজন্য অর্দ্ধ দেবতা কিয়ৎপরিমাণে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হওয়ায় অপরাপর দেবতা-গণের ন্যায় উহাদের চরিত্র কল্পিত হইতে দেখা যায় না। ঐ সকল দেবতাদের মধ্যে আবার যাহারা একবারে অদৃশ্য, এবং যাহাদের প্রতিনিধি হইতে পারে, প্রকৃতিতে এমন কিছুই ছিল না—যথা ইন্দ্র, রুদ্র, মরুৎ, সর্ষ্যব্যাপী বরুণ, তাহারা উজ্জল আকাশ, উষা ও সূর্য্য প্রভৃতি অপেক্ষা শীঘ্রই পৌরানিক আকার ধারণ করিয়াছে। যে সকল পদার্থ দেখিয়া ঐ সকলের অনন্ত ও স্বভাবাতীত প্রকৃতি কল্পিত হইয়াছে, তাহারা সামান্য মানবাকারে পরিণত হইবে। ইহারা অনন্ত বলিয়া অভিহিত না হইয়া বরং অজেষ্ম, অক্ষয়, অবিনশ্বর, অযোনিজ, সর্ষ্যব্যাপী, সর্ষ্যজ, সর্ষ্যক্ষম প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হইবে, এবং ক্রমে এইরূপে যে, ইহারা অনন্তের ন্যায় কোন গূঢ় শব্দে অভিহিত হইবে, তাহাও আশা করা যাইতে পারে।

এরূপ আশা করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা বড় নিরাপদ নহে। আমার বিবেচনায় এতদ্বিষয়ক যে সকল বিবরণ প্রমাণ-সহ পাওয়া যায়, তাহার ভাব গ্রহণ ও তাহার মর্ম্মাবধাবণ করিবার প্রয়াস পাওয়াই শ্রেয়ঃ।

### অদিতি বা অনন্ত।

বেদে অসীম ও অনন্ত নামে একটা দেবতার উল্লেখ দেখিতে পাইয়া আমি প্রথমে অতি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলাম। সংস্কৃতে উহা কেবল অদিতি নামে পরিচিত।

(অদিতি 'দিতি' এবং অস্বীকার সূচক 'ন' শব্দ হইতে নিষ্পন্ন। দিতি শব্দ দা (দ্যতি) বন্ধন, ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; উহা হইতে আবার দিত বন্ধ, এবং বিশেষ্য দিতি বন্ধন, নিষ্পন্ন হইয়াছে। অতএব অ'দৌ অদিতি শব্দে, বন্ধন-শূন্য, শূন্যল মুক্ত, অসীম, অনন্ত প্রভৃতি অর্থ ছিল। গ্রীকেও ঐ ধাতুর ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

অদিতি—অনন্ত নামে যে দেবতা দেখা যায়, তাহা যে দীর্ঘকাল পরে কলিত বা উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা বলিতে আর কোন কষ্ট-কল্পনার প্রয়োজন নাই। ইহা কি? এ বিষয় জানা অপেক্ষা বরং যাহা বিদ্যমান আছে, তাহা অবধাবণ করিতে যত্নবান হওয়া সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। অনন্তের অমুভূতি আধুনিক বলিয়া বোধ হওয়াতে অনেকানেক সুশিক্ষিত বেদ-বিশারদ অদিতিকে আধুনিক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে অদিতির সন্তানগণ প্রসিদ্ধ আদিত্য বা সৌর দেবতার প্রসঙ্গে ‘অদিতি’ শব্দের উদ্ভব হইয়াছে। অদিতির উদ্দেশে একেবারেই কোন স্তোত্র না দেখিয়া তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, অদিতি দেবী অবশ্যই বৈদিক কবিতার শেষ সময়ে কলিত হইয়া থাকিবে।

দ্যৌস শব্দেব সম্বন্ধেও এই রূপ বলা যাইতে পারে। এই শব্দের গ্রীক প্রতিশব্দ জিউস। বেদে যে সকল দেবতার উদ্দেশে সুদীর্ঘ সুদীর্ঘ স্তোত্র আছে, তাহাদের মধ্যে অদিতির উল্লেখ অপেক্ষা বরং দ্যৌস শব্দের উল্লেখ কম দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উহার কল্পনা আধুনিক হওয়া দূবে থাকুক, আমরা এতদূর পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ভারতে একটী মাত্র সংস্কৃত কথা ও গ্রীসে একটী মাত্র গ্রীক কথা উচ্চারিত হইবার পূর্বেও ঐ দেবতা বিদ্যমান ছিল। বাস্তবিক উহা একটী অতি প্রাচীন আৰ্য্য দেবতা রূপে পরিচিত, পরে উহাই ইন্দ্র রুদ্র, অগ্নি প্রভৃতি ভারতীয় দেবতাগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া উঠিয়াছে।)

### অদিতি আধুনিক দেবতা নহে।

অদিতির সম্বন্ধেও ঠিক ঐ রূপ বলা যাইতে পারে। দ্যৌস পৃথিবী, সিন্ধু এবং অন্যান্য প্রাচীন দেবতাগণের সহিত অদিতির নামও স্তোত্রমধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে। অদিতি কেবল আদিত্যগণের মাতৃরূপে কলিত না হইয়া সর্ব-দেব মাতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।)

যাহা হউক এই বিষয় সম্যক বুঝিতে হইলে আমরা অবশ্যই অদিতির জন্ম-স্থান ও উৎপত্তি নির্ণয় করিতে সচেষ্ট হইব। কিরূপে অসীম ও অনন্ত অদিতি



নামে উদ্ভূত বা কল্পিত হইল এবং প্রকৃতিতেই বা উহার কোন দর্শনীয় বিষয় বিরাজিত ছিল যে, তাহাতেই উহা অদिति নামে অভিহিত হইয়াছে।

### অদিতির স্বাভাবিক উৎপত্তি।

অদिति (অসীম) শব্দ যে উষার একটি অতি প্রাচীন নাম, তাহার আর সংশয় নাই। (আকাশের যে ভাগ হইতে প্রতিদিন প্রভাতে জগজ্জীবন ও জগৎপ্রভাকর প্রভা বিকাশ করিতেন, সেই ভাগই এই অদिति নামে উদ্ভূত হইয়া থাকিবে।)

উষার প্রতি একবার নেত্রপাত কর, এবং ক্ষণেকের জন্য জ্যোতিষের কথা বিস্মৃত হও, যখন রাত্রির অন্ধকারময় আবরণ ক্রমে ক্রমে অপসৃত হইতে থাকে, বায়ু স্বচ্ছ ও জীবন্তভাবে ধারণ করিতে থাকে এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব কোন অবিদিত স্থান হইতে আলোকের সঞ্চার হইতে থাকে, তখন যথাসাধ্য নয়ন বিস্তার করিয়া অনন্ত পর্য্যন্ত অবলোকন করিতেছিলে, মনে এই রূপ বোধ হয় কি না? প্রাচীন ঋষিগণ মনে করিতেন, উষা অপর জগতের স্বর্ণময় দ্বাবোন্মোচন করিতেছেন। সূর্য্যকে এই দ্বারদেশ দিয়া আড়ম্বরে গমনাগমন করিতে দেখিয়া, তাঁহারা এই সীমাবদ্ধ জগতের সীমা অতিক্রম করিয়া পরজগতে প্রবেশ করিতে বাণকের ন্যায় চঞ্চল বা চপল হইয়া উঠিতেন। তাঁহারা উষাকে আসিতে ও যাইতে দেখিতেন, কিন্তু তৎপশ্চাতে যে উচ্ছ্বসিত অগ্নি বা আলোকসমুদ্র রহিয়া যাইত, তাহাকে কি দর্শনযোগ্য অনন্ত বলা যাইতে পারে না? বৈদিক কবিগণ উহাকে যে অদिति, অসীম প্রভৃতি নাম দিয়াছেন, তদপেক্ষা আর কি সুন্দর নাম হইতে পারে?

আমার বোধ হয়, যে দেবতা সর্ব্বপ্রথমে এত সূক্ষ্ম বলিয়া বোধ হইত যে, আমরা প্রকৃতির মধ্যে কোথাও উহার জন্মস্থান নাই বলিয়া মনে করিতাম, এবং এত আধুনিক মনে হইত যে, আমরা বেদে উহার নামোন্লেখ মাত্র আছে, এমন বিশ্বাস করিতে পারিতাম না, এক্ষণে সেই দেবতাই হিন্দুগণের হৃদয়ে প্রথম সৃষ্টি ও সহজ সংস্কার স্বরূপ হইয়া থাকিবে (১)। সুদীর্ঘকাল পরে এই

(১) ঋগ্বেদ সংহিতার অনুবাদে আমি অদিতির বিষয় বিস্তারিতরূপে লিখিয়াছি (Vol. I. pp. 230-251.)। ডাক্তার আলফ্রেড হিলেব্রান্ড সাহেবের এ বিষয়ে একটি উৎকৃষ্ট

অসীম অদিতির, আকাশ ও পৃথিবীর সহিত একীভূত কল্পিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু অতি পূর্বে আকাশ ও পৃথিবীর সহিত উহার অতি দূরতর সম্বন্ধ ছিল।)

দিবা রাত্রির প্রতিনিধি স্বরূপ মিত্র ও বরুণের উদ্দেশে যে স্তোত্র সম্বোধিত হইয়াছে, তাহাতে আমরা এইরূপ দেখিয়া থাকি, (১) “হে মিত্র ও বরুণ! আপনারা উষাসমাগমে রথারোহণ করেন, এই রথ উষার আবির্ভাবে সূবর্ণ বর্ণে রঞ্জিত হয় এবং সূর্য্য অস্তমিত হইলে উহার কেন্দ্র আলোকময় হইয়া উঠে (২)। আপনারা উহা হইতে অদिति ও দিতিকে অর্থাৎ ইহ জগৎ ও জগতাতীত, সীমাবদ্ধ ও অসীম এবং নশ্বর ও অবিনশ্বর অবলোকন করিয়া থাকেন” (৩)।

অপর কোন কবি অদিতিকে উষার মুখ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন (৪); এই রূপে (অদिति স্বয়ং উষা বলিয়া উক্ত না হইয়া উষাতীত অন্য কোন পদার্থ বলিয়া সূচিত হইয়াছে।)

মৌব দেবগণের প্রাচী হইতে উত্থান দেখিয়া আমরা অনায়াসে বলিতে বা বুদ্ধিতে পাবি যে, কি জন্য অদिति উজ্জল দেবগণের বিশেষতঃ মিত্র ও বরুণের (ঋগ্বেদ, ১০ম, ৩৬, ৩), অর্য্যমার ও ভগের এবং অতঃপর সপ্ত বা অষ্ট আদিত্যের অর্থাৎ প্রাচী হইতে উদীয়মান মৌব দেবতাদের মাতা বলিয়া কথিত হইয়াছেন। বেদে সূর্য্য আদিত্য (ঋগ্বেদ ৮ম, ১০১, ১১ বৎ মহান্ অসি সূর্য্যঃ বৎ আদিত্য মহান্ অসি; সূর্য্য! তুমি যথার্থই মহান্, আদিত্য তুমি যথার্থই মহান্।) ও আদিত্যের, উভয় নামেই কথিত হইয়াছে (ঋগ্বেদ ১০ম, ৮৮, ১১)।

প্রদত্ত আছে। তাহার মতে অদिति দা (বন্ধন) ধাতু হইতে নিপ্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু তিনি অদিতির অর্থ অবিনশ্বরত্ব নির্দেশ করিয়াছেন। অদिति সর্ব্বগত অর্থ-দ্যোতক নয়।

(১) ঋগ্বেদ ৫ম, ৬২, ৮।

(২) প্রাতঃকালের আলোক এবং সন্ধ্যালোকে বিস্তৃত সূবর্ণের ও লৌহের বর্ণের বিভিন্নতার ন্যায় বক্তৃতা হইয়াছে।

(৩) ঋগ্বেদ ১ম, ৩৫, ২।

(৪) ঐ ১ম, ১১৩, ১৮।

(পুত্রগণের নামোল্লেখ হইতেই প্রথমাবধি অদিতির স্ত্রী-চরিত্র বা স্ত্রীত্ব কল্পিত হইয়াছে। অদिति প্রভাবশালী, ভয়ানক রাজসন্তানগণের প্রসূতি বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। কিন্তু অনেক স্থলে অদিতিকে পুরুষ দেবতা বা লিঙ্গবিহীন বলিয়া কল্পিত হইতে দেখা যায়।

উষায় সহিত অদিতির নিকট সম্বন্ধ থাকিলেও উহাকে কেবল প্রাতে নয়, মধ্যাহ্নে, এবং সায়াহ্নেও উপাসিত হইতে দেখা যায়। (১))

অথর্ষবেদে (অথর্ষবেদ ১০ম, ৮, ১৬) লেখা আছে “যেখান হইতে সূর্য্য উদিত হন এবং যথায় তিনি অন্তর্মিত হন, আমার বোধ হয়, তাহাই সর্ষ প্রাচীন এবং উহা অতিক্রম করিয়া কেহই অধিক দূর যাইতে পারে না”। প্রাচীন শব্দের ভাষান্তর কালে অদिति শব্দ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। (অদिति যে কেবল তিমিরনাশিনী এবং শক্রনিহন্ত্রী বলিয়া পূজিত হন, তাহা নহে, তিনি মানবের পাপ-তাপ-হারিণী বলিয়াও স্তুত ও পূজিত হইয়া থাকেন।)

### অন্ধকার ও পাপ।

অন্ধকার ও পাপ এই দুইটী ধারণা অপাততঃ আমাদের নিকট অতি বিভিন্ন বলিয়া বোধ হইলেও প্রাচীন আর্য্যগণের মনে উহাদের অতি নিকট সম্বন্ধ বোধ হইত। শত্রু-ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে কিরূপে পাপ-ভয় অর্থাৎ অতি ভয়ানক শত্রু আসিয়া উপস্থিত হইত, তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য নিম্নে কয়েকটী স্থান উদ্ধৃত করা যাইতেছে!—“হে আদিত্যগণ! আমাদেরকে হস্ত-পদ-বদ্ধ তক্ষরের ন্যায় শাদ্দীল-কবল হইতে রক্ষা কর (২)। “অদिति, দিবা ভাগে আমাদের পশুগণকে রক্ষা করেন। যে অদिति কখন প্রভাবণা করেন না, তিনি যেন আমাদেরকে রাত্রি কালে রক্ষা করেন। তিনি যেন উন্নতির সহিত আমাদের উন্নতি হইতে নিস্তার করেন (৩)।

(১) ঋগ্বেদ ৫ম, ৬৯, ৩।

✓ (২) ঐ ৮ম, ৬৭, ১৪।

✓ (৩) ঐ ৮ম, ১৮, ৬৭।

( অংহসঃ শব্দগত ও অর্থানুসারে উদ্বেগ হইতে, পাপের প্রণীড়ন হইতে )  
 “হে জ্ঞানস্বরূপা অদिति ! দিবাভাগে আমাদিগকে সহায়তা কর। অদिति  
 যেন সদয় হইয়া আমাদের সুখোৎপাদন করেন এবং আমাদের শত্রুগণকে  
 দূরীকৃত করেন।”

পুনশ্চ যথা (১);—হে অদिति ! মিত্র ও বরুণ ! যদি আপনাদের প্রতিকূলে  
 কোন পাপাচার করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদিগকে ক্ষমা করুন। আমি  
 যেন ভয়-নিবারক সুবিস্তীর্ণ আলোক লাভ করিতে পারি। হে ইন্দ্র ! সুদীর্ঘ ও  
 প্রগাঢ় তমোরাশি যেন আমাদিগকে অভিভূত না করে। ‘অদिति যেন  
 আমাদিগকে নিষ্পাপত্ব প্রদান করেন’ (২)।

অদिति শব্দের ধারণা হইতে স্বভাবতঃই আর একটি ধারণার উদ্ভব হইতে  
 থাকে। যেখানেই যাই না কেন, সূর্য্য ও অন্যান্য স্বর্গীয় পদার্থের  
 দৈনিক গমনাগমন হইতে ভবিষ্যৎ জীবনের করনা উদ্ভূত হইতে দেখা  
 যায় (৩)। “তাহার সূর্য্য অস্ত গিয়াছে” আমরা অদ্যাপি এইরূপ বলিয়া  
 থাকি। তাহার মনে করিতেন যে, প্রাতঃকালে সূর্য্যের জন্ম হয় ও সন্ধ্যাকালে  
 তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে, অথবা এক বর্ষমাত্র সংক্ষিপ্ত জীবন তাহার সুদীর্ঘ  
 জীবন বলিয়া কল্পিত হইত। বর্ষান্তে সূর্য্যের মৃত্যু হইত; আমরাও অদ্যাপি  
 এইরূপ বলিয়া থাকি যে, বর্ষের মৃত্যু হইল।

### অমরত্ব।

এই ধারণার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ধারণার আবির্ভাব হইয়া থাকে।  
 প্রাচ্য দেশ হইতে আলোক ও জীবনের আগমন দৃষ্টে অনেক প্রাচীনজাতির  
 মধ্যে এরূপ বিশ্বাস হইয়াছিল যে, পূর্ব্বদিক উজ্জল দেবগণের আবাস-  
 স্থান ও অমরগণের অনন্ত গৃহ। পুণ্যাত্মারা ইহ জগৎ পরিত্যাগ করিয়া  
 দেবগণের সহবাসসুখাধিকারী হন, একবার এইরূপ ধারণা জন্মিলে,  
 পুণ্যাত্মাদের ঐ পূর্ব্বদিকে নীত বা স্থানান্তরিত হওয়াও স্বর্গবাস বলিয়া  
 কল্পিত হইতে পারে।

✓ (১) ঋগ্বেদ. ২য়, ২৭, ১৪।

✓ (২) ঐ ১ম, ১৬২, ২২।

(৩) H. Spencer, Sociology, I. p. 221.

এইরূপ তাৎপর্য্যে আমরা অদিতিকে “অমর গণের জন্মভূমি” বলিয়া উক্ত হইতে দেখি, এবং এইরূপ তাৎপর্য্যে কোন বৈদিক কবি গাইয়াছেন, (১) “কে আমাদেরকে মহৎ অদিতির হস্তে প্রত্যর্পণ করিবে যে, আমি পিতা মাতাকে দেখিতে পাইব?” ইহাকে অমরত্বের অতি সহজ, স্বাভাবিক ও সুন্দর একটি কল্পনা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? ফলতঃ কল্পনার নিদান আমাদের দৈনিক জীবনের ঘটনাবলি ও মনুষ্য-হৃদয়ের স্বাভাবিক জ্ঞান-বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে।)

বেদ হইতে এই অত্যাশ্চর্য্য বিষয়টী আমরা শিক্ষা করিতে পারি। চিন্তা, এমন কি অতি সূক্ষ্ম চিন্তানিচয়ও আমাদের দৈনিক ব্যাপার সমূহ হইতে স্বভাবতঃ উদ্ভূত হইয়া থাকে। মানব, প্রকৃতির এই স্বরে অন্যান্যমনস্ক থাকিতে পারে, কিন্তু যত দিন ঐ স্বর শ্রুত না হইবে, ততদিন কি দিন, কি রজনী উহার বিরাম বা বিশ্রাম হইবে না। একবার শ্রুত হইলে ঐ স্বরের অভিপ্রায় ক্রমেই স্পষ্ট উপলব্ধ হইতে থাকে, এবং সর্ব প্রথমে যাহা সূর্য্যোদয় বলিয়া বোধ হয়, পরিশেষে তাহা অনন্তের প্রত্যক্ষ উন্মেষ বলিয়া প্রতীতি জন্মে। পক্ষান্তরে সূর্য্যাস্ত অমরত্বের প্রথম দৃশ্যাকারে পর্য্যবসিত হয়।

### বেদে অপরাপর ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ভাব বা ধারণা।

এক্ষণে আব কয়েকটী ধারণার পর্যালোচনা করা যাইতেছে। এই সমস্ত ধারণা সর্ব প্রথমে আমাদের নিকট অতি সূক্ষ্ম ও কৃত্রিম বলিয়া বোধ হইলেও উহাদিগকে মানব-চিন্তার কোন প্রাচীন স্তরে আরোপ করা আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে। কিন্তু পরে ইহা বেদ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক্ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মানব-হৃদয়ে উচ্চ ধারণার উদ্ভব হইয়াছে। বেদ যত প্রাচীন, তদপেক্ষা অধিক প্রাচীন বলা আমার অভিপ্রেত নহে। আমি উহার গূঢ় অভিপ্রায়, উৎপত্তি ও

বিষয় উত্তমরূপে বিদিত আছে। এই সুপ্রাচীন বেদবৃক্ষের বেঠেন মধ্যে বেঠেনাস্তব দৃষ্ট হইয়া থাকে, অবশেষে আর অধিক গণনা করিতে অসমর্থ হইয়া আমরা মানব-চিন্তার সুদীর্ঘ ও ধীর ক্রমোন্নতি অবলোকন করিয়া বিষম জড়িত হইতে থাকি। কিন্তু আপাততঃ যাহা অতি আধুনিক বলিয়া বোধ হয়, তাহার পার্শ্বে ও সম্মুখে অনেক প্রাচীন ও আদিম বিষয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। এমতে আমার মতে প্রাচীন সাহিত্য হইতে উপদেশ গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু প্রথম হইতে চিন্তাব কালবিভাগ-পরম্পরার উপর নির্ভর কবিত্তে চেষ্টা করা অবিধেয়। পুৰাণ সাহিত্যবিদেরা বহুকাল এইরূপে বলিতেন যে, সর্ষ প্রথমে একটি প্রস্তর কাল ছিল। এই কালে দস্তা বা লৌহ-নির্মিত কোন অস্ত্র বা যন্ত্র ছিল না। এই কালের পর পিত্তল কালের আবির্ভাব অনুমিত হইত। পিত্তল কালের সমাপ্তিতে পিত্তল প্রস্তর-নির্মিত অস্ত্র সকল পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাইত। কিন্তু লৌহের কোন চিহ্ন ছিল না। সর্ষশেষে আমরা তৃতীয় কালের আবির্ভাব-বার্তা শুনিয়া থাকি। এই কালে লৌহ-নির্মিত যন্ত্রের প্রভাব কিংবা আধিক্য বশতঃ উপল ও পিত্তল-বিষয়ক শিল্প-নৈপুণ্যের গৌরব একবারে তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল।

এই ত্রিকাল ও উহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ-বিষয়ক মতে যে কিছু না কিছু সত্য মিশ্রিত ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু উহা প্রাচীন সাহিত্য-বিষয়ক জল্পনা বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় অন্যান্য জল্পনার ন্যায় স্বাধীন চিন্তার গতি বহুকালের জন্য অপরূপ রাখিয়াছিল। অবশেষে ইহা জানা গিয়াছে যে, যে সকল ধাতু এক সময়ে বা ক্রমান্বয়ে ব্যবহৃত হইয়াছে, তৎসমুদয় স্থানীয় অবস্থার উপর নির্ভর করিত, যেখানে উচ্চ সম্বন্ধীয় বা খনিজ লৌহ সহজে পাওয়া যাইত, সেখানে পিত্তলজাত দ্রব্যাদির পূর্বে প্রস্তর-নির্মিত অস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে লৌহ-নির্মিত অস্ত্রাদিও পাওয়া যাইত।

সুতরাং মানবের জ্ঞানোদ্ভবের ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে আমাদের যে একটি পূর্ষস্থিরীকৃত মত আছে, তদ্বিষয়ে উপরি উক্ত অবস্থা দেখিয়া আমাদেরকে সাবধান হইতে হয়। বেদে প্রাচীন অস্ত্রের ন্যায় মানবের

ভাব এবং চিন্তাও সামান্য ও অমার্জিত দেখা গিয়া থাকে। আবার তাহাদের পার্শ্বে পার্শ্বে পিতলের ন্যায় উজ্জ্বল ও গোহের ন্যায় তীক্ষ্ণ চিন্তা দৃষ্ট হয়। এক্ষণে আমরা কি এই উজ্জ্বল চিন্তা প্রভৃতিকে অমার্জিত প্রস্তর অপেক্ষা আধুনিক জ্ঞান করিব? ফলতঃ একরূপ জ্ঞান হওয়া প্রাভাবিক। কিন্তু কৰ্ত্তা কে তাহা, এবং সৰ্ব্বকালেই যে প্রতিভা-সম্পন্ন লোক জন্মিয়া থাকে ও এই প্রতিভা যে কোন কাল বিশেষে আবদ্ধ নহে, তাহাও একবার আমাদের মনে রাখা উচিত। বাহ্য জগতে ও আপনাতে যাহাব বিশ্বাস আছে, তাহার পক্ষে একবার মাত্র নেত্র উন্মীলনই সহস্রাব অবলোকনের ন্যায় কার্য্যকারী। প্রকৃত দর্শন-বিদের নিকট সমস্ত স্বাভাবিক দৃশ্য উহাব ভিন্ন ভিন্ন নাম, এবং তাহাদের প্রতিনিধি দেবতাগণ প্রাতঃকালের কুজ্জ্বলিকার ন্যায় একবার মাত্র চিন্তাতেই তিরোহিত হইয়া যায়, এবং তিনি বেদের সুমধুর ভাষায় এইরূপ প্রকাশ করিতে থাকেন—“কবির বহু নাম দিলেও টুহা এক, দ্বিতীয় নাই; “একংসং বিপ্রা বহুনা বদন্তি।”

আমরা নিঃসন্ধি চিন্তে এখন বলিতে পারি যে, দর্শনশাস্ত্র বিদগণ এই বহু নাম পরিহার করিবার পূর্বে কবিগণ অবশ্যই সৰ্ব্ব প্রথমে এই বিবিধ নাম দিয়া থাকিবেন। ফলতঃ কবিগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নির স্তুতি করিয়া আসিতে ছিলেন এবং তৎকালে ভারতের দর্শনশাস্ত্র-বিদগণ হিরক্লিতসেব ন্যায় বৃথা বহু দেবের নাম, বহু দেবালয় ও দেবতাদের বহু প্রবাদেয় বিরোধী হইয়াছিলেন।

### নিয়মের সম্বন্ধে ধারণা।

এইরূপ স্তুতিতে পাওয়া যায় যে, অসত্য ও আদিম জাতিদের মধ্যে নিয়মের সম্বন্ধে ধারণা একমাত্র ছল্লভ পদার্থ বা ছল্লভ ব্যাপার ছিল। এমন কি গ্রীক ও লাতিনে নিয়মের শাসনের প্রকৃত পরিভাষা পাওয়া স্ককঠিন। ডিউক অব আর্গাইল একদা কোন আবশ্যক গ্রন্থের ঐ নাম দিয়াছিলেন। কিন্তু বেদের অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এই অপরিষ্কৃত নিয়মের ধারণাও অতি



প্রাচীন পদার্থ। আজি কালি অজ্ঞাত মস্তিষ্ক-ক্রিয়ার সম্বন্ধে অনেক লিখিত হইয়াছে, এবং উহার অভ্যুত্থানপূর্ণ বিবৃতি অনেক হইয়াছে, তথাপি মানসিক কার্য্য এ পর্য্যন্ত চলিতেছে। সে সকল মানসিক কার্য্য এপর্য্যন্ত ভাষায় ব্যক্ত হয় নাই। আমাদের ইন্দ্রিয়োপরি সহস্র সহস্র ধারণা অঙ্কিত হইতেছে। উহার অধিকাংশই অনবহিত ভাবেই তিরোহিত হইতেছে এবং মানস-পট বা স্মৃতিপথ হইতে মুছিয়াও যাইতেছে, কিন্তু কোন বিষয়ই যথার্থতঃ একেবারে স্মৃতিপথের বহির্ভূত হইতে পারে না ; কেন না নৈসর্গিক রক্ষণশক্তি তাহার একান্ত বিরোধী। প্রতি অক্ষনের সঙ্গে সঙ্গে এক একটী রেখা পড়িতে থাকে, উপর্যুপরি এইরূপ হইতে হইতে অপরিষ্কৃত রেখা হইতে উজ্জল রেখা হইয়া উঠে এবং পরিণেবে সমস্ত উপরিভাগ আলোক ও ছায়া-সম্বিত হইয়া আমাদের মানস-পট ক্রমে উজ্জল ছবির ন্যায় পরিষ্কৃত হইয়া উঠে।

আমরা এইরূপে বুঝিতে পারি যে, সর্ব প্রথমে প্রকৃতির যে সমস্ত বিচিত্র ও লোমহর্ষণ ব্যাপার বা দৃশ্য দর্শন করিয়া মনুষ্য-হৃদয়ে সম্মান, ভয়, বিস্ময় ও আনন্দের উদ্রেক হইত, সেই সেই দৃশ্যের পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব, দিবা রাত্রির অভ্রান্ত গমনাগমন, গুরু ও কৃষ্ণ পক্ষের পরিবর্তন, চন্দ্রের পরিবর্তন, ঋতুভেদ পরম্পরা, নক্ষত্র-গণের নৃত্য প্রভৃতি নৈসর্গিক ব্যাপার অবলোকনে মানবহৃদয়ে পরিচয়, শাস্তি ও নিরুদ্বেগের ভাব উদয় হইয়াছিল। এই ধারণা সর্ব প্রথমে একটী অনির্কটনীয় ভাব মাত্র ছিল অর্থাৎ ইহা ব্যক্ত করিবার সহজ উপায় ছিল না। সুতরাং উহাকে এক প্রকার সংজ্ঞাহীন, মস্তিষ্ক-ক্রিয়া বলিলেও বলিতে পারা যায়। কারণ যে অসংখ্য অনুভূতি হইতে ঐ ভাবের উদয় হয়, তাহা বুঝিতে পারিয়া সংজ্ঞাযুক্ত ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিলেই উহার ধারণা করা অসম্ভব হইয়া উঠে না।

গ্রীশ ও রোমের প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রবিংদিগের মধ্যে এই ভাব নানাক্রমে ব্যক্ত হইয়াছে। যথা ;—“সূর্য্য তাহার নির্দ্দাবিত মীমা অতিক্রম করিবে না ; করিলে সত্যের সহকারিগণ ধরিয়া তাহাকে বাহির করিবে!” হিরক্লিডসের এইরূপ বলিবার তাৎপর্য্য কি ? ফলতঃ বিশ্বসংসার বা



প্রকৃতি ব্যাপিয়া একটি নিয়ম রহিয়াছে, সূর্য্য বা মৌর দেবতাকেও ঐ নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে হয়, ইহা যে তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এই কথা তাহার স্পষ্ট প্রমাণ। গ্রীক দর্শনশাস্ত্রে এটি ধারণাটি অত্যন্ত ফলবতী হইয়াছিল। ইহা হইতে গ্রীকদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রথমাকুরস্বরূপ অদৃষ্ট-কল্পনার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

রোমের দর্শনবিৎ পণ্ডিতগণের অতি প্রাচীন ও আদিম ভাব বা চিন্তা জ্ঞানিবার প্রয়াস বিফল হইলেও এস্থলে কিকেরোর লিখিত একটি প্রসিদ্ধ মত উদ্ধৃত করা যাইতেছে; এই ভাবটি হিরক্রেতসের মত হইতে ভিন্ন নহে; কিকেরো বলেন “মনুষ্যকেবল স্বর্গীয় পদার্থের নিয়ম-বিষয়ক চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকা উচিত নহে; প্রত্যুত তাঁহার জীবনের নিয়মেও ঐ সকল বিষয়েব অনুকরণ করা কর্তব্য।” বৈদিক কবিগণও তাহাদের সরল ভাষায় ঠিক ঐ রূপ কহিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এক্ষণে দেখা যাউক, প্রকৃতির কোন দেশে শৃঙ্খলা, পরিমাণ বা নিয়মের জন্ম-স্থান বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে, ইহার প্রথম নাম কি ছিল এবং ইহার প্রথম অভিব্যক্তিই বা কি ছিল।

ব্রাহ্মণদের প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রলেখকদের মধ্যে সংস্কৃত “ঋত” শব্দের ব্যবহার অতি বিরল হইলেও আমার মতে এই শব্দ ভারতের ধর্ম্ম-কবিতা-তন্ত্রীসমূহের একটি প্রতিঘাত তুল্য বলিয়া বোধ হয়।

### সংস্কৃত ঋত ।

দেবতামাত্রেরই কতকগুলি বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। উহারা সকলেই এই ঋত শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। উহাদের প্রত্যেকেই দুইটি করিয়া ভাব প্রকাশ করে। উহার প্রথমটি এই যে, দেবতাবা প্রকৃতির শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছেন এবং প্রকৃতি তাঁহাদের অনুবর্তী। দ্বিতীয়টি, একটি নৈতিক নিয়ম আছে যে, মনুষ্যমাত্রকেই ইহার অনুবর্তী হইতে হইবে, ইহা অবহেলা করিলে দেবতারা শাস্তি দিয়া থাকেন। দেবতাদের

কেবল নাম ও নৈসর্গিক ব্যাপারের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ অপেক্ষা এইরূপ বিশেষণ পদের আবশ্যকতাই অধিক, যেহেতু ইহা দ্বারা ভারতের প্রাচীন ধর্মের অন্তর্দেশে প্রবেশ করিতে পারা যায়। কিন্তু ইহাদের সম্যক উপলব্ধি করা অতীব দুষ্কর।

বেদে একই শ্লোকে কখন কখন ঋত প্রভৃতি শব্দের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অর্থ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কবি স্বয়ং অনেক স্থলে স্পষ্ট রূপে উহাদের প্রভেদ করিয়া না থাকিবেন; কিন্তু তিনি স্বয়ং যাহা করেন নাই, প্রায় কোন টীকাকারই তাহা করিতে সাহস করেন না। যখন আমরা স্বয়ং নিয়মের কথা বলি, উহাতে কি বুঝায়, তাহা কি আমরা স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া থাকি? তখন আমরা কি এমন বলিতে পারি যে, প্রাচীন কবিগণ আধুনিক দর্শনশাস্ত্রবিৎদিগের অপেক্ষা সূক্ষ্ম-দর্শী ও যথার্থ বক্তা ছিলেন?

যেখানেই ঋত শব্দ ব্যবহৃত হইরাছে, সেইখানেই যে নিয়ম, শৃঙ্খলা, পবিত্র, আচার, বলি প্রভৃতি কতকগুলি অস্পষ্ট ও সাধারণ শব্দ ব্যবহৃত হইতে পাবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি আমরা কোন বৈদিক শ্লোকের অনুবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করি এবং এই সকল দীর্ঘ দীর্ঘ শব্দের কি অর্থ হইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করি, তখনই মহা বিপদ উপস্থিত হয়; তখন নিরাশ হইয়া গ্রন্থ বন্ধ করিয়া রাখিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে। যদি অগ্নি অথবা অন্য কোন সৌর দেবতা “স্বর্গীয় সত্যের প্রথম জাত বিষয়” বলিয়া উক্ত হয়, তাহা হইলে কিরূপ ধারণা জন্মিতে পারে? সৌভাগ্যের বিষয় যে, আমরা অনেক স্থলেই ঋত শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাঠি, এবং ইহা হইতেই এই শব্দের ও শব্দার্থের ক্রমোন্নতি নির্ণয় করিতে সক্ষম হই।

এরূপ প্রাচীন গৃহসংস্কারে যে অনেক বিষয় অনুমান-সিদ্ধ করিয়া লইতে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমি ঋত শব্দের মূলভিত্তি ও গঠন সম্বন্ধে যাহা বলিব, তাহাও অনুমান বা আমার প্রথম চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

### ঋত শব্দের আদিম অর্থ।

আমার বোধ হয়, ঋত শব্দ দ্বারা পূর্বে কেবল সূর্য্য এবং অন্যান্য পদার্থের নিরূপিত গতি বুঝাইত। ঋত এই কৃদন্ত শব্দ, ঋ ধাতু হইতে নিস্পন্ন। ইহাতে সংযোজিত, উপযুক্ত, এবং স্থিতি, অথবা গত, যাওয়া বা যাইবার পথ বুঝায়। উভয়ের মধ্যে আমি দ্বিতীয় ব্যুৎপত্তিটাই সম্ভব মনে করি। নিষ্কৃতি শব্দেও এই ধাতু দেখিতে পাই। ইহার প্রকৃত অর্থ, চলিয়া যাওয়া, হ্রাস, বিনাশ, মৃত্যু, বিনাশের স্থান, গভীর রক্ত এবং আধুনিক (অনৃত শব্দের ন্যায়) নরক।

গমন, জাঁকজমকের সহিত চলন, মহৎ দৈনিক পতি, কিংবা যে পথ প্রতিদিন সূর্য্য কর্তৃক তাহার উদয় হইতে অন্ত পর্য্যন্ত, অধিকন্তু প্রাতঃকাল দিবা, রাত্রি ও তাহাদের অন্যান্য প্রতিনিধি কর্তৃক পরিভ্রমণ করা হয়, এবং যে পথকে রাত্রি কিংবা অন্ধকার কখন প্রতিবোধ করিতে পারে না, তাহাই যথার্থ গতি, ভাল কার্য্য ও সরল পথ বলিয়া গণ্য হইয়াছে (১)।

যাহা হউক, ইহা সেরূপ দৈনিক গতি, বা যে পথে ইহা পরিভ্রমণ করিয়াছিল, সে পথ নয়। ইহা যে নির্দিষ্ট স্থান হইতে গতি আরম্ভ করিয়া সেই স্থানে প্রত্যাবর্তন করিত, ঋতের বিষয় বলিবার সময় বৈদিক কবিদিগের মনে তাহাই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া জ্ঞান হইয়াছিল। তাঁহারা ঋত পথের কথা বলিয়া থাকেন, আমরা ইহাকে কেবল প্রকৃত পথ বলিয়া অনুবাদ করিতে পারি। কিন্তু যাহাকে তাঁহারা সেই অজ্ঞাত শক্তি-কৃত পথ বলিয়া থাকেন, তাহাকেও তাঁহারা ঋত নামে অভিহিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

যে পূর্বাদিক প্রতিদিন প্রাতঃকালে অসীম দূরত্ব বিকাশ করিত, যে স্থান হইতে সূর্য্য দৈনিক গতির নিমিত্ত উদিত হইতেন, অদিতি শব্দে প্রথমে কিরূপে সেই পূর্বাদিক বুঝাইত আপনারা যদি তাহা স্মরণ করেন, তাহা হইলে যে ঋত শব্দে স্থান বা যে শক্তি সূর্য্যের পথ নিরূপণ করে বুঝায়, তাহা বেদে সময়ে সময়ে অদিতি শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত দেখিয়া বিস্মিত হইবেন না। যেমন উষাকে অদিতির মুখ বলা হইত, সেই রূপ সূর্য্যকেও ঋতের

মুখ বলিয়া নির্দেশ করা যাইত (১)। আমরা একপ প্রার্থনা দেখিতে পাঠি, যাহাতে মহৎ ঋত (২) অদিতি, স্বর্গ এবং পৃথিবী এই সকলের পরবর্তী স্থান পরিগ্রহ করিয়াছে। ঋতের বাসস্থান ঠিক পূর্বদিকে (৩), একটী প্রাচীন উপ-ন্যাস অনুসারে, এইখানে আলোক আনয়নকারী দেবতাগণকে প্রতিদিন প্রাতঃকালে লুকায়িত দৃশ্যাদিগের বাসস্থান অন্ধকার-পরিপূর্ণ গহ্বর সকল ভাঙ্গিয়া গাভী সকল(৪) আনিতে হইত, অর্থাৎ প্রতিদিনকে এক একটী গাভী স্বরূপ বিবেচনা করা হইত; এই সকল দিন অন্ধকার হইতে পৃথিবীর ও স্বর্গের উজ্জল গোচারণ স্থান দিয়া ধীরে ধীরে আগমন করিত। যখন এই কল্পনা পরিবর্তিত হয়, যখন সূর্য্য পৃথিবীর মধ্যে তাহার দৈনিক গতির জন্য প্রাতঃকালে অশ্ব-যোজনা করিতেন, তখন যে স্থানে তাহারা তাহার অশ্বসকলকে খুলিয়া দিত (৫), সেই স্থান ঋত বলিয়া অভিহিত হইত। উষা ঋতের গহ্বরে বাস করিত (৬)। কি প্রকারে এই উষা মুক্তিনাভ করিয়াছিল, কি প্রকারেই বা উষা স্বয়ং ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণকে, রাত্রির অন্ধকার-পরিপূর্ণ অঞ্চালায় লুকায়িত পশু, বা ধনসম্পত্তি উদ্ধারের জন্য সাহায্য করিত, তাহার সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে।

### সরমার উপাখ্যান।

বৈদিক উপাখ্যানের মধ্যে ইন্দ্রের উপাখ্যানটাই সাধারণের মধ্যে বিদিত। কথিত আছে, ইন্দ্র লুকায়িত গাভীগণের অন্বেষণ জন্য প্রথমে সরমাকে (উষা) প্রেরণ করেন। সরমা গাভীগণের শব্দ শ্রবণ করিয়া, সেই বার্তা

(১) ঋগ্বেদ, ৬ষ্ঠ, ৫১, ১।

(২) ঐ ১০ম, ৬৬, ৪।

(৩) ঐ ১০ম, ৬৮, ৪।

(৪) কোন কোন সময়ে এই সকল গাভী পরিদৃশ্যমান আকাশ হইতে অন্ধকারে নীয়মান মেন অর্থেও প্রয়োজিত হয়।

(৫) ঋগ্বেদ ৫ম, ৬২, ১।

(৬) ঋগ্বেদ, ৩য়, ৬১, ৭।

লইয়া ইন্দ্রের নিকট প্রত্যাগমন করে। অতঃপর উদ্ভ্র যুদ্ধে দক্ষ্যগণকে পরাভব করিয়া গাভীদিগকে উদ্ধার করেন। অবশেষে এই সরমা ইন্দ্রের কুক্কুর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। উহার অপত্যগণ সারমেয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। অধ্যাপক কুঃন্ হারমেয়স্ ও হাবমেস্ শব্দের সহিত সারমেয় শব্দের একত্ব কল্পনা করেন। এই মাতৃগত নাম হইতেই প্রাচীন আৰ্য্যগণের পৌরাণিক অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠে অবতরণ করিবার এক মাত্র পথ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কথিত আছে, সরমা এই ঋত পথ অবলম্বন পূর্বক ঋত স্থানে অর্থাৎ প্রকৃত স্থানে যাইয়া গাভীগণের অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হইয়াছিল (১)। একজন কবি লিখিয়াছেন, সরমা যখন পর্বতের বিদীর্ণ স্থান দেখিতে পাইল তখন সে এই প্রাচীন প্রশস্ত পথকে এক দেশাভিমুখে ফিরাইল এবং নিজেই দ্রুত-পদ-সঞ্চারে পথ প্রদর্শক হইল। এই সময় সরমা গাভীগণের শব্দ বুদ্ধিতে পারিয়া সর্ব প্রথমে তাহাদের অভিমুখে ধাবিত হইল। (ঋগ্বেদ ৩য়, ৩১, ৬)।

পূর্বোক্ত কবিতায় দেবগণ তাহাদের অনুচরবর্গ অর্থাৎ প্রাচীন কবিগণ সমভিব্যাহারে গাভীগণ অর্থাৎ গাভীরূপ দিবালোকের উদ্ধার মানসে যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা ঋত বলিয়া উক্ত হইয়াছে; কিন্তু অপর এক স্থানে কথিত হইয়াছে যে, ইন্দ্র তাঁহার বকুবর্গের সহিত ঋত বা প্রকৃত স্থান প্রাপ্ত হইবার পর বল নামক দস্যুকে বা তাহার গুহাকে খণ্ড খণ্ড পূর্বক বিদীর্ণ করিয়া ফেলেন (২)।

দেবতারা স্বর্গ ও মর্ত্য সৃজন করিতে পারেন। একুপ স্থান যখন অব্বেষণ করা হইয়াছে, তখন সেই প্রকৃত নিশ্চল ও অনন্ত স্থানের সৃজনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। বরুণ স্বয়ংই বলিতেছেন যে, আমি ঋতের আসনে আকাশকে স্থাপিত রাখিয়াছি (৩)। ফলতঃ তৎপরে সত্যের নায় ঋত শব্দও সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের অনন্ত আদি বলিয়া বেদে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

(১) ঋগ্বেদ ৫ম, ৪৫, ৭।

(২) ঐ ১০ম, ১৩৮, ১।

(৩) ঐ ৪র্থ, ৪২, ৪।

উষা, সূর্য্য, দিবা ও রাত্রি যে পথ অনুসরণ করিতেন, সেই ঋত পথের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা সাধারণতঃ ন্যায়ের পথ বা ন্যায়পথ শব্দ দ্বারাই কেবল উহার অনুবাদ কবিত্তে সক্ষম হই।

উষা বিষয়ে আমরা এই রূপ দেখিতে পাই, (১) “তিনি ঋত পথের অনুসরণ কবেন; তিনি যেন পূর্ব্ব হইতেই উহা বিদিত ছিলেন, তিনি কখন রাজ্যের সীমার বহির্ভূত হন না।”

“আকাশ-সমুদ্র উষা, (২) ন্যায়মার্গে উদিত হইয়া স্মীয় মহত্ব প্রচার করতঃ ক্রমে নিকটবর্তী হইয়াছিলেন। তিনি প্রেতগণকে দূরীভূত ও অসুখকর অন্ধকারকে অপসাবিত করিয়াছেন”

সূর্য্য সম্বন্ধে (৩) এইরূপ কথিত হইয়াছে :—

সবিতৃ দেবতা, সত্য পথে পরিভ্রমণ করেন, ঋতের শৃঙ্গ সূদূর উর্দ্ধে উন্নত। ঋত সক্ষম যোদ্ধার শৌর্য্য-বোধ কবিত্তা থাকেন।

কথিত আছে, সূর্য্য উদিত হইলে ঋত পথ আলোকমালায় ব্যাপ্ত হইয়া উঠে (৪)। হিরক্লিডিসও ঠিক এই ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। “হেলিয়স সূর্য্যসীমা অতিক্রম কবিত্তেন না। এই ভাবটী ঋগ্বেদের কোন কবিতাতে ব্যক্ত হইয়াছে। যথাঃ—সূর্য্য নির্দ্ধাৰিত স্থানের অপচয় করেন না” (৫)। এস্থলে যে পথ ঋত পথ বলায় উক্ত হইয়াছে, তাহা অন্যান্য স্থলে ‘গাতু’ নামে উল্লিখিত দেখা যায় (৬)। এই ঋত শব্দের ন্যায় প্রভাতের প্রাচীন দেবতাগণের মধ্যে গাতু শব্দেরও ব্যবহার দৃষ্ট হয় (৭)। দিবা ও রাত্রি যে পথে পরিভ্রমণ কবে (৮), উহা স্পষ্টই সেই পথ। এই পথ দিন দিন

(১) ঋগ্বেদ, ১ম, ১২৪, ৩।

(২) ঐ ৭ম, ৭৫, ১।

(৩) ঐ ৮ম, ৮৬, ৫; ১০ম, ৯২, ৪; ৭ম, ৪৪, ৫।

(৪) ঐ ১ম, ১৬৬, ২; ১ম, ৪৬, ১১।

(৫) ঐ ৩য়, ৩০, ১২।

(৬) ঐ ১ম, ১৩৬, ২।

(৭) ঐ ৩য় ৩১, ১৫।

(৮) ১ম, ১১৩, ৩।

পরিবর্তিত হয়। আমরা আরো একপ অনেক পথের কথা শুনিতে পাই, যে সকল পথে অশ্বিনী, দিবা, রাত্রি প্রভৃতি অন্যান্য দেবতা পরিভ্রমণ করেন (১)।

ইহা জানা আবশ্যক যে, যে পথ সাধারণতঃ ঋত পথ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কথিত আছে প্রাচীন বৈদিক দেবতা—বরুণ রাজা সূর্য্যের পরিভ্রমণ জন্য সেই পথ প্রস্তুত করিয়াছেন (১ম, ২৪. ৮)। এক স্থানে যাহা বরুণের বিধান বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহাই আবার অন্যত্র কি জন্য ঋতের বিধান (২) বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা আমরা এই রূপে বুঝিতে পারি। সর্বব্যাপী আকাশ-দেবতা বরুণ স্বাধীন শক্তির ন্যায় কিরূপে ঋত নির্ধারণ-কর্ম বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন, তাহাও উপলব্ধি করা যায়।

যখন দেবতারা ন্যায় মার্গ অবলম্বন করিয়া অন্ধকারের শক্তি জয় করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তখন যে তাহাদের উপাসকেরা ঐ পথানুসরণ করিবার জন্য দেবতাদিগকে স্তুতি করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? ঋগ্বেদে ইহার নিদর্শন আছে যথাঃ—“হে ইন্দ্র আমাদিগকে ঋত পথ প্রদর্শন করুন, বিপদ-নাশক, ন্যায়-পথে লইয়া চলুন (৩)।”

কিংবা “হে মিত্র! হে বরুণ! নৌকারোহী যেকপ সমুদ্র পার হয়, তদ্রূপ আমরা যেন আপনাদিগের অবলম্বিত ন্যায় মার্গ অবলম্বন করিয়া বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিতে সক্ষম হই (৪)।” এই মিত্র ও বরুণ যে, আবার ঋতের স্তুতি করিয়াছেন, তাহাও দৃষ্ট হয় (৫)। অপর এক কবি লিখিয়াছেন, “আমি উত্তম রূপে ঋত পথ অনুসরণ করিতেছি (৬)।” পক্ষান্তরে এইরূপ কথিত হইয়াছে যে, দুষ্কর্ম্মাশ্রিতেরা কখনই ঋত পথে পদার্পণ করিতে পারে না (৭)।

(১) ঋগ্বেদ, ৮ম, ২২, ৭।

(২) ঐ ১ম, ১২৩, ৮।

(৩) ঐ ১ম ১৩৩, ৬।

(৪) ঐ ৭ম, ৬৫, ৩।

(৫) ঐ ৮ম, ২৫, ৪।

(৬) ঐ ১০ম, ৬৬, ১৩।

(৭) ঐ ৯ম, ৭৩, ৬।

### ঋত, যজ্ঞ বা হোম ।

কতকগুলি প্রাচীন যজ্ঞ সূর্য্যের গতির উপর নির্ভর করিত । প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সারাহ্নে (১) কি রূপে দৈনন্দিন যাগ হইত ; পূর্ণিমা ও প্রতিপদে কি রূপে আচরিত হইত, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য যজ্ঞ কি রূপেই বা সূর্য্যের ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক গতিও তিন ঋতুর অনুক্রমে নিষ্পন্ন হইত, তাহা মনে হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে, কিরূপে কালসহকারে স্বয়ং যজ্ঞ প্রভৃতিও ঋত পথ বলিয়া উক্ত হইয়াছে (২) ।

অবশেষে ঋত শব্দ সাধারণতঃ বিধি অর্থ ব্যঞ্জক হইয়া উঠে । কোন কোন স্থানে এরূপ উক্ত হইয়াছে যে, নদী প্রভৃতি ঋত পথ অনুসরণ করিয়া থাকে (৩) । অপরাপর স্তোত্রে আবার এরূপ দেখা যায় যে, নদীগণ বক্রণের ঋত বা বিধি অনুসরণ করিতেছে । ঋত শব্দের আরও অনেক অর্থ ও অর্থাভাস দেখিতে পাওয়া যায় । কিন্তু আমাদের প্রয়োজন অনুসারে এস্থলে তাহার সমালোচনা আবশ্যক হইতেছে না । কেবল এই মাত্র বলা আবশ্যক যে, ঋত শব্দ যেমন ন্যায়, উত্তম ও সত্য অর্থ ব্যঞ্জক ছিল সেইরূপ অনৃত শব্দ আবার মিথ্যা, মন্দ, অসত্য মাত্র বুঝাইত ।

### ঋত শব্দের পরিপুষ্টি ।

বেদে ঋত শব্দ যে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট প্রতীতি করাঠিতে সক্ষম হইয়াছি কি না সন্দেহ । আদৌ কিরূপে উহা পৃথিবী, সূর্য্য, প্রাতঃকাল, সন্ধ্যাকাল ও দিবা রাত্রির সঞ্চরণ ও পরিভ্রমণ বুঝাইত, কিরূপে প্রাচীমূলে ঐ সঞ্চরণের মূল কল্পিত হইত, স্বর্গীয় গ্রহের পথে কিরূপেই বা তাহার আভাস লক্ষিত হইত এবং যে পথ অবলম্বন করিয়া দেবতাগণ অন্ধকারের মধ্য হইতে আলোকে আনিয়াছিলেন পরিশেষে সেই পথ কিরূপে মনুষ্যের যাগ যজ্ঞের ও নৈতিক জীবনের

(১) মনু, ৪র্থ ২৫, ২৬ ।

(২) ঋগ্বেদ, ১ম ১২৮, ২ ; ১০ম, ৩১, ২ ; ৭০, ২ ; ১১০, ২ ; ইত্যাদি ।

(৩) ঐ ২য়, ২৮, ৪ ; ১ম, ১০৫ ১২ ; ৮ম, ১২, ৩ ।



অনুসরণীয় পথ বলিয়া অবধারিত হইয়া উঠিল, তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে পারিঘাতি কি না, বলিতে পারি না (১)। এই প্রাচীন অনুভূতির পরিপুষ্টিতে চিন্তাব সমধিক বিশুদ্ধি আশা করা যাইতে পারে না। ফলতঃ ঐ সমস্ত কবিকল্প-৷ হইতে যদি চিন্তার শুদ্ধভাব বাহির করিতে চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে উহাদের পক্ষ ভগ্ন হইবে এবং উহাদের আত্মা বিলোড়িত হইয়া যাইবে। রক্ত, মাংস ও জীবন না পাইয়া আমরা কেবল শুষ্ক অস্থি মাত্র প্রাপ্ত হইব।

### অনুবাদ করিবার কাঠিন্য।

এইরূপ পর্যালোচনা করা অতি সহজ নহে। উহার মহৎ বিষয় এই যে, আমাদিগকে প্রাচীন আকারবদ্ধ ভাব বা চিন্তা সকলকে আধুনিক আকারে পরিবর্তিত করিতে হয়। এই ব্যাপাবে যে কতকটা ব্যতিক্রম ঘটিবে, তাহা অপরিহার্য। অর্থগৌরবযুক্ত ও নবভাব-প্রকাশ-ক্ষম বৈদিক ঋত শব্দের ন্যায় কোন কোমল ও অনায়াস-প্রয়োজ্য শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা দ্বারা আমরা চিন্তার আদি কেন্দ্র নির্ণয় করিতে পারি, এবং তৎপরে উহাব নানা দেশ-বিক্ষিপ্ত বশ্মির অনুগমন করিতে সক্ষম হই। আমি এইরূপ করিতেই প্রয়াস পাইয়াছি এবং এইরূপ করিতে গিয়া যদি পুরাতন বেশের উপর একটি নূতন বেশ গরাইয়াছি বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে, আমাদের সকলের কেবল সংস্কৃত না কহিয়া বৈদিক সংস্কৃত বলা উচিত। নচেৎ উপায়ান্তর দেখিতে পাই না।

ইংলণ্ডের কোন দর্শনবিৎ ও প্রসিদ্ধ কবি প্রাচীন হিব্রুদিগের দেহবদ্ধ জেহোবায় বিশ্বাস স্থানে “অনন্ত শক্তিতে বিশ্বাস” এইরূপ অনুবাদ করায় সম্প্রতি অতি নিন্দিত হইয়াছেন। সমালোচকেরা এইরূপ প্রতিবাদ কবিয়া-ছেন যে, স্মৃষ্টি ও আধুনিক ইংবাজী ভাব হিব্রু ভাষায় ব্যক্ত হওয়া

(১) হিব্রু ভাষার যাযাব শব্দেরও এইরূপ পরিপুষ্টি দেখা যায়। See Goldziher, 'Mythology among the Hebrews,' p. 123.

অসম্ভব। এ কথা মিথ্যা না হইতে পাবে, কিন্তু যদি প্রাচীন বৈদিক কবিগণ আজি কালি জীবিত থাকিতেন, আর যদি তাহারা আধুনিক ভাব ভাবিতেন ও আধুনিক ভাষা কহিতেন, তাহা হইলে তাহারা যে তাহাদের প্রাচীন ঋত শব্দের স্থানে “অনন্ত শক্তি” প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইতেন, তাহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

### ঋত শব্দ আর্থ্যাদিগের একটি সাধারণ কল্পনা কি না ?

কেবল আর একটি মাত্র বিষয় অবধারণ করিতে বাকি আছে। আমরা দেখাইয়াছি যে, ঋত শব্দটী বেদে অতি প্রাচীন চিন্তার স্তর মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, ঐ শব্দটী বিশুদ্ধ বৈদিক, কিংবা দ্যৌস্, জিউস্ জুপিটার প্রভৃতি শব্দের ন্যায় একটি সাধারণ আর্থ্য-কল্পনা কি না।

ইহা অবধারণ করা সহজ নহে। লাতিন ও জার্মান ভাষার কথা পরস্পর সম্বন্ধ অনেক ভাব প্রকাশ কবে। এই সকল শব্দ কেবল ar ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু এমন কোন প্রমাণ নাই যে, উহারা বৈদিক ঋত শব্দের ন্যায় কেবল স্বর্গীয় পদার্থের আত্মিক সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাৎসরিক গতির ধারণা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

সংস্কৃত ঋত শব্দ ভিন্ন ঋতু এই সাধারণ শব্দ দেখা গিয়া থাকে। আদৌ এই শব্দে বৎসরের গতি বুঝাইত, জেন্দ ভাষায় ঐরূপ রতু শব্দ দেখা যায় ; কিন্তু উহাতে কেবল আদেশ না বুঝাইয়া আদেশকারীকেও বুঝায়।

সংস্কৃত ঋতু ও ঋত শব্দের সহিত লাতিন rite, ritus শব্দের একত্ব কল্পনা দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু লাতিনের ri সংস্কৃতের “ঋ”র প্রতিক্রম নহে। এই “ঋ” অর্ বা স্বর আকার ; তজ্জন্য লাতিনে or er এবং ur এর প্রতিক্রম হইতে পারে।

লাতিন crdo এর সহিত অর্ বা ঋ ধাতুর সংশ্রব দেখাইতে আর কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না। বেন্ফি দেখাইয়াছেন যে, ordo, ordinis সংস্কৃত ঋৎবানের সমান। ordior (বয়ন) শব্দে প্রথমে বোধ হয় কোন সামগ্রীর বিশেষতঃ সূত্রের যথাননিবেশ বুঝাইত।

লাতিন *rātus* শব্দকে ঋত শব্দের সমান বলা যাইতে পারে ; লাতিনে *rātus* শব্দে আদৌ নক্ষত্রগণের গতি বুঝাইত। আমার মতে লাতিন *rātus* ও সংস্কৃত ঋত একমূল ও এক অভিপ্রায় হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, কেবল এই মাত্র প্রভেদ যে, বৈদিক ঋত শব্দের অর্থ ক্রমোন্নত হইয়াছিল, লাতিন শব্দটির মেরুপ কিছু হয় নাই। আমি স্বয়ং এই মতাবলম্বী হইলেও উহা ব তুচ্ছ হস্ত গোপন করিতে ইচ্ছা করি না। ঋত শব্দ লাতিনে সংরক্ষিত হইলে উহা *artus*, *ertus*, *ortus* কিংবা *urtus* ইহার কোন একটা হইবার সম্ভাবনা থাকিত, কিন্তু *ratus* কিংবা অনবধারিত অর্থ-বোধক *irritus* শব্দে *rātus* কখনই হইতে পারে না। অধ্যাপক কুংন যে, লাতিন *ratus* ও সংস্কৃত “রাত” শব্দের একত্ব স্বীকার করিয়াছেন, আমার মতে তাহা যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। তিনি উহা “রা”, দান করা, ধাতু হইতে নিস্পন্ন করিয়াছেন। যেমন লাতিন দা (*dā*) ধাতু হইতে *dātum*, *redditum* পদ হইয়া থাকে, ঠিক সেই রূপ রা ধাতু *rātum*, *irritum* হইতে পদ সিদ্ধ হয়। এহলে অধ্যাপক কুংনের ধাতুব অর্থ লইয়াই বড় গোলযোগ। রাত শব্দে দত্ত বুঝায়, এবং যদিও ইহার স্বীকৃত অবধারিত প্রভৃতি অর্থ দেখা যায়, এবং যদিও জেন্দ ভাষায় দা ধাতু-নিস্পন্ন দাত শব্দে দান করা ও নিষ্কারণ করা বুঝায়, তথাপি লাতিনে *rātum*, পদেব যে আদৌ ঐ অর্থ ছিল, কে বসেনেব মতে তাহার কোন লক্ষণই লক্ষিত হয় না।

লাতিন *ratus* ও সংস্কৃত ঋতের একত্ব কল্পনায় যে শব্দগত বৈষম্য দৃষ্ট হয়, তাহাও অপরিহার্য বলিয়া বোধ হয় না। লাতিন *rātis* (ভাসা) শব্দের সহিত সংস্কৃত অব্ (দাড় বাওয়া) এবং লাতিন *gracilis* শব্দের সহিত সংস্কৃত কৃশ শব্দের সংশ্রব দেখা যায়। যদি লাতিন *ratus* আর সংস্কৃত ঋত এই কথা হইল, তবে উহাও যে আদৌ স্বর্গীয় পদার্থের নিয়মিত ও নির্দ্ধারিত গতি বুঝাইত, তাহা মনে করা অর্থোক্তিক বলিয়া বোধ হয় না। পরিশেষে *considerare*, *contemplari* প্রভৃতি আরও অনেক শব্দের ন্যায় উহাও ভিন্নাত্মক হইয়া উঠে। এইরূপ হইলে সংস্কৃত ঋত শব্দ বিক্রপে আদৌ স্বর্গীয় পদার্থের গতি, নিয়ম, অর্থ হইতে নৈতিক

নিয়ম ও ধ্বনিনিষ্ঠা অর্থ-ব্যঞ্জক হইয়া উঠে, এবং লাতিন *ratus* শব্দ ঐ মূল হইতে উদ্ভূত হইয়া লাতিন ও জার্মান ভাষায় প্রজ্ঞা-বিষয়ক নয়ম ও যৌক্তিকতা অর্থবোধক হইয়া উঠিয়াছে, তাহা আলোচনা অতীব প্রীতিকর বলিতে হইবে। *ratus* শব্দের সহিত সম্বন্ধ একই ধাতু হইতে আগবা লাতিন *ratio* (নির্ধারণ, গণন, যোগ, বিয়োগ, যুক্তি) গথিক ভাষায় *rathjo* (সংখ্যা) *rathjan* (গণনা করা) এবং আদিম জার্মান ভাষায় *radja* (কথা) এবং *redjon* (কথা কথা) প্রভৃতি শব্দ দেখিতে পাই।

### ঋত জৈন্দ ভাষায় অব।

অন্যান্য আৰ্য্যভাষায় বৈদিক ঋত শব্দের প্রতিশব্দ বাহির করিবার প্রয়াস নিফল হইলেও এবং তন্নিবন্ধন দ্যৌস্ ও জিউস শব্দের ন্যায় এই শব্দকে আত্মবংশ পৃথক হইয়া পড়িবার পূর্করচিত প্রাচীন শব্দ বলিয়া নির্দেশ করা সুকঠিন হইলেও আমরা এমন দেখাইতে পারি যে, যে ইরান-বাসিন্দের ধর্ম জৈন্দ-আবেস্তায় দেখা যাইতেছে, এবং যে ভারতবাসীর ধর্ম বেদে সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহাদের পৃথগ্ভূত হওয়ার পূর্ক এই শব্দ ও ইহার কল্পনা উভয়ই বিদ্যমান ছিল। আমরা জানি যে, আৰ্য্যভাষার পূর্কদক্ষিণাভিমুখে বিস্তৃত এই দুইটী শাখা উত্তর পশ্চিমাভিমুখে বিস্তৃত অন্যান্য শাখা হইতে পৃথক হইয়া পড়িবার পবেও বহুদিন পর্যন্ত একত্র ছিল। এই দুই ভাষায় অনেক সাধারণ শব্দ ও ভাবের একতা লক্ষিত হইয়া থাকে। অন্য কোথাও তৎসদৃশ শব্দ বা ভাব দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ এই দুই জাতির ধর্ম ও ক্মকাণ্ডে এমন অনেক শব্দ দেখা যায়, যাহাদিগকে পরিভাষা বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। তথাপি সংস্কৃত ও জৈন্দ উভয় ভাষাতেই একই রূপ পরিভাষার ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে। জৈন্দ ভাষার অব শব্দ সংস্কৃত ঋত শব্দের প্রতিশব্দ। শাস্ত্রিক বৈষম্য দেখিয়া আপাততঃ ঋত ও অব শব্দ সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু ঋত যথার্থতঃ অর্ন্ত সংস্কৃত “রৎ”, জৈন্দ ভাষার “ব”তে

পরিবর্তিত হইবার সম্ভাবনা। (১) এ পর্য্যন্ত জেন্দ ভাষার “অষ” শব্দ পবিত্র অর্থে অনুবাদিত হইয়াছে এবং আধুনিক পারসীকেরা উহার এই অর্থই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু সুদক্ষ ফার্সী অধ্যাপক মঁস্‌র দরমস-তেতর সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, ঐ শব্দের এই অর্থটা পরে হইয়াছে। বেদে ঋত শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, আবেস্তার অষ শব্দের সেই অর্থ কল্পনা করিলে উহার অনেক অংশ সমীচীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বেদেব ন্যায় আবেস্তায় অষ শব্দ যে পবিত্রতা অর্থে অনুবাদিত হইতে পারে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। যথানিমে যজ্ঞাদি ব্যাপাবের সমাধান প্রসঙ্গেই উহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একুপ স্থলে অষ শব্দ ভাল চিন্তা বা ভাল ভাব, ভাল শব্দ ও ভাল কার্য্য প্রভৃতি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। ভাল অর্থে আচারমতে “ভাল বা ঠিক” অর্থাৎ অভ্রান্ত আবৃত্তি, ও অভ্রান্ত যজ্ঞানুষ্ঠান। আবেস্তার অনেক স্থল হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, জরথুষ্ট্র নিয়মবদ্ধ ব্রহ্মাণ্ড বা ঋতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন ও রাত্রি ক্রমে যাইতেছে ; তাহা বা ক্রমে নির্ধারিত নিয়মের অনুবর্তী হইয়া চলিতেছে, তাহা তিনি বলিয়াছেন। তিনি চন্দ্র ও সূর্যের মৈত্রী অবলোকন করিয়া এবং জীবন্ত প্রকৃতির সুনিয়ম-পরম্পরা, জীবোৎপত্তির বিচিত্র ব্যাপার ও যথাসময়ে শিশুর জীবনোপায় মাতৃ-স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার প্রভৃতি অদ্ভুত ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। বেদে বিশ্ব যেমন ঋতের অনুগামী বলিয়া কল্পিত হইয়াছে, আবেস্তার মতেও বিশ্ব সেইরূপ অষর অনুগমন করিতেছে। জগৎ অষর সৃষ্ট বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বিশ্বস্ত পুরুষেরা জীবদশায় অষের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য উপাসনা করিয়া থাকেন এবং পরলোকে অষের বাসস্থান স্বর্গধামে যাইয়া অহরমজদের সহবাস সুখ-লাভ করেন। ধান্নিক উপাসক অষকে রক্ষা করিয়া থাকেন, জগৎ অষ দ্বারাই বর্দ্ধিত ও শ্রীসম্পন্ন ও হইতেছে। অষ জগতের অত্যাচ্চ নিয়ম ও অষবান্

---

(১) অব্‌ত (ঋত) ও অষের পরম্পর সাদৃশ্য প্রথমে de Lagarde ও Oppert সাহেব নির্দেশ করেন। হৌগ্‌ সাহেবও ইহা সম্ভবত বলিয়া গ্রহণ করেন। Hubschmann কেও এই পক্ষ সমর্থন করিতে দেখা যায়।

( অর্থাৎ যে পায়, অর্থাৎ ধার্মিক ) হওয়াই উক্ত ধর্মাবলম্বীর এক মাত্র উদ্দেশ্য।

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, ভারতবাসীদের ইরানীয়গণ হইতে পৃথক হওয়ার পূর্বে প্রকৃতির নিয়মে বা বিশ্ব-বিধানে এই বিশ্বাস বিদ্যমান ছিল। উহা যে প্রাচীন সাধারণ ধর্মের একটা অংশ বলিয়া পরিগণিত, এবং তন্নিবন্ধন আবেষ্টার প্রাচীনতম গাথা হইতে ও বেদের সর্বপ্রাচীন স্তোত্র হইতেও প্রাচীন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। উহা আধুনিক চিন্তার কল স্বরূপ বলা যাইতে পারে না, অথবা ভিন্ন দেবতাতে ও জগৎশাসনে তাঁহাদের অসীম প্রভাবে বিশ্বাস তিরোধান হইবার পর উহা কল্লিত হইয়াছিল, এমনও বোধ হয় না। উহাকে এক প্রকার সহজজ্ঞান বলা যাইতে পারে। দক্ষিণ দেশস্থ আর্যগণের প্রাচীন ধর্মের মূলে উহা দেখা গিয়া থাকে। তাঁহাদের ধর্মের প্রকৃত অবধারণা করিতে হইলে উষা, ইন্দ্র, অগ্নি ও রুদ্রের উপাখ্যান অপেক্ষা উহা সমধিক আবশ্যিক বলিয়া বোধ হয়।

সূর্য্য কখনই তাঁহার নির্দ্ধারিত সীমা অতিক্রম করিবেন না ; ঋত বা জগৎনিয়মে এইরূপ বিশ্বাস হইলেও উহা প্রথমে কিরূপ ব্যাপার হইয়াছিল, তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন। নিয়মশূন্য তমোরাশির সহিত নিয়নবদ্ধ বিশ্বের যেরূপ প্রভেদ, অদৃষ্টের ক্রীড়ার সহিত বিবেকী বিধাতার অপূর্ণ বিধানের যেরূপ প্রভেদ, উহাদের মধ্যেও সেইরূপ প্রভেদ দেখা যাইবে। যে সকল লোক আর গোথাও শাস্তি-সুখ অনুভব করিতে না পারিয়া আপনাদের প্রিয় বাল্যসংস্কার পরিত্যাগ করিয়াছে, যাহাদের মনুষ্যের প্রতি বিশ্বাস বিষদৃষ্ট হইয়াছে এবং যাহারা স্বার্থপরতা প্রভৃতি পাপের আপাততঃ প্রাবল্য ও কার্য্যকাবিতা দেখিয়া অন্ততঃ ইহ জগতে সত্য ও ধর্মের পক্ষ আদরের অযোগ্য বলিয়া স্থির করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কত শত লোক আজ পর্য্যন্ত ঋত চিন্তায়— এই ঋত বা জগৎনিয়ম নক্ষত্রগণের অপরিবর্তনশীল গতিতেই ব্যক্ত হউক, অথবা অতি ক্ষুদ্র পুষ্পের বৃন্ত, পাপড়ি বা পেশর প্রভৃতিতেই প্রকটিত হউক—অবশেষে শাস্তি-সুখ পাইতেছে। কত লোকইবা আর সমস্ত বিষয়ে

সন্নিহান হইয়াও এই নিয়মবদ্ধ বিশ্বকে—প্রকৃতির এই সুন্দর নিয়মকে আপনাব্য আশ্রয় স্বরূপ ও বিশ্বাসযোগ্য বোধ করিয়াছেন! আমাদের চক্ষে এত খাত অতি সামান্য বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু পৃথিবীর আদিবাসিদের ইহাই সমস্ত ছিল। তাঁহাদের দেবগণ, তাঁহাদের অগ্নি, তাঁহাদের ইন্দ্র প্রভৃতি হইতেও ইহা শ্রেষ্ঠ ছিল। যেহেতু এক বার অনুভূত ও এক বার জ্ঞাত হইলে ইহা কখনই তাঁহাদিগকে হইতে বিচলিত করা হইত না।

এক্ষণে আমরা বেদ হইতে এই শিক্ষা করিলাম যে, ভারতের প্রাচীন আৰ্য্যগণ কেবল নদী, পর্বত, আকাশ সূর্য্য, বজ্র, বৃষ্টি প্রভৃতিতে ঐশ্বরিক শক্তির বিশ্বাস না করিয়া অনন্তের কল্পনা ও প্রকৃতির নিয়মের ধারণা, সর্ব্বধর্ম্মের অত্যাৱশ্যক এই যে দুইটী উপাদান আছে, তাহারও কল্পনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। একটী উষার পশ্চাৎস্থিত সুবর্ণ সমুদ্র হইতে ও অপরটী সূর্য্যের প্রাত্যহিক পথ হইতে প্রকাশিত হইত। এই দুইটী ধারণা শীঘ্রই হটুক আব বিলম্বেই হটুক মনুষ্যকর্ত্তক অবশ্য পরিগৃহীত হইবে। সর্ব্বপ্রথমে উহারা একটী মাত্র ছিল; কিন্তু এই শক্তি প্রাচীন আৰ্য্যগণের মনে যত দিন না এইরূপ প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মাইয়াছিল যে, “সকলই নিয়মানুগত” ও “কিছুই নিয়মের বহির্ভূত হইবে না,” ততদিন এই শক্তি স্থির হইতে পারে নাই।





# ইচ্ছেশ্বরবাদ, অনেকেশ্বরবাদ, একেশ্বরবাদ ও নিরীশ্বরবাদ ।

একেশ্বরবাদ ধর্মের আদিম অবস্থা কি না ?

বেদেব অন্তর্গত প্রধান দেব-নিচয়ের সৃষ্টি-কল্পনা কেমন সুন্দর ও কেমন স্ফাভাবিক, তাহা একবার পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে আপনারা আমার সহিত একমত অবলম্বন করিয়া কহিবেন যে, মানবজাতি সর্ব প্রথমে, একেশ্বর কি অনেকেশ্বরবাদী ছিল, তদ্বিষয়ে বাদানুবাদ এক প্রকার নিশ্চয়োজন, বিশেষতঃ ভাবতবাসী কি ইউরোপীয়গণের পক্ষে এ প্রশ্নের মীমাংসা কোন ক্রমেই কঠিন কথা নহে(১)। বর্তমানকালেব অব্যবহিত পূর্বে এরূপ একটি সাধারণ মত প্রচলিত ছিল যে, প্রথমেই ঈশ্বর-প্রচারিত সত্য-ধর্ম—একেশ্বরবাদ বিকশিত হয়। ফলতঃ এই ভ্রম-সঙ্কুল মত অপ্ৰচারিত থাকিলে উক্ত প্রশ্ন সমুখিত হইতে পারিত না। অনেকের বিশ্বাস যে, ইহুদিগণ কেবল তাহাদের একেশ্বরবাদ পরিত্যাগ করে নাই। ইহা ছাড়া আব সকল জাতিই ক্রমে অনেকেশ্বরবাদী হইয়া দাঁড়ায়, এবং পরিশেষে জ্ঞানলাভ করিয়া ক্রমে পুনরায় দার্শনিক ও একেশ্বরবাদী হইয়া উঠে।

এই প্রমাদ-সঙ্কুল মত বিনষ্ট হইতে কতকাল লাগিয়াছিল, ভাবিলে বিস্ময় জন্মে। এই মত হয়ত কতবার খণ্ডিত হইয়াছে কতবার ধর্মবিদগণ উহা ভ্রমাত্মক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি নানা গ্রন্থে এমন কি বিদ্যালয়ের গ্রন্থেও যে, এই ভ্রমপূর্ণ মত দৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহা ক্ষোভের বিষয় বলিতে হইবে। ফলতঃ এই ভ্রমাত্মক মত কণ্টক বৃক্ষাভাবে সমস্ত স্থানে ব্যাপ্ত থাকিয়া পবিত্র ধর্ম-সম্পত্তি বিনষ্ট করিতেছে।

(১) আদিম অনেকেশ্বরবাদের প্রতিকূল ও অনুকূলে পিকটেট, ফি ডবব, সেরর, বে'ল ও রথ সাহেবের মত মুর্টব সাহেবের “সংস্কৃত মূল” গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ৪১২ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট হইবে। অনুকূল পক্ষে কোন কোন স্থলে আশাও মতও গৃহীত হইয়াছে। আমি কোন্ অংশে এই অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছি, তাহা উপস্থিত প্রেক্ষাপটে পরিষ্কৃত হইবে।



### ভাষা-বিজ্ঞান ও ধর্ম-বিজ্ঞান ।

এসম্বন্ধে ভাষা-বিজ্ঞান ও ধর্ম বিজ্ঞানের মধ্যে অনেক সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয় । ফলতঃ এতদ্বিষয়ক বিশিষ্ট প্রমাণ বাইবেল, বেদ কি অথ কোন প্রাচীন গ্রন্থে না থাকায়, মধ্যকালের ও আধুনিক গ্রন্থকারগণ বলিয়া থাকেন, ধর্ম যেমন ঈশ্বর কর্তৃক সর্ব প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল, ভাষার প্রথমোৎপত্তি ও ঠিক ঐরূপে হইয়াছে । এই সকল গ্রন্থকারের মতে হিব্রুই আদি ভাষা । আর সকল ভাষা হিব্রু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । গ্রীক, লাতিন, ফরাসী ও ইংরেজী ভাষা যে হিব্রু হইতে উৎপন্ন, তাহা সপ্রমাণ করিতে গিয়া এই সকল মহাত্মারা বৃহৎ বৃহৎ পুস্তকে যে, কত পাণ্ডিত্য ব্যয় ও কত পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয় ! হিব্রু ভাষাকে অন্যান্য ভাষায় প্রসূতি বলিয়া সপ্রমাণ করিবার প্রয়াস পুনঃ পুনঃ বিফল হওয়াতে মানব-ভাষার উৎপত্তি ও উন্নতি সম্বন্ধীয় সমস্ত প্রমাণ অপক্ষপাতে সংগ্রহ পূর্বক উহা পুনর্বিচার করা আবশ্যক হইয়া উঠে । ইহাকে ভাষার ঐতিহাসিক গবেষণা কহা যায় । ইহা দ্বারা জগতের সমস্ত ভাষাই শ্রেণীবদ্ধ হওয়াতে হিব্রু ভাষা অন্যান্য সেমিটিক ভাষার এক দেশে যথাযোগ্য স্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । ভাষার উৎপত্তিবিষয়ক প্রস্তাব একটা নতুন প্রশ্নস্বরূপ হইয়া উঠে । প্রশ্নটি এই, প্রত্যেক মানব-ভাষার ধাতু ও ধারণার প্রাথমিক মূল কি ? ভাষা-বিজ্ঞানের উদাহরণের অনুবর্তী হইয়া ধর্ম-বিজ্ঞান পাঠকেরাও ঠিক উক্তরূপ ফল লাভ করিয়াছেন । তাঁহারা পূর্ব হইতেই সকল ধর্মকে ইহুদি ধর্মের অপভ্রংশ বা উহার সঙ্গে সঙ্গে আদিম মূল হইতে আগত মনে না করিয়া জগতের সমস্ত পবিত্রগ্রন্থ-লব্ধ ধর্মচিন্তার আদিম ইতিহাস, নানা জাতির আচার ব্যবহার, এমন কি তাহাদের ভাষা হইতেও ধর্ম-ভাব-বিষয়ক সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ করা তাঁহাদের প্রথম কর্তব্যের মধ্যে স্থির করিয়াছেন । এইরূপে সংগৃহীত সমস্ত বিষয়ের শ্রেণী ভাগ করিয়া তাঁহারা এক দিকে কেবল ইন্দ্রিয়-জ্ঞান ও অপর দিকে বাহ্য জগৎ স্বীকার পূর্বক কিরূপ নানা ধর্মের মূল—অনন্তের ধারণা গনিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহা অবধারণ করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন ।

এই উভয় বিজ্ঞানের মধ্যে আর একটা সাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে । ভাষার

উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উহার হ্রাস ও ক্ষয় দেখা যায়। বর্ধনশীল বস্তুমাত্রেরই ধ্বংস ও ক্ষয় আছে; তাহা না থাকিলে বর্ধন-কার্য্য যে, স্তন্যরূপ হইতে পারে না, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ভাষার জায় ধর্ম্মেরও উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতি দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং দূষিত পদার্থের দূষীকরণ ও নূতন পদার্থের সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে উহার জীবনী-শক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যে ধর্ম্ম আর পরিবর্তিত হওয়া অসম্ভব, তাহা প্রাচীন ভাষার জায় কিছুকাল সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে, কিন্তু শেষে প্রচলিত ভাষার প্রবাহে যেমন প্রাচীন ভাষা বিলুপ্ত হয়, সেইরূপ মনুষ্য ঈশ্বরের কথা বলিয়া যাহা প্রচার করে, তাহার আঘাতে উক্ত অপরিবর্তিত ধর্ম্মও প্রত্যাভিত ও দূরীভূত হইয়া যায়।

আবার যখন কাহাকেও আর স্বাভাবিক কিংবা মূল ভাষায় কথা কহিতে শুনা যায়না, তখন উহাতে কি বুঝায়, তাহা ঠিক কবা স্ককঠিন হইয়া উঠে। এইরূপে এমন এক সময় আসিবে, যখন স্বাভাবিক কি প্রকৃত ধর্ম্ম বলিলে কিছুই বুঝিতে পারা যাইবে না। এক্ষণে মনুষ্যকে কঠোর পরিশ্রম সহকারে সকল বিষয়ই আরত্ত করিতে হয়। যে কোন ক্ষেত্রে পরিশ্রম স্বীকার করিলেও কেবল কণ্টক-বৃক্ষ উৎপাদিত না হইয়া পর্য্যাপ্ত পরিমাণে স্তফলও উৎপন্ন হইয়া থাকে।

হঠাৎ যদি স্বর্গ হইতে স্তসম্পন্ন ব্যাকরণ ও অভিধান আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও যে সকল প্রাণী নিজ নিজ অনুভূতি কল্পনায় পরিণত কবিত্তে শিখে নাই এবং এক কল্পনার সহিত অপরের সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হয় নাই, উহা তাহাদের বে, কোন উপকারেই আইসে না, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। উহা বিদেশীয় ভাষায় লিখিত হইলেও হইতে পারে। কিন্তু নিজ মাতৃভাষা না থাকিলে কেই বা বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতে পারে? আমরা বাহির হইতে নূতন ভাষা শিক্ষা করিতে পারি; কিন্তু ভাষা ও ভাষা-সম্বন্ধে যাহা বুঝায়, তাহা অবশ্যই ভিতর হইতে আইসে। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ। ধর্ম্ম কি, যাহাদের তাহা বোধ নাই, খ্রীষ্ট ধর্ম্ম-প্রচারকেরা বি তাহাদিগকে একবারেই খ্রীষ্টধর্ম্ম বুঝাইতে সক্ষম হন? অতি অসভ্যজাতির হৃদয়ে যে কয়েকটী ধর্ম্মের অন্ধুর প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত থাকে; ধর্ম্ম প্রচার

সর্ব প্রথমে তাহাই উদ্ধার করিতে থাকেন। যত দিন তাহাদের মানস-ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধিত না হয়, ততদিন তিনি উন্নত ধর্মের বীজ বপন করিতে সাহসী হন না।

### ঈশ্বরের বিশেষণ।

যদি এই ভাবে ধর্মালোচনা করা যায়, তাহা হইলে মনুষ্য সর্বপ্রথমে অনেকের কি একেশ্বরবাদী ছিলেন, এ প্রশ্ন আর উঠিতে পারে না। চিন্তার যে সোপানে মনুষ্য একবার আরোহণ করিয়া, একই হউক বা বহুই হউক, যে কোন পদার্থকে ঈশ্বর বলিতে পাবেন, সেই সোপানে উপস্থিত হইয়া তিনি অন্ধকেরও অধিক পথ অতিক্রম করিয়াছেন। তিনি ঈশ্বর শব্দটী বাহির করিয়াছেন। অতঃপর তাঁহাকে দেখিতে হইবে যে, কোন্ কোন্ পদার্থে ঐ শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে, অর্থাৎ কোন্ বস্তুতে “ঈশ্বর” নাম দেওয়া যাইতে পারে। আমাদের এক্ষণে দেখা আবশ্যক, মনুষ্য কিরূপে সর্ব প্রথমে স্বর্গীয় বিষয় অনুভব করিতে সক্ষম হইলেন এবং কি কি উপাদান হইতেই বা এই অনুভূতি গঠিত হইল। তৎপরে প্রশ্ন এই যে, কিরূপে তিনি এক বা বহুকে স্বর্গীয় বলিতে শিখিলেন? ধর্ম-বিষয়-লেখকেরা (১) কহিয়া থাকেন যে, “আদিম-লোকেরা তাহাদের চতুর্দিকের মহান্ নৈসর্গিক পদার্থকে দেবতা বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন”। একথা বলা আর নোম আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে মোম-চর্চিত-শব-রক্ষণ প্রথার কল্পনা করা, উভয়ই তুল্য।

---

১ “প্রাচীন আদিমগণের ধর্ম-সম্বন্ধীয় অনুভূতি যতই প্রগাঢ় ও স্বভাবাতীত বিষয়ে তাহাদের জ্ঞান যতই উন্নত হউক না কেন, তাহারা প্রকৃতি-বাজোব যে সকল মহৎ পদার্থে পবিবেষ্টিত থাকিতেন, যৎসমুদয় তাহাদের হৃদয়ে বিস্ময়মিশ্র ভীতি জন্মাইয়া দিত, তৎসমুদয়কেই দেবতা বলিতেন। এই সকল পদার্থের জ্ঞান, ঐ পদার্থগুলি সর্বদা দেখিতে দেখিতে ক্রমে গাঢ়তর হইয়াছিল। এইজন্ত আকাশ, পৃথিবী, সূর্য্য প্রভৃতিকে তাহারা ‘দেবতা’ বলিয়া মনে কবিলেও তাহাদিগকে তাহাদের বাহ্য দৃষ্ণের অনুযায়ী নামে বিশেষিত করিয়াছিলেন”।—মুইব, ‘সংস্কৃতমূল,’ ৫ম খণ্ড, ৪১৪ পৃষ্ঠা।

## বেদ-দত্ত নব উপকরণ ।

যাঁহারা এরূপ মনে করেন যে, বেদ ধর্ম-বিজ্ঞানের এই সমস্ত উপপাদ্যের মীমাংসা করিতে সক্ষম, আমি তাঁহাদের মধ্যে নই। ভারতবাসীদের মধ্যে যেক্রমে ধর্মোন্নতি হইয়াছিল, জগতের অগ্রাগ্র জাতির মধ্যেও যে ঠিক সেই রূপ হইয়াছে, এরূপ মনে করা নিতান্ত অযৌক্তিক ও ভ্রম। পক্ষান্তরে ধর্মক্ষেত্রে অবতরণ পূর্বক একের সহিত অপরের তুলনা করিতে যাইয়া আমরা ইহাই দেখিয়া চমৎকৃত হই যে, কত ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন পূর্বক একই উদ্দেশ্যে বা অভিপ্রায় সাধিত হইয়াছে। বেদ অনুশীলন করিলে ধর্মোদ্ভেদের একটা অবিচ্ছিন্ন স্রোত দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্রোতটী বড় আবশ্যক। পূর্ব হইতে যদি কোন দৃঢ় আত্মসংস্কারের বশবর্তী না হইয়া উহার আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে ভারতবাসীরা একেশ্বরবাদী ছিলেন কি না, এরূপ প্রশ্ন নিতান্ত নিরর্থক বলিয়া বোধ হয়।

## ইষ্টেশ্বরবাদ ।

বৈদিক ভারতবাসীদের মধ্যে যে প্রাচীন ধর্ম প্রচলিত ছিল, একেশ্বরবাদ বা অনেকেশ্বরবাদ তাহার সাধারণ নাম হইতে পারে না। উহাকে ইষ্টেশ্বরবাদ অর্থাৎ মনুষ্য সর্বপ্রথমে যে সকল অর্দ্ধস্পৃশ্য ও অস্পৃশ্য এক একটা পদার্থে অদৃশ্য ও অনন্ত কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহাতে বিশ্বাস ও তাহাদের পূজা, বলা যাইতে পারে। পূর্বে বলা গিয়াছে, ঐ সকল পদার্থ ক্রমে অসীম, অনৈসর্গিক ও ধারণার অতীত হয়। পরিশেষে উহা অমর, দেব ও অমর্ত্য শব্দে বিশেষিত হইতে থাকে, সর্বশেষে অমর, অনন্ত স্বরূপ হইয়া উঠে। ফলতঃ মানব-বুদ্ধির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ কল্পিত হইয়াছে, উহা তদাণুযুক্ত ঈশ্বর বলিয়া কল্পিত হয়।

ধর্মভাবের এইরূপ মনোহর ও সুন্দর কল্পনা বেদ ভিন্ন অত্র কোন ধর্মগ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। বস্তুতঃ বেদ না থাকিলে এরূপ উচ্চ কল্পনার সুন্দর নিদর্শন চিরদিনই অবিদিত থাকিত।

### সূর্যের স্বাভাবিক অবস্থা ।

নৈসর্গিক পদার্থ যে, অনৈসর্গিক ও অবশেষে স্বর্গীয় পদার্থে পরিবর্তিত হইয়াছে, সূর্য্য তাহার এক প্রধান উদাহরণ স্থল । সূর্য্যের বহু নাম কল্পিত হইয়াছে, যথাঃ—সবিতা, মিত্র, পুষা ও আদিত্য ইত্যাদি । এক্ষণে কিরূপে এই সমস্ত নামের প্রত্যেকটী স্বাধীনরূপে কোন না কোন একটী সচেষ্ট জীবন্ত ভাবপূর্ণ ব্যক্তিস্বরূপ হইয়া উঠে, তদ্বিষয় আলোচনা করা বড়ই প্রীতিকর কার্য্য । বৈদিক ধর্ম্মের অনুশীলন সময়ে উহাদের প্রত্যেকটীকে অপরাপর গুলি হইতে পরস্পর যত দূর সম্ভব, পৃথক রাখা উচিত । উহারা কিরূপে এক সাধারণ আদি মূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং সর্ব্বপ্রথমে কিরূপে একই পদার্থকে বুঝাইত, আমাদিগের পক্ষে তাহাই অনুসন্ধান করা সমধিক প্রয়োজনীয় ।

সবিতা, মিত্র প্রভৃতির মধ্যে যে কোন নামে সচরাচর সূর্য্যের যে সমস্ত বর্ণনা দেখা যায়, যে কোন ব্যক্তির কবি-কল্পনা বোধ আছে, তিনি তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারেন । সূর্য্য আকাশের পুত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (১) । উষা তাহার স্ত্রী (২) ও কণ্ঠা (৩) উভয় নামেই বিশেষিত হইয়াছেন । উষা আকাশের কণ্ঠা (৪) বলিয়া উক্ত হওয়ায় তাহাকে সূর্য্যের ভগিনী বলিয়াও নির্দেশ করা যাইতে পারে । আবার ইন্দ্রকে কখন সূর্য্য ও উষা, উভয়েরই পিতা বলিয়া উক্ত হইতে দেখা যায় (৫) । অন্যপক্ষে উষা আবার সূর্য্যের প্রসূতি বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (৬) । এই গুলি পুরাণ-গঠনের যথেষ্ট উপাদান । যাহা হউক আপাততঃ এতদ্বিষয়ক সবিস্তার বিবৃতি নিম্নয়োজন ।

গ্রীক কবিতায় সূর্য্যের যেমন রথ কল্পিত হইয়াছে, বেদেও সেইরূপ

১ । ঋগ্বেদ, ১০ম, ৩৭, ১, দিবঃ পুত্রয়ঃ সূর্য্যস্ত সংসত ।

২ । ঐ ৭ম, ৭৫, ৫, সূর্য্যস্ত যোষা ।

৩ । ঐ, ৪র্থ, ৪৩, ২, সূর্য্যস্ত দুহিতা ।

৪ । ঐ, ৫ম, ৭৯, ৮, দুহিতা দিবঃ ।

৫ । ঐ, ২য়, ১২, ৭, যঃ সূর্য্যং য উষসং জজান ।

৬ । ঐ, ৭ম, ৭৮, ৩, অজীজনং সূর্য্যং যজ্ঞং অগ্নিম্ ।

এক (১) বা সপ্তাশ্বযুক্ত রথ কল্পিত দেখা যায় (২)। নানা রূপ বিভিন্নতা থাকিলেও এই সপ্ত হরিংযুক্ত রথকে গ্রীক রথের প্রতিক্রম বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সূর্য্য দেবতাদিগের মুখ (৩) এবং মিত্র, বরুণ ও অগ্নি প্রভৃতি সাকার দেবগণের চক্ষু বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (৪)। তিনি তাঁহার অশ্বগণকে যান হইতে মুক্ত করিলে পর রাত্রি তাহার আবরণ বিস্তার করিয়া থাকে (৫)। সূর্য্যের এইরূপ উপাখ্যান প্রায় সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

সূর্য্য প্রসবিতা (৬) নামে উক্ত হইলেও সবিতা নামে উহাকে সমধিক স্বাধীন ভাব ধারণ করিতে দেখা যায়। তিনি যখন সবিতা নামে উক্ত হন, তখন তিনি হিরণ্য রথাকৃৎ (৭), হরিং কেশ (৮), হিরণ্যহস্ত (৯), হিরণ্যপাণি (১০), হিরণ্যাক্ষ (১১), এমন কি হিরণ্যজিহ্ব (১২) ও অয়োহনু (১৩) বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকেন। তিনি পিঙ্গলবর্ণ বস্ম (১৪) ধারণ করিয়া অরেণু পথে পরিভ্রমণ করেন (১৫)।

- 
- |    |        |  |
|----|--------|--|
| ১  | ঋগ্বেদ | ৭ম, ৬৩, ২, যৎ এতসঃ বহতি।   |
| ২  | ঐ,     | ১ম, ১১৫, ৩, অশ্বা হরিতঃ সূর্য্যাস্ত। ৭ম, ৬০, ৩, অযুক্ত সপ্ত হরিতঃ। |
| ৩  | ঐ,     | ১ম, ১১৫, ১, চিত্রং দেবানাং উদগাৎ অনীকম্।                           |
| ৪  | ঐ,     | ১ম, ১১৫, ১, চক্ষুষঃ মিত্রস্ত বরুণস্ত অগ্নেঃ।                       |
| ৫  | ঐ,     | ১ম, ১১৫, ৪,।   |
| ৬  | ঐ,     | ৭ম, ৬৩, ২, প্রসবিতা যজ্ঞানাম্।                                     |
| ৭  | ঐ,     | ১ম, ৩৫, ২, হিরণ্যয়েন সবিতা বথেন।                                  |
| ৮  | ঐ,     | ১০ম, ১৩৯, ১, হরিংকেশঃ।   |
| ৯  | ঐ,     | ১ম, ৩৫, ১০, হিরণ্যহস্তঃ।   |
| ১০ | ঐ,     | ১ম, ৩২, ৫, হিরণ্যপাণিঃ।  |
| ১১ | ঐ,     | ১ম, ৩৫, ৮, হিরণ্যাক্ষঃ।  |
| ১২ | ঐ,     | ৬ষ্ঠ, ৭১, ৩, হিরণ্যজিহ্বঃ।   |
| ১৩ | ঐ,     | ৬ষ্ঠ, ৭১, ৪, অয়োহনুঃ।   |
| ১৪ | ঐ,     | ৪র্থ, ৫৩, ২, পিসঙ্গং ত্রাপিং প্রতিমুক্তে কবিঃ।                     |
| ১৫ | ঐ,     | ১ম, ৩৫, ১১, পশ্বা অরেণবঃ।  |

সূর্য্যের আর একটি নূতন নাম মিত্র (১)। তিনি প্রভাতের বা দিবাব দীপ্তিমান-ও প্রকুল সূর্য্য (২)। আধুনিক ভাষাতেও দিবা ও সূর্য্যের একই অর্থ দৃষ্ট হয়। কখন কখন কোন কবি সবিতাকে মিত্র বলিয়াছেন (৩) অন্ততঃ তাঁহার মতে সবিতা ও মিত্র একই কার্য্য করিয়া থাকেন। মিত্রকে প্রায়ই বরুণের সহিত একত্র সমাহৃত হইতে দেখা যায়। উভয়েই এক রথাসীন; ঐ রথ উষার আগমনে স্বর্ণবর্ণ এবং সূর্য্যাস্তসময়ে লৌহবর্ণ হয় (৪)।

সূর্য্যের অপর একটি নাম বিষ্ণু। বিষ্ণুও যে, আদৌ সৌর দেবতা ছিলেন, তাহা তাঁহার ত্রিপদ (৫) হইতে প্রতীয়মান হইতেছে। প্রভাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াক্লে এই ত্রিকালে অবস্থান তাঁহার ত্রিপদ। কিন্তু তাঁহার স্বর্গীয় কার্য্য-গৌরবে শেষে তদীয় এই নৈসর্গিক চরিত্র শীঘ্রই তিরোহিত হয়।

পুষার অবস্থা আবার অতীব হীন। মেষপালকদের দৃষ্টিতে তিনিও আদৌ সূর্য্য ছিলেন। তিনি অজাশ্ব (৬) (অর্থাৎ অজাগণ তাঁহার অশ্ব ছিল), পশু-চালনার দণ্ড-ধারী (৭) এবং হিরণ্যবাসী (৮) বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

১ মিত্র—মিৎ-ত্র—বৈয়াকরণদিগের মতে মিদ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। এই ধাতুর অর্থ, স্থূল হওয়া, স্থূল করা, দীপ্ত করা, আনন্দিত করা, ভালবাসা। মিহ্ ধাতুতেও এই সকল অর্থ পাওয়া যায়। মিদ্ ধাতু হইতে মেদ, মেদিন্ সিদ্ধ হইয়াছে। অথর্ববেদ ১০ম, ১, ৩৩, সূর্য্যোণ মেদিনা। উক্ত বেদের ৫ম, ২০, ৮ শ্লোকের ইন্দ্রমেদী ও ঋগ্বেদের ৭ম, ৩৭, ২৪ শ্লোকোক্ত ইন্দ্রসখার অর্থ এক।

২ অথর্ববেদ, ১৩শ, ৩, ১৩, স বরুণঃ সায়ং অগ্নির্ভবতি স মিত্রো ভবতি প্রাতঃকদান্, স সবিতা ভূতান্তরীক্ষেণ যাতি স ইন্দ্রো ভূহা তপতি মধ্যতো দিবম্ ; ঋগ্বেদ, ৫ম, ৩ দেখ।

৩ ঋগ্বেদ, ৫ম, ৮১, ৪, উত মিত্রঃ ভবসি দেবধর্ম্মভিঃ।

৪ ঐ ৫ম, ৬২, ৮, হিরণ্যরূপং উষসঃ ব্যাষ্টৌ অয়ঃস্থনং উদিতা সূর্য্যাস্য। হিবণ্য-রূপ সূবর্ণবর্ণ এবং অয়ঃস্থন লৌহযুগ, এই দুইটী ভিন্নার্থবোধক শব্দ। সূর্য্যোদয়কালে প্রভাতের বর্ণ সূবর্ণবর্ণের ন্যায় এবং সূর্য্যাস্ত সময়ে সন্ধ্যাকাল অন্ধকাসময় হয় বলিয়া, উহা লৌহবর্ণের ন্যায় কল্পিত হইয়াছে। যেখানে অয়োহনু অর্থাৎ লৌহময় হনু উল্লিখিত হইয়াছে, সেখানে শক্তি অর্থ বুঝাইয়া থাকে।

৫ ঐ, ১ম, ২২, ১৭ ; ১ম, ১৫৪।

৬ ঐ, ৬ষ্ঠ, ৫৮, ২, অজাশ্বঃ।

৭ ঐ, ৬ষ্ঠ, ৫৩, ৯, যা তে অস্ত্রা গুপসা আয়ুণে পশুসাধনী।

৮ ঐ, ১ম, ৪২, ৬, হিরণ্যবাসীমন্তম।



সূর্য্য তাঁহার ভগিনী বা প্রিয়তমা (১)। সূর্য্য বা উষা এস্থলে স্ত্রী দেবতা বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। অত্যাশ্রয় সৌর দেবতার স্থায় তিনিও সর্ব্ব-দর্শন-ক্ষম বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (২)।

আদিত্য শব্দটী শেষে সূর্য্যেরই সাধারণ নাম হইয়া উঠে। বেদে ঐ নাম কতগুলি সৌর দেবতার সাধারণ সংজ্ঞা রূপেই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়াছে; যথা, সূর্য্যও আদিত্য, সবিতাও আদিত্য, এবং মিত্রও আদিত্য। ঋগ্বেদের শেষ ভাগে উহা সামান্যতঃ সূর্য্য অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে (৩)।

এই সকল বিষয় চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই সহজে বোধ্য। আমরা ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় নানা শাস্ত্র ও পুরাণ পাঠে ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি।

### সূর্য্যের অনৈসর্গিক শক্তি-কল্পনা।

স্থানে স্থানে একরূপ দৃষ্ট হয় যে, বৈদিক স্তোত্রকারগণ সূর্য্যকে কেবল আকাশ-পবিভ্রমণকারী দীপ্তিমান দেবতা না বলিয়া সমধিক গুরুতর কার্য্যের সম্পাদক বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এমন কি সূর্য্য জগতের স্রষ্টা, কর্তা ও বিধাতা বলিয়াও উক্ত হইয়াছেন।

যে ক্রমোন্নতি-পরম্পরায় সূর্য্য একটী জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ হইতে ক্রমে পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, পালন-কর্তা, শাসন-কর্তা ও পুরস্কার-দাতা, সংক্ষেপে স্বর্গীয় ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদার্থে পরিণত হইয়াছেন, আমরা বেদের স্তোত্র পাঠে তাহা জানিতে পারি।

প্রথমতঃ আমরা সূর্য্যের সামান্য আলোক-মহিমা ভুলিয়া, যে আলোক মানব ও সর্ব্বজগৎকে নব জীবন প্রদান করে, তাহারই স্তুতি করি। স্মরণ্য যিনি প্রভাতে আমাদিগকে জাগৃত ও সকল প্রকৃতিকে নবজীবনে আহূত করেন, তিনি ‘দৈনিক জীবন দাতা’ বলিয়া অবশ্যই উল্লিখিত হইতে পারেন।

১ ঋগ্বেদ, ৬ষ্ঠ, ৫৫, ৪।

২ ঐ, ৩য়, ৬২, ৯।

৩ ঐ, ১ম, ৫০, ১৩।



দ্বিতীয়তঃ দৈনিক আলোক ও জীবন-দাতা সাধারণতঃ আলোক ও জীবন-দাতা হইয়া উঠেন। প্রতিদিন যিনি আলোক ও জীবন দেন, সৃষ্টির প্রথম দিনেও তিনিই জীবন ও আলোক আনয়ন করিয়াছিলেন। আলোক যেমন জীবনের প্রারম্ভ, সেইরূপ উহা সৃষ্টিরও প্রারম্ভ, সুতরাং সূর্য কেবল আলোক ও জীবন-দাতা না হইয়া সৃষ্টিকর্তা রূপে স্তুত হন। যদি সৃষ্টিকর্তা হইলেন, তবে শাসন ও পালন-কর্তা বলিয়াও স্তুত হইতে পারেন।

তৃতীয়তঃ সূর্যের ভয়ঙ্কর অন্ধকার নাশকরণ ও পৃথিবীর উর্বরতা-সম্পাদন-শক্তি আছে বলিয়া তিনি জীবলোকের রক্ষা-কর্তা ও আশ্রয়-দাতা রূপে কল্পিত হন।

চতুর্থতঃ সূর্য ভাল মন্দ সকলই দেখিয়া থাকেন, সুতরাং পাপাচারীকে ইহা বলা অস্বাভাবিক নহে যে, সূর্য তোমার দুষ্ক্রিয়া দেখিতেছেন এবং নিরীহ নিরপরাধীর নৈরাশ্র কালে সূর্যকে এরূপ স্তুতি করা ও অস্বাভাবিক নহে যে, “হে সূর্য! তুমি আমার নিরপরাধের সাক্ষী”। বাইবেলে উক্ত আছে—“যাহারা প্রভাতের প্রতীক্ষা করেন, আমার আত্মা তাহাদের অপেক্ষাও অধিকতররূপে ঈশ্বরের প্রতীক্ষা করিতেছে” (সাম ১৩০, ৬)।

এক্ষণে এই সমস্ত সম্পূর্ণ স্বাভাবিক পরিবর্তনের প্রত্যেকটী স্পষ্টরূপে দেখাইতে হইলে কতিপয় স্থানের সমালোচনা করা আবশ্যিক। সূর্যের সবিতা বলিয়া যে একটি নামের উল্লেখ আছে, তাহার প্রকৃত অর্থ জ্ঞান-দাতা। সূর্য “জ্ঞানানাং প্রসবিতা” বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (১)।

ঋগ্বেদের ৭ম, ৬৩, ১ কবিতায় উল্লেখ আছে :—

“সুখদাতা, সর্বদ্রষ্টা সূর্য উদিত হইতেছেন। তিনি সকলের প্রতিই এক ভাবাপন্ন। তিনি মিত্র ও বরুণের চক্ষু স্বরূপ। যে দেব চক্ষের ন্যায় তিমিরকে লুণ্ঠন করিয়াছেন।

পুনশ্চ ৭ম, ৬৩, ৪ কবিতায় :—

“দীপ্তিমান সূর্য সর্বত্র কিরণ-জাল বিস্তার করিয়া আকাশ হইতে উঠিতেছেন। তিনি আলোকে পূর্ণ হইয়া দূরদেশে কার্যে যাইতেছেন। মনুষ্যও তাঁহার আলোকে প্রদীপ্ত হইয়া নিজ নিজ স্থানে নিজ কার্যে রত হউক।”

অপর একটি স্তোত্রে ( ৭ ম, ৬০, ২ ) সূর্য্য এই বলিয়া স্তুত হইয়া-  
ছেন—“তুমি সচল, অচল ও অস্তিত্ববান সকল পদার্থের রক্ষা কর্তা।”

সর্বদাই সূর্য্যের সর্বদর্শন-শক্তির উল্লেখ দেখা যায়। নক্ষত্রগণ সর্বদ্রষ্টা  
সূর্য্যকে দেখিয়া তঙ্করের ত্রায় পলায়ন করে (১)। সূর্য্য মনুষ্যের সৎ  
ও অসৎ কার্য্য দেখিতে পান (২)। যিনি এইরূপে জগতের সমস্ত  
বিষয় দেখিতে পান, তিনি মনুষ্যের মনের সমস্ত ভাবও জানিতে  
পারেন (৩)।

সূর্য্য যদি সমস্ত বিষয় দেখিতে পান ও সমস্ত বিষয় জানেন, তবে  
তিনি কেবল একাকী যাহা অবগত আছেন এবং যাহা দেখিয়াছেন, তাহা  
ভুলিতে ও তাহার জ্ঞান ক্ষমা করিতে স্তুত হইতেও পারেন।

ঋগ্বেদে এইরূপ উক্তি ( ৪র্থ, ৫৪, ৩ ) আছে, “আমরা আমাদের  
নির্বুদ্ধিতা, ভ্রম, অহঙ্কার ও মনের প্রকৃতি বশতঃ স্বর্গীয়গণের সমক্ষে যে  
কিছু অপরাধ করিয়াছি, হে সবিতঃ! তজ্জ্ঞাত আমাদের দেবতা ও  
মনুষ্যের সমক্ষে নিরপরাধ হইতে দিন।”

“পীড়া ও দুঃস্বপ্ন দূরীকরণ জ্ঞাতও সূর্য্য স্তুত হইয়া থাকেন (৪)।  
সূর্য্যোদয়-কালে অবদ্য হইতে ও পাপ হইতে মনুষ্যকে মুক্ত করিবার জ্ঞাত  
অগ্ন্যাত দেবতারাও এইরূপ স্তুত হন (৫)।

১ ঋগ্বেদ ১ম, ৫০, ২।

২ ঐ, ৭ম, ৬০, ২।

৩ ঐ, ৭ম, ৬১, ১।

৪ ঐ, ১০ম, ৩৭, ৪,

যেন সূর্য্য জ্যোতিষা বাধসে তমঃ,

জগৎ চ বিশ্বং উদীয়ধি তামুনা,

তেন অশ্মৎ বিশ্বং অনিরাং ; অনাহুতিং,

অপ অমীবাং অপ দুঃস্বপ্নাং শুব।

হে সূর্য্য! তুমি যে আলোক দ্বারা অন্ধকার পরাজিত ও জগৎ জাগরিত কর, সেই  
আলোকে আমাদের সমুদয় দুর্বলতা, সমুদয় ঔদাসীনা, সমুদয় রোগ ও সমুদায় নিদ্রাভাব  
দূরীভূত করিয়া দাও।

৫ ঐ, ১ম, ১১৫, ৬।

এইরূপে সূর্য্য নানা গুণে জীবনদাতা ও রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া স্তুত হইয়া ক্রমে জগতের ও সমস্ত স্থিতিশীল বিষয়ের প্রাণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন (১)। পরিশেষে একবারে সৰ্ব্বস্রষ্টা বিশ্বকৰ্ম্মা (২) ও জীবমাত্রেয়ই প্রভু স্বরূপ প্রজাপতিরূপে উক্ত হইয়াছেন। কোন কবি লিখিয়াছেন (৩), “সবিতা পৃথিবীকে রজ্জুবদ্ধ করিয়াছেন, তিনি স্বৰ্গ নিরবলম্বনে রাখিয়াছেন।” সবিতা স্বর্গের অবলম্বন ও জগতের প্রজাপতি (৪)। তিনি সূৰ্য্যকেশ সূর্য্যদেবের ঞায় পিঙ্গলবর্ণ বর্ষ্ম-পরিহিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

অন্য কোন কবি সূর্য্যকে স্বর্গের অবলম্বন ও সত্যকে জগতের অবলম্বন স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন (৫)। এইরূপে পরিশেষে সূর্য্যের গুণবাচক সংজ্ঞা ক্রমেই উচ্চতম হইয়া উঠিয়াছে। সূর্য্য দেবতাগণের দেবতা (৬) ও স্বর্গীয়-গণের এক মাত্র নেতা বা পরিচালক (৭) বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

সবিতাতে ব্যক্তিগত ও স্বর্গীয় উপাদান যে, ক্রমেই প্রচুর পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি স্থলেই তাহা স্পষ্ট দেখান গিয়াছে। আর কয়েকটি স্থলে ইহা আরও পরিষ্কার দেখা যায়। সবিতা জগতের একমাত্র শাসন-কর্ত্তা (৮)। তিনি যে সমস্ত নিয়ম প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা অতি

১ ঋগ্বেদ ১ম, ১১৫, ১, সূর্য্যঃ আস্মা জগতঃ তস্থুষশ্চ।

২ ঐ, ১০ম, ১৭০, ৪।

৩ ঐ, ১০ম, ১৪৯, ১।

সবিতা যষ্ট্রৈঃ পৃথ্বীং অরংমাৎ

অস্কম্বনে সবিতা দ্যাং অদৃংহৎ।

৪ ঐ, ৪র্থ, ৫৩, ২, দিবঃ ধার্ত্তা ভুবনস্য প্রজাপতিঃ।

৫ ঐ, ১০ম, ৮৫, ১, সত্যেন উত্তভিতা ভূমিঃ সূর্য্যেণ উত্তভিতা দ্যৌঃ।

৬ ঐ, ১ম, ৫০, ১০,

উত বয়ং তমসঃ পরিজ্যোতিঃ পশ্যন্তঃ উত্তরম্

দেবং দেবত্র সূর্য্যং অগন্ম জ্যোতিঃ উত্তমম্।

অন্ধকারের মধ্যে আলোকের ক্রমশঃ উৎকর্ষ দেখিয়া আমরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট আলোক, দেবতার দেবতা, সূর্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়াছি।

৭ ঐ, ৮ম, ১০১, ১২, মত্না দেবানাং অসূর্য্যঃ পুরোহিতঃ।

৮ ঐ, ৫ম, ৮১, ৫

দৃঢ় (১) । অত্যাশ্রিত দেবতাগণ তাঁহার কেবল উপাসনা করিয়াই ক্ষান্ত হন না (২), তাঁহারা তাঁহাকে আপনাদের নেতা বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাঁহার অনুবর্তী হইয়া চলেন (৩) । একস্থলে এরূপ কথিত হইয়াছে যে, তিনি দেবতাগণকে অমরত্ব (৪) ও মনুষ্যকে জীবন দান করিয়াছেন অর্থাৎ দেবগণের অমরত্ব ও মনুষ্যের জীবন উভয়েই সবিতৃসাপেক্ষ (৫) । এমন কি, যে গায়ত্রী ছন্দ সমগ্র বেদের মধ্যে অতি পবিত্র, তাহা সবিতার উদ্দেশে সম্বোধিত হইয়াছে :—  
আমরা সবিতৃদেবতার সেই বরণীয় তেজ ধ্যান করি ; তিনি আমাদের মনকে উত্তেজিত করুন । (৬)

কখন কখন পৃথাকেও গ্রাম্য সৌর দেবতার সীমা অতিক্রম করিয়া উঠিতে

১ ঋগ্বেদ ৪র্থ, ৫৩, ৪

অদাত্যঃ ভুবনানি প্রচাক্ষণঃ

ত্রতানি দেবঃ সবিতা অভিরক্ষতে ।

২ ঐ, ৭ম, ৩৮, ৩

অপি স্তুতঃ সবিতা দেবঃ অস্ত

যং আ চিৎ বিধে বসবঃ গৃণন্তি ।

৩ ঐ, ৫ম, ৮১, ৩,

যস্য প্রয়াণঃ অমু অন্যো ইৎ যযুঃ

দেবা দেবস্য মহিমানং ওজসা ।

৪ ঐ, ৪র্থ, ৫৪, ২ ।

দেবেভ্যো হি প্রথমং জজ্ঞীয়েভ্যঃ

অমৃতত্বং শুবসি ভাগং উত্তমম্ ।

আৎ ইৎ দামানং সবিত বিউণ্ণুষে

অনুচীনা জীবিতা মানুষ্যেভ্যঃ ।

তুমি উপাসক দেবগণকে তোমার সর্বোৎকৃষ্ট দান—অমরত্ব দিয়াছ, হে সবিতঃ ! শেষে তুমি মনুষ্যদিগকে জীবন দিয়াছ ।

৫ যখন আমরা দেখি সবিতা ঋতুদিগকে অমরত্ব দিয়াছেন, তখন অম্যরূপ বৃত্তিতে হইবে । ঋতুগণ প্রথমে মনুষ্য বলিয়াই পরিচিত হন ।

৬ ঋগ্বেদ, ৩য়, ৬২, ১০, তৎসবিতুর্করৈণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ ।

দেখা যায়। এক স্থলে তিনি “মর্ত্যগণের শ্রেষ্ঠ ও দেবতাগণের সমান” (১) বলিয়া উক্ত হইলেও অন্যত্র “সচল ও অচল পদার্থের প্রভু” (২) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। অত্যাশ্চর্য্য সৌর দেবতাদের দ্বারা তাঁহার ও সর্ব-দর্শন-শক্তি কল্পিত হইয়াছে। সবিতার ন্যায় তিনিও মর্ত্যগণের মরণান্তে তাহাদের আত্মাকে সুখময় স্বর্গধামে লইয়া যান (৩)।

এইরূপে মিত্র ও বিষ্ণুও যে, প্রাধাত্যের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাহা সকলেরই বিদিত আছে। মিত্র, পৃথিবী ও আকাশ হইতেও মহৎ (৪)। তিনি দেবগণের আশ্রয়ের নিদান-ভূত (৫)। বিষ্ণু সকল ভুবনের পালন-কর্ত্তা (৬)। তিনি যুদ্ধকার্য্যে ইন্দ্রের সহচর (৭)। অদ্যাবধি কেহ তাঁহার মহিমার অন্ত পায় নাই (৮)।

১। ঋগ্বেদ ষষ্ঠ, ৪৮, ১৯, পরোহি মর্ত্যোঃ অসি সমো দেবৈঃ।

২। ঐ, ১ম, ৮৯, ৫, তং ঈশানং জগতঃ তস্মৈ পতিং।

৩। ঐ, ১০ম, ১৭, ৩।

৪। ঐ, ৩য়, ৫৯, ৭।

৫। ঐ, ৩য়, ৫৯, ৮, স দেবান্ বিশ্বান্ বিতর্তি।

৬। ঐ, ১ম, ১৫৪, ৪,

য উ জিধাতু পৃথ্বীং উত দ্যাং একঃ দধার ভুবনানি বিশ্বা,

যিনি তিন স্থানে পৃথিবী ও আকাশ রক্ষা করিতেছেন, যিনি একাকী সমুদয় জীব পালন করিতেছেন।

৭। ঐ, ৬ষ্ঠ, ৬৯।

৮। ঐ, ৭ম, ৯৯, ২,

ন তে বিক্ষেপ জায়মানো ন জাতঃ

দেবমহিমঃ পরং অন্তং আপ,

অন্তভূনাঃ নাকং ঋষং বৃহস্তুং

দাদর্থ প্রাচীং ককুভং পৃথিব্যাঃ।

হে দেব! এখন যাহারা জীবিত আছে, এবং পূর্বে যাহারা জীবিত ছিল, তাহারা কেহই তোমাব্য মহত্বের অন্ত পায় নাই; তুমি উজ্জ্বল ও মহৎ আকাশ রক্ষা করিতেছ, তুমি পৃথিবীর পূর্ব অংশ ধারণ করিয়া রহিয়াছ।

### সূর্য্যের দ্বিতীয় অবস্থা ।

যদি আমরা বেদের ধর্ম-সম্বন্ধীয় কবিতাব সম্বন্ধে ইহা ছাড়া আর কিছু না জানিতাম, তাহা হইলে সূর্য্যের উপাসনা ও স্তোত্রাদি পাঠ করিয়া আমরা এমন মনে করিতাম যে, প্রাচীন পণ্ডিতগণ এক সূর্য্যকেই তাঁহাদের প্রধান দেবতা বলিয়া না না নামে পূজা করিতেন । আমাদের এরূপ সিদ্ধান্তও হইত, যে, তাঁহারা একেশ্বরের উপাসক বা অদ্বৈতবাদী ছিলেন । কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম । বস্তুতঃ এস্থলে সূর্য্যের প্রধান দেব-চরিত্র কল্পিত হইয়াছে । কিন্তু পূর্বে যে কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, অগ্ন্যাত্ত দেবতার ও রূপ চরিত্র কল্পিত না হইয়া কেবল সূর্য্যেরই শ্রেষ্ঠত্ব কল্পিত হইয়াছে । এসম্বন্ধে সূর্য্যকে জুপিতর ও জিউস্ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয় । বৈদিক কবিগণ যে সূর্য্যকে একবার সমস্ত বস্তুর স্রষ্টা ও প্রতিপালক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, পরক্ষণেই আবার সেই সূর্য্যকেই সাগর-সন্তান, উষা-প্রসূত ও অগ্ন্যাত্ত দেবতাদের ত্রায় একটি সামান্য দেবতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ।

প্রাচীন বৈদিক ধর্মের এই বিশেষ প্রকৃতিকে ঈশ্বরবাদ বলা গিয়াছে । অর্থাৎ ইহা একটি স্বপ্রধান দেবতাতে বিশ্বাস । কিন্তু অনেকেশ্বরবাদ কিংবা বহুদেবোপাসনা-প্রথা এরূপ নহে ; ইহাতে সমস্ত দেবতাই কোন এক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতার অধীন বলিয়া পরিগণিত হন এবং একের শ্রেষ্ঠত্ব কল্পিত হওয়ায় দ্বিতীয়ের অভাবও পূর্ণ হইয়া থাকে । বেদে এক দেবতার পর অপর দেবতার উপাসনা দেখা যায় । এই উপাসনাকালে স্বর্গীয় দেবতার সম্বন্ধে যাহা বলা যাইতে পারে, উপাস্য দেবতায় তাহার সমস্তই আরোপিত হইয়া থাকে । কবি যখন কোন দেবতাকে সম্বোধন করিয়াছেন, তখন যে, তিনি অগ্ন্যাত্ত কোন দেবতাকে জানিতেন, এমন বোধ হয় না । কিন্তু স্তোত্রসংগ্রহ-মধ্যে কখন কখন একই স্তোত্রে অগ্ন্যাত্ত দেবতারও উল্লেখ দেখা যায় । ইহারাও যথার্থ স্বর্গীয় । ফলতঃ এইরূপে উপাসকের দৃষ্টি যেন হঠাৎ পরি-বর্তিত হইয়া উঠিত এবং যিনি এক সময়ে স্বর্গ ও পৃথিবীর শাস্তা সূর্য্য ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইতেন না । তিনি পরক্ষণেই আবার স্বর্গ ও পৃথিবীকে সূর্য্যের ও অগ্ন্যাত্ত দেবতার পিতা মাতারূপে দেখিতে পাইতেন ।

ধর্ম-ভাবের এরূপ অবস্থার মধ্যে প্রবেশ করা আমাদের পক্ষে কঠিন বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া এই অবস্থা কখনই বোধের অগম্য নহে। যখন স্বর্গীয়ের ধারণা এপর্যন্ত নির্দ্ধারিত ও স্থিরীকৃত না হইয়া ক্রমেই উন্নতির অভিমুখে বর্দ্ধিত হইতেছিল, তখন এরূপ অবস্থাকে অবশ্যস্তাবী বলিতে হইবে। কবিগণ সূর্য্য অসাধারণ ক্ষমতা আরোপ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা অত্যাশ্চর্য্য ভৌতিক পদার্থেও ঠিক ঐরূপ শক্তির কল্পনা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। পর্ব্বত, বৃক্ষ, নদী, পৃথিবী, আকাশ, অগ্নি ও বায়ু প্রভৃতির যতদূর গুণ কীর্তন করা সম্ভব, ততদূর করাই তাহাদের উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছিল। এইরূপ সর্বোচ্চ গুণ-কীর্তন হইতেই উহার প্রত্যেকটি একে একে সর্বোচ্চ শক্তি-সম্পন্ন হইয়া উঠে। কিন্তু তাঁহারা যে, সকলকেই ঈশ্বর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন, এরূপ বলিলে তাঁহাদের উপর মানসিক দোষের আরোপ করা হয়। যে হেতু উক্তরূপ গুণ-কীর্তন-সময়ে তাঁহারা ওরূপ কোন শব্দের বা ভাবের অধিকারী হন নাই। তাঁহারা এই সমস্ত স্বাভাবিক ব্যাপার বা পদার্থে নিঃসন্দেহ কোন অদৃষ্ট পদার্থের অন্বেষণ করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে তাহাকেই তাঁহারা স্বর্গীয় বলিয়াছেন। প্রথমে তাঁহারা তাঁহাদের উপাস্ত পদার্থে সর্বোচ্চ বিশেষণের আরোপ করিয়াই পরিতৃপ্ত থাকিতেন। এই বিশেষণের আরোপ করিবার পর বা আরোপ করিতে করিতে, যে সমস্ত বিশেষণ উপাস্ত পদার্থ মাত্রেরই প্রযুক্ত হইত, তাহার মধ্যে কতকগুলি স্বাধীন ভাব ধারণ করে। যাহাকে আমরা স্বর্গীয় বলি, প্রথমে তাহার অনুভূতি এইরূপে জন্মে। যদি পর্ব্বত, নদী, আকাশ, সূর্য্য প্রভৃতি অস্বর, অজর, অমর্ত্য বা দেব বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে কিছুকাল পরে ঐ সমস্ত বিশেষণ শব্দ একশ্রেণীর জীবের নাম হইয়া উঠিবে, এবং উহা কেবল তাহাদের জীবনী-শক্তি, তাহাদের ধ্বংসের অভাব বা তাহাদের উজ্জলতা না বুঝাইয়া শব্দগুলির সমস্ত তাৎপর্য্যই প্রকাশ করিবে। অগ্নি, “দেবগণসম্বন্ধীয় বা দেবতাদিগের শ্রেণী-ভুক্ত” এইরূপ কথা, আর “অগ্নি উজ্জল” এই উক্তি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আকাশ বা সূর্য্যকে অস্বর বা অমর্ত্য বলিলে যাহা বুঝায়, আকাশ সচেতন, গমনশীল বা অবিবর্ণ এরূপ কহিলে তদপেক্ষা আরও কিছু বুঝা গিয়া থাকে। অস্বর, অজর, দেব প্রভৃতি



বিশেষণ শব্দ নানা বস্তুর একই ধর্ম প্রকাশ করিয়া থাকে। যাহারা আদিম একেশ্বরবাদের পোষকতা করিয়া থাকেন, তাহাদের যদি কেবল এইরূপ বলা অভিপ্রায় হয় যে, 'ঈশ্বর' এই শব্দ অন্বেষণ করিতে করিতে ক্রমে পাওয়া গিয়াছে এবং স্বর্গীয় এক বই দুই হইতে পারে না, তাহা হইলে এই মতের সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে।

কিরূপে এই আকাজক্ষা চরিতার্থ হইয়াছিল, এখানে তাহার অনুসন্ধান করা আমোদজনক বলিয়া বোধ হইতেছে। কয়টি ক্রম এবং কতগুলি নাম দ্বারা অনন্ত, ইন্দ্রিয়ের আয়ত্ত হইল, অজ্ঞাত কিরূপেই বা নামযুক্ত হইয়া উঠিল, এবং পরিশেষে স্বর্গীয় কি রূপে পাওয়া গেল, তাহা জানা উচিত হইতেছে। বেদে যাহারা দেবতা বলিয়া উক্ত হইয়াছে, অনেক স্থলে তাহারা গ্রীক দেবতা নহে। কারণ গ্রীকেরা হোমরের সময় হইতেই একরূপ সন্দেহ করিতে আরম্ভ করে যে, আপাততঃ যাহাদিগকে দেবতা বলা যায়, তাহাদের সংখ্যা ও স্বভাব যাহাই হউক না কেন, অবশু কিছু সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ—ঈশ্বরই হউক বা অদৃষ্টই হউক—আছেন, দেবতা ও মনুষ্যের এক মাত্র অদ্বিতীয় পিতা রহিয়াছেন। বেদের কোন কোন অংশে ঠিক এই ভাবের উদ্ভেদ দেখা যায়। ইহাতে আমরা মনে করি যে, গ্রীশ, ইতালি, জার্মানি প্রভৃতি দেশের গ্রায় ভারতবর্ষেও একেশ্বর-ভূষণ কেবল অনেকেশ্বরবাদ দ্বারাই পরিতৃপ্ত হইতে পারিত। কিন্তু ভারতবাসিগণের মন তাহাতে পরিতৃপ্ত হয় নাই। দ্যৌঃ, বরুণ ইন্দ্র, প্রজাপতি প্রভৃতি দেবতা হইতেও কিছু উচ্চতর পদার্থের অন্বেষণ করিতে ব্যস্ত হইয়া ভারতবাসীরা দেবগণকে অস্বীকার করিতে উদ্যত হইয়া ছিলেন। বৈদিক দেবগণের কথা-প্রসঙ্গে আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে, ভিন্ন ভিন্ন মূল হইতে উদ্ভূত হইয়া দেবতার সর্ব্বপ্রথমে নির্লিপ্ত ভাবে পাশা পাশি বর্দ্ধিত হইতেন, এবং স্বল্প প্রধান হইয়া কিছু কালের জন্য উপাসকগণের চিত্ত অধিকার করিয়া থাকিতেন। ইহা অপেক্ষা আর কিছু অধিক স্বভাবসিদ্ধ হইতে পারে না।

বৈদিক স্তোত্র পাঠের আবশ্যকতা ও আনন্দ এই যে, আধুনিক ভাষায় বেদোক্ত উচ্চ ভাবের পূর্ণতাপ্রদর্শন করা একবারে অসম্ভব। (বৈদিক কবিগণ যখন পর্ব্বতকে রক্ষা করিতে ও নদীকে জলদান করিতে সম্বোধন



করিয়াছেন, তখন তাঁহারা তাহাদিগকে দেবতা বলিয়াছেন। কিন্তু তখনও দেব শব্দ ‘উজ্জল’ অপেক্ষা আরও কিছু বুঝাইলেও ‘স্বর্গীয়’ অর্থ হইতে অনেক দূরবর্তী ছিল।) আধুনিক ভাষায় শব্দ সমূহের অর্থ নির্দিষ্ট হইয়াছে। আমরা কিরূপে আধুনিক শব্দ দ্বারা এই প্রাচীন ভাষার প্রকৃত অর্থ বিবৃত করিব? নদী পর্বত প্রভৃতি আমাদের কাছে যে রূপ, বৈদিক কবিগণের কাছেও ঠিক সেইরূপ ছিল। কিন্তু তাঁহারা উহাদিগকে সমধিক সচেতন ভাবিতেন; যেহেতু তাঁহাদের ভাষায় যে কোন বস্তুর নাম কল্পিত হইত তাহাতেই কোন না কোন মনুষ্য-সুলভ চেষ্টা বুঝাইত। তাঁহারা যখন উহাদিগকে সচেতন বলিয়া ভাবিতেন, কেবল তখনই উহারা তাঁহাদের মনে বিরাজ করিত। কিন্তু প্রকৃতির কোন কোন অংশকে সচেতন ভাবা এবং পরিশেষে তৎসমুদয়কে দেবতা বলিয়া কল্পনা করা, এই দুইয়ের মধ্যগত ব্যবধানও অধিক।) কবিগণ যখন সূর্য্যকে রথাক্রুত, স্তব্ধবর্ণ-পরিহিত ও প্রসারিত-বাহু বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তখন তাঁহারা কেবল নিজ নিজ কার্য্য প্রণালীর কথা মনে করিয়া নৈসর্গিক পদার্থে তাহারই কল্পনা করিয়াছেন মাত্র। (আমাদের নিকট যাহা কবি-কল্পনা মাত্র বলিয়া বোধ হয় তাঁহাদের নিকট তাহা প্রকৃত বলিয়া বোধ হইত।) আমরা যাহা কল্পনাময় বলিয়া ভাবি, তাহা তাঁহারা শ্রোতৃবর্গের বিশ্বাস বা হর্ষোৎপাদন মানসে নয়, কিন্তু তাহা আয়ত্ত করিতে এবং তাহার নামকরণ করিতে অসামর্থ্যপ্রযুক্ত প্রকৃত ভাবিতেন। যদি আমরা বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র প্রভৃতি প্রাচীন আৰ্য্য কবিগণকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিতাম যে, তাঁহারা সূর্য্যকে প্রকৃতই হস্তপদবিশিষ্ট মানব মনে করিতেন কি না, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই আমাদের প্রশ্ন শুনিয়া হাসিয়া বলিতেন, “যদিও তোমরা আমাদের ভাষা বুঝিতে পারিয়াছ, তথাপি আমাদের ভাব অবধারণ করিতে সক্ষম হও নাই”।

“সবিতা” শব্দে যাহা বুঝায়, প্রথমে তদপেক্ষা আর অধিক কিছু বুঝাইত না। উহা “সু” (প্রসব করা বা, জীবন দেওয়া) ধাতু হইতে নিস্পন্ন হইয়াছে। সূর্য্য অর্থে প্রযুক্ত হইলে উহা কেবল সূর্য্যের জীবনদান ও উৎকর্ষতা-বিধান-শক্তিই বুঝাইত। তৎপরে সবিতা এক দিকে যেমন কোন পৌরাণিক দেবতার নাম হয়, এবং তৎসম্বন্ধে যেমন অনেক উপাখ্যান কল্পিত হইতে

থাকে, অন্য দিকে আবার উহা তেমনি সূর্য্যের একটি প্রবাদমূলক ও নিরর্থক নাম হইয়া উঠে।

সূর্য্যসম্বন্ধে যাহা বলা হইল, সকল দেবতা না হউক অন্ততঃ বেদের অধিকাংশ দেবতার সম্বন্ধে তাহা বলা যাইতে পারে। নদী, পর্ব্বত, মেঘ, সমুদ্র, উষা, রাত্রি ও বায়ু প্রভৃতি অর্দ্ধ দেবতাগণকে কখনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতার পদবীতে উঠিতে দেখা যায়না। কিন্তু অগ্নি, বরুণ, ইন্দ্র, বিষ্ণু, রুদ্র, সোম, পর্জন্য প্রভৃতি দেবতার যেরূপ বর্ণনা দেখা যায় এবং তাহাদের প্রতি যে সমস্ত বিশেষণ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তৎসমুদয় কেবল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতার প্রতিই বক্তব্য ও নির্দেশ-যোগ্য।

### দ্যোঃ বা দীপ্তি-কারক।

এক্ষণে সমস্ত আর্য্য জাতির একটি প্রাচীন দেবতার উৎপত্তি ও ইতিহাস আলোচনা করা যাউক। বেদে এই দেবতা “দ্যোঃ” বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। গ্রীকেরা উহাকে “জিউস” বলিয়াছেন। বেদে এরূপ কোন দেবতা আছে কি না, অদ্যাপি অনেক পণ্ডিত তাহাতে সন্দেহ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ভারতের শেষ সময়ের সাহিত্যে উক্ত রূপ কোন দেবতা বা পুংলিঙ্গ কোন বিশেষ্য পদের কোন চিহ্নই নাই। “দ্যোঃ” শব্দ কেবল স্ত্রীলিঙ্গে ও আকাশ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যে দেবতা গ্রীশে “জিউস”, ইতালিতে “জুপিতর”, ইডায় “ত্যর” ও জার্মানিতে “জিও” নামে বিদ্যমান ছিলেন, বেদেও যে উক্তরূপ কোন দেবতা আছেন, বৈদিক পণ্ডিতগণ গবেষণাবলে তাহা স্থির করিতে বিমুখ হন নাই। বহুকাল অলঙ্ঘ্য থাকিবার পর প্রাচীন বৈদিক স্তোত্রে হঠাৎ উহার দর্শন-লাভ অতীব বিস্ময়-সূচক বলিয়া বোধ হয়। বেদে “দ্যোঃ” শব্দ কেবল পুংলিঙ্গ বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত না হইয়া পিতৃশব্দের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা ‘দ্যৌষ্-পিতা’ লাতিনে উহার আকার জুপিতর। গণনা দ্বারা কোন অদৃষ্ট নক্ষত্র নির্ণয় করিয়া, পরে ভাল দূরবীক্ষণের সাহায্যে তাহা অবলোকন করা, আর ‘দ্যৌষ্-পিতা’ শব্দের আবিষ্কার, একই রূপ।

যাহা হউক, বেদে দ্যৌস্ শব্দটী একটী হীনজ্যোতি নক্ষত্রের গ্রায় রহিয়াছে। সাধারণতঃ উহা আকাশ অর্থ-বাচক। কিন্তু উহার প্রকৃত অর্থ উজ্জল বা দীপ্তিমান, কারণ উহা দিব্ বা দ্যা ধাতু ( দীপ্তি পাওয়া ) হইতে সিদ্ধ হইয়াছে। দ্যৌস্ অর্থে এই জগৎ-প্রদীপ্তকরণ-চেষ্টাই প্রকটিত হইত। কিন্তু এই দীপ্তিমান্ পদার্থ কে,ঐ শব্দদ্বারা তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইত না। তিনি কোন অম্বর হইবেন, এইমাত্র বুঝা যাইত। তৎপর উহা কতক-গুলি পৌরাণিক উপাখ্যানের অন্তর্গত হইয়া উঠে এবং অবশেষে “সবিতা” শব্দের গ্রায় আকাশ-বাচক একটী নিরর্থক শব্দ হইয়া দাঁড়ায়।

এই দ্যৌঃ ( আকাশ-দীপ্তিকারক ) যে, প্রথমেই অন্ত্যাত্ম দেবতার মধ্যে প্রাধান্য স্থাপনের উপযুক্ত হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। লাতিন জুপিটার ও গ্রীক জিউস, এই উভয়ে কেমন সুন্দররূপে এইরূপ প্রাধান্য-স্থাপন সিদ্ধ হইয়াছিল, তাহাও আমরা বিদিত আছি। বৈদিক দ্যৌস্ শব্দেও ঠিক ঐ রূপ প্রবণতা দেখা যাইতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক দেবতা প্রাধান্য স্থাপনে উন্মুখ হওয়াতে, সে প্রবণতা প্রতিকূল হইয়াছিল।

পৃথিবী ও অগ্নির সহিত প্রায়ই দ্যৌঃকে আহূত হইতে দেখা যায়, যথাঃ—(ঋগ্বেদ, ৬ষ্ঠ, ৫১, ৫)

“পিতা দ্যৌঃ, দয়াবতী মাতা পৃথিবী, ভ্রাতা অগ্নি, উজ্জল বসুগণ! আপনারা আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন।”

এস্থলে দ্যৌস্ শব্দটী সর্ব প্রথমে বসিয়াছে এবং উহার সর্বপ্রাধান্য দেখা যাইতেছে; প্রাচীন স্তোত্র মাত্রেই উহার এইরূপ প্রাধান্য দেখা যায়। উহা প্রায়ই পিতা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যথাঃ—(ঋগ্বেদ, ১ম, ১৯১, ৬,) দ্যৌঃ তোমার পিতা, পৃথিবী মাতা ও সোম তোমার ভ্রাতা, অদিতি তোমার ভগিনী। কিংবা (ঋগ্বেদ ৪র্থ, ১,১০) দ্যৌঃ, পিতা, সৃষ্টিকর্তা, “দৌষ্পিতা জনিতা”।

একাকী আহূত না হইয়া দ্যৌঃ প্রায়ই পৃথিবীর সহিত একত্র আহূত হইয়া থাকে। ঐ দুটী শব্দ একত্র মিলিত হইয়া বেদে এক প্রকার দ্বিদেবতা হইয়া উঠিয়াছে যথা, দ্যাবাপৃথিবী—স্বর্গপৃথিবী।

বেদে এমন অনেক স্থল আছে, যেখানে স্বর্গ ও পৃথিবী সর্ব প্রধান দেবতা বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। অন্যান্য দেবতাগণ ইহাদের পুত্র (১)। বিশেষতঃ বেদের দুইটি প্রধান দেবতা ইন্দ্র (২) ও অগ্নি (৩) ইহাদের সম্ভান বলিয়া কথিত হইয়াছেন। এই দুই পিতা মাতা হইতেই সমস্ত জগৎ প্রসূত হইয়াছে (৪), ইহারাই উহাকে রক্ষা করিতেছেন (৫) এবং ইহারাই নিজ শক্তি দ্বারা বর্তমান সমস্ত বস্তুর পালন করিতেছেন (৬)।

স্বর্গ ও পৃথিবী, অক্ষয়, সর্বশক্তিমান, ও অনন্ত বলিয়া উক্ত হইবার পরেও হঠাৎ একরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, দেবগণের মধ্যে কোন সূনিপুণ ব্যক্তি স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃজন করিয়াছেন। এই স্বর্গপৃথিবী দ্যাবাপৃথিবী (৭) বা রোদসী (৮) বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যে ইন্দ্র একবার আকাশ ও পৃথিবীর ধাতা ও জনিতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (৯), তিনিই আবার দ্যৌঃ ও পৃথিবীর সম্ভান বলিয়া কল্পিত হইয়া থাকেন (১০)।

### দ্যৌঃ ও ইন্দ্রের মধ্যে প্রাধান্য লইয়া বিরোধ।

বেদে সর্ব প্রথমে এই দুইটি প্রধান দেবতার মধ্যে বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। আদি দেব দেবী স্বর্গ ও পৃথিবী এক দিকে, ও আধুনিক দেবতা ইন্দ্র অন্য দিকে। ইন্দ্র আদৌ বৃষ্টি-দাতা বলিয়া পরিচিত। তৎপরে অন্ধকার, রাত্রি, শীত বিশেষতঃ মেঘচোরগণের প্রতিকূলে তাঁহার দৈনিক ও বার্ষিক যুদ্ধেতু

১ ঋগ্বেদ, ১ম, ১৫৯, ১, দেবাপুত্রৈ।

২ ঐ, ৪র্থ, ১৭।

৩ ঐ, ১০ম, ২, ৭, যং ত্বা দ্যাবাপৃথিবী যং ত্বা আপঃ, ত্বষ্টা যং ত্বা সৃজনিমা জজ্ঞান।

৪ ঐ, ১, ১৫৯, ২, সুরেতসা পিতরা ভূম চক্রতুঃ।

৫ ঐ, ১ম, ১৬০, ২, পিতা মাতা চ ভুবনানি রক্ষতঃ।

৬ ঐ, ১ম, ১৮৫, ১।

৭ ঐ, ৪র্থ, ৫৬, ৩।

৮ ঐ, ১ম, ১৬০, ৪।

৯ ঐ, ৮ম, ৩৬, ৪।

১০ Lectures on the Science of Language vol. II. p. 473, note.

তাঁহার বীর-চরিত কল্পিত হয়। কথিত আছে, ইন্দ্র এই মেঘচোরদিগকে বজ্র ও বিদ্যুৎ দ্বারা পরাজিত করেন। ইন্দ্র, স্বর্গ ও পৃথিবীর পুত্র হইলেও ইন্দ্রের জন্ম সময়ে স্বর্গ ও পৃথিবী কল্পিত হইয়া উঠিয়াছিলেন (১)। আবার দেখা যায় (ঋগ্বেদ ১ম, ১, ৩১, ১) যে “দ্যৌঃ ও পৃথিবী ইন্দ্র-সমীপে মস্তক নত করিয়াছিলেন। হে ইন্দ্র আপনি স্বর্গের শৃঙ্গকে কল্পিত করিয়া থাকেন” (২)। যে বজ্রীর সমক্ষে “স্বর্গ ও পৃথিবী কল্পিত হইবে, সূর্য্য চন্দ্র অন্ধকারাবৃত হইবে এবং নক্ষত্রগণ হীনপ্রভ হইয়া পড়িবে,” তাঁহার প্রতি উক্তরূপ উক্তি অসঙ্গত নয়। কিন্তু আবার পরক্ষণেই ঐ সকল উক্তি নৈতিক ভাবে ব্যাখ্যাত হইলে, ইন্দ্রের মহত্ত্ব ও প্রাধান্য পরিষ্কৃত হয়। কোনও কবি কহিয়াছেন (৩), “ইন্দ্রের মহত্ত্ব পৃথিবী ও অন্তরীক্ষকেও অতিক্রম করিয়াছে”। অপর এক জন বলিয়াছেন, “ইন্দ্র, স্বর্গ ও পৃথিবী অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহার সহিত তুলনা করিলে উহারা তাঁহার অর্দ্ধমাত্র হইতে পারেন” (৪)।

তৎপরে আবার এই পিতাপুত্রের মধ্যো মধ্যস্থতার সম্বন্ধে অনেক কথা দৃষ্ট হয় এবং পরিশেষে দেখা যায়, ইন্দ্র বজ্র ও বিদ্যুতের বলে তাঁহার পিতা প্রসন্ন আকাশ হইতে শ্রেষ্ঠ, মাতা অচলা পৃথিবী হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং অগ্ন্যাগ্নি দেবতা হইতেও শ্রেষ্ঠ। কোন কবি বলিয়াছেন—“অগ্ন্যাগ্নি দেবতাগণ জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের গায় দুরীভূত হইয়াছেন, ইন্দ্র আপনি সকলের রাজা হইয়াছেন (৫)।” ইন্দ্র কি রূপে যে, একটী প্রধান দেবতা হইয়া উঠেন, তাহা ইহাতে বুঝা যাইতেছে আবার একজন স্তোত্রকার বলিয়াছেন, “আপনার উপর আর কেহ নাই আপনার গায় বা আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই” (৬)। অতএব এখন বেদের অধিকাংশ স্থলেই ইন্দ্রকে সর্বপ্রধান দেবতা বলিয়া উল্লিখিত দেখা যাইতেছে। তথাপি গ্রীক জিউসের প্রাধান্যের

১ Lectures on the Science of Language, vol. II. p. 473.

২ ঋগ্বেদ, ১ম, ৫৪, ৪।

৩ ঐ, ১ম, ৬১, ২।

৪ ঐ, ৬ষ্ঠ, ৩০, ১।

৫ ঐ ৪র্থ, ১২, ২।

৬ ঐ, ৪র্থ, ৩০, ১।

সহিত তাঁহার প্রাধান্যের তুলনা হইতে পারে না। অত্যাশ্রয় দেবগণকেও তাঁহার অধীন কি সমকক্ষ বলা যাইতে পারেনা। যদি কোন কোন স্থলে অনেক দেবতার একত্র অবস্থান দৃষ্ট হয় এবং কতকগুলি দেবতাকে বিশেষতঃ ইন্দ্রকে অত্যাশ্রয় দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইতে দেখা যায়, তথাপি ঐ সকল দেবতার আপনার পূজা পাইবার এক একটা দিন আছে। যেখানে তাঁহারা বরদান জন্ত স্তুত হইয়াছেন, সেখানেই স্তোত্রের ভাষা তাঁহাদের জ্ঞান ও শক্তির গৌরব বর্ধন জন্য উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে আরোহণ করিয়াছে।

### শ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া ইন্দ্রের স্তোত্র।

ইন্দ্র ও বকণের উদ্দেশে যে স্তোত্র উক্ত হইয়াছে, এস্থলে তাঁহার অনুবাদ করিলেই ইষ্টেশ্বরবাদের অর্থ বুঝা যাইবে। এই ধর্ম্মে দেবতাগণ যখনই আহূত হইয়াছেন, তখনই প্রত্যেক দেবতাতে সর্বশ্রেষ্ঠ সমস্ত গুণ আরোপিত হইয়াছে। ইহাতে কবিকল্পনার আধিক্য প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। প্রাচীন কবিগণের কেবল শব্দ-গৌরব-প্রকাশ বা কাব্যালঙ্কার যোজনা করিবার সময় ছিল না। তাঁহাদের অভিপ্রেত ভাব গুলি যথাযথরূপে ব্যক্ত করিতেই তাঁহাদিগকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত। ভাবগুলি সুন্দর রূপে ব্যক্ত করিতে পারিলেই তাঁহারা পরমানন্দ ও তৃপ্তি বোধ করিতেন। এই সকল স্তোত্র আমাদের চক্ষে হীন বলিয়া বোধ হইলেও তাঁহাদের চক্ষে অলৌকিক কার্য্য ও প্রকৃতযজ্ঞপোষোগী বলিয়া প্রতীত হইত। ফলতঃ তাঁহাদের প্রত্যেক কথারই গুরুত্ব ও অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উহা আধুনিক ভাষায় অনুবাদ করিতে হইলে আমাদিগকে একেবারে হতাশ হইতে হয়। ঋগ্বেদ, ৪র্থ, ১৭ :—

“হে ইন্দ্র ! আপনি মহান্। কেবল আপনার কাছেই স্বর্গ ও পৃথিবী সহজে বশীভূত হইয়াছে। বীরত্ববলে আপনি যখন বৃত্রকে পরাজয় করেন, তখন ঐ রাক্ষস যে সমস্ত সরিং গ্রাস করিয়াছিল, তৎসমুদয় আপনি উদ্ধার করিয়াছেন”। (১)

“আপনার জন্ম হইলে স্বর্গ ও পৃথিবী তাহাদের নিজ পুত্রের ক্রোধভরে কম্পিত হইয়াছিল, সূদৃঢ় পর্ষতগণ নৃত্য করিয়াছিল, মরুভূমি জলসিক্ত হইয়াছিল এবং সরিৎগণ প্রবাহিত হইয়াছিল। (২)

“তিনি বীর্য্যধলে বজ্রাঘাত করিয়া পর্ষতগণকে বিদারিত করতঃ নিজ শৌর্য্য ও মহত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি হৃষ্টচিত্তে বজ্রদ্বারা বৃত্রের প্রাণ বধ করেন। বৃত্রের নিধনের পর বন্দীকৃত সরিৎগণ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে থাকে। (৩)

“আপনার পিতা দ্যৌঃ আপনা হইতেই ক্ষমতাপন্ন বলিয়া পরিচিত হন। যিনি ইন্দ্রকে নির্মাণ করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই সুদক্ষ শিল্পী হইবেন, যেহেতু তিনি অতি তেজস্বী পুত্রের জন্ম দিয়াছেন। এই পুত্রের বজ্রাস্ত্র অতি সুন্দর। পৃথিবীর ন্যায় তাহাকে তাঁহার স্বস্থান হইতে বিচ্যুত করা যায় না। (৪)

“ইন্দ্র সকলের দ্বারাই আহূত হইয়া থাকেন, তিনি সকল লোকের রাজা এবং তিনিই কেবল পৃথিবীকে চালিত করিতে সক্ষম। তিনিই এক মাত্র প্রকৃত ব্যক্তি, সকল প্রাণী তাঁহাতেই আনন্দিত হয়, এবং সকলেই এই প্রতাপশালী দেবতার বদান্যতার প্রশংসা করিয়া থাকে। (৫)

“সোম মাত্রেই তাঁহার অধিকার আছে, অতি প্রীতিকর আনন্দেও তাঁহার অধিকার আছে। হে ইন্দ্র ! আপনি সর্ব্বরত্নের অধিপতি হইয়া সমস্ত লোককে তাহাদের নিজ নিজ অংশে প্রবর্তিত করিয়া থাকেন। (৬)

“হে ইন্দ্র ! আপনার জন্ম হওয়ামাত্র সকল লোকেই আপনাকে ভয় করিয়াছিল। হে বীর ! আপনি আপনার বজ্র দ্বারা সরিতের স্রোত-পথ-রোধী সর্পকে খণ্ড খণ্ড করিয়াছেন। (৭)

“আমরা নির্ভীক, তেজস্বী, মহান্, অসীম, বজ্রধারী ইন্দ্রের স্তব করি। তিনি বৃত্রকে বধ করিয়াছেন, তিনি শত্রুধন অধিকাল করিয়া থাকেন, এবং তিনি ধন দান করেন, তিনি ধনী ও সদাশয়। (৮)

“তিনি সমবেত শত্রুগণকে ছত্রভঙ্গ করেন এবং তিনিই যুদ্ধে এক মাত্র বীর বলিয়া বিখ্যাত হন। তিনি বিলুপ্তি সামগ্রী গৃহে আনয়ন করেন, তাঁহার সহিত মৈত্রী দ্বারা আমরা যেন তাঁহার প্রিয় হই।” (৯)



“তিনি শত্রু-নিধনকারী ও সমরবিজয়ী বলিয়া বিখ্যাত। তিনি পশু গণকে যুদ্ধে আনয়ন করেন। ইন্দ্র যখন ক্রোধান্বিত হন, তখন সমস্ত স্তূপ পদার্থই কম্পিত হয় এবং তাঁহাকে ভয় করে। (১০)

“ইন্দ্র পশুগণকে জয় করিয়াছেন, এবং স্বর্ণ ও অশ্ব অধিকার করিয়াছেন; আপনার ক্ষমতাবলে তিনি দুর্গ সমূহ ভগ্ন করিয়া থাকেন। তিনি ক্ষমতাশালী লোক-বলে বলী হইয়া ধন-সংগ্রহ ও ধন বিভাগ করেন। (১১)

“ইন্দ্র তাঁহার মাতা ও জন্ম-দাতা পিতাকেই বা কত খাতির করিয়া থাকেন। বজ্রনিদাদযুক্ত, মেঘমালা-সহপ্রবাহিত প্রবল বাত্যার গ্রায় তিনি ক্ষণকাল মধ্যেই আপনার শক্তি বর্দ্ধিত করেন। (১২)

“তিনি গৃহীকে গৃহ শূন্য করেন; তিনি ধূলিকে মেঘরূপে পরিণত করেন; তিনি দ্যৌর গ্রায় সমস্ত বস্তুকে ভগ্ন করেন। তিনি কি স্তবকারীকে ধন-মধ্যে স্থাপিত করিবেন? (১৩)

“তিনি সূর্য্যের চক্রকে চালাইয়াছেন, তিনি এতসঙ্গে গমনে স্থগিত রাখিয়াছেন এবং ফিরিয়া তাহাকে আকাশের জন্মস্থান—রাত্রির অন্ধকারময় গভীর রন্ধ্রে নিক্ষেপ করিয়াছেন। (১৬)

“কূপ মধ্য হইতে যেমন জলপাত্র টানিয়া আনা যায়, সেইরূপ কবি—আমরা গাভী, অশ্ব, ধন, ও স্ত্রী অভিলাষ করিয়া ইন্দ্রকে আমাদের নিকট বন্ধুরূপে আনয়ন করি। তিনি আমাদের স্ত্রী দেন। তাঁহার সহায়তা কখনও নিষ্ফল হয় না। (১৬)

“হে ইন্দ্র! আপনি বন্ধুরূপে উপস্থিত হইয়া আমাদের রক্ষক হউন। আপনি যাজ্ঞিকদিগের আনন্দদায়ক, আপনি আমাদের দেখুন। যাহারা জীবন ও স্বাধীনতা প্রার্থনা করে, আপনি তাহাদিগকে তাহা দিয়া থাকেন। আপনি বন্ধু, আপনি পিতা, আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পিতা আর নাই। (১৭)

“যাহারা আপনার সহিত মৈত্রী কামনা করে, আপনি তাহাদের বন্ধু ও রক্ষক হউন। হে ইন্দ্র! যে আপনার প্রশংসা ও স্তব করে, তাহাকে জীবন দান করুন। হে ইন্দ্র! আমরা একত্র হইয়া আপনার উদ্দেশে আহুতি প্রদান করিতেছি এবং এই সমস্ত কার্য্য দ্বারা আপনার মহত্ত্ব প্রচার করিতেছি।” (১৮)



“ইন্দ্র শৌর্য্যশালী ও ক্ষমতাপন্ন বলিয়া প্রশংসিত হন; যেহেতু তিনি একাকী অনেক প্রবল শত্রু নিধন করিয়া থাকেন। মনুষ্য বা দেবতা তাঁহাকে প্রতিরোধ করিতে পারেনা, তাঁহার বন্ধু কবি স্বয়ং তাঁহার আশ্রয়ে রহিয়াছেন। (১৯)

“সৰ্ব্বশক্তিমান, ক্ষমতাশালী, মনুষ্যের আশ্রয়ভূত, অটল ইন্দ্র যেন আমাদের জন্ত যথার্থই এই সমস্ত করেন। হে ইন্দ্র! আপনি সৰ্ব্বজীবের রাজা, কবির যাহা গৌরবজনক, আপনি আমাদের কাছে তাহাই দিন”। (২০)

### শ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া বরুণের স্তোত্র।

দ্বিতীয় স্তোত্রটি বরুণের উদ্দেশে রচিত হইয়াছে (ঋগ্বেদ, ২য়, ২৮) :—

“এই জগৎ, জ্ঞানী রাজা আদিত্যের অধিকৃত; তিনি যেন বীরত্ববলে সৰ্ব্বজীবকে পরাভূত করিতে পাবেন। যিনি যজ্ঞাদিতে প্রসন্ন ও বদান্ত, আমি সেই বরুণ-দেবের প্রশংসা-স্তোত্র গান করি। (১)

“হে বরুণ! আমরা সৰ্ব্বদাই আপনার চিন্তা করি এবং আপনার প্রশংসা করিয়া থাকি। আপনি আমাদের কাছে আপনার সেবায় সুখী হইতে দিন। সমৃদ্ধিশালিনী উষার সমাগম-কালে আমরা প্রতিদিন বেদিস্থ অগ্নির জ্বালায় আপনার অভ্যর্থনা করিয়া থাকি। (২)

“হে বরুণ! আপনি আমাদের পরিচালক, আমরা যেন সৰ্ব্বদাই আপনার আশ্রয়ে থাকি। আপনি বীরগণের মধ্যে বলী, আপনার প্রশংসার বিরাম নাই। হে অজেয় অদিতি-নন্দন দেবগণ! আপনারা আমাদের কাছে আপনার বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করুন। (৩)

“শাসনকর্তা আদিত্য এই সকল সরিং প্রেরণ করিয়াছেন; ইহারা বরুণের নিয়মানুসারে চলিয়া থাকে। ইহারা ক্লান্ত হয় না বা থামেনা। ইহারা পক্ষীর ন্যায় শীঘ্রই সৰ্ব্বত্র গমন কবে। (৪)

“হে বরুণ! বন্ধন স্বরূপ এপাপ হইতে আমাকে মুক্ত করুন। আমরা আপনার নিয়মের মূল সূত্র বিকাশ করিব। স্তোত্র-বয়ন কালে যেন আমার

ভস্তু ছিন্ন না হয়। উপযুক্ত সময়ের পূর্বে যেন এই কার্য্যকারকের শরীর পাতিত না হয়। (৫)

“হে বরুণ! আপনি আমার এই ভয় নিবারণ করুন। হে ত্রায়পরায়ণ রাজন্! আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করুন। বৎস যেমন রজ্জু হইতে মুক্ত হয়, আমাকে সেইরূপ পাপ হইতে মুক্ত করুন; আপনা হইতে দূরে থাকিলে আমি এক নিমিষের জন্যও কোন বিষয়ে সক্ষম হইতে পারি না। (৬)

“হে বরুণ! আপনার ইচ্ছামাত্র যে অস্ত্র দুষ্কন্মান্বিতদিগকে প্রহার করে, আমাদিগকে তাহা দ্বারা প্রহার করিবেন না। আলোক যে স্থান হইতে তিরোহিত হইয়াছে, আমরা যেন সে স্থানে না যাই। আমাদের শত্রুগণকে ছত্রভঙ্গ করুন, যেন আমরা বাঁচিতে পারি। (৭)

“হে বরুণ! আমরা পূর্বে আপনার প্রশংসা-স্তোত্র গান করিয়াছি, বর্ত্তমান কালেও গান করিতেছি, হে সর্কশক্তিমন! ভবিষ্যতেও গান কবিব। আপনি অজেয় বীর, সুদৃঢ় পর্কতের ন্যায় আপনার উপর নিয়মাবলি অটল ভাবে রহিয়াছে। (৮)

“আমার আত্মকৃত অপরাধ দূর করুন, হে রাজন্! অত্মকৃত অপরাধের জ্ঞাত আমাকে যেন কষ্ট ভোগ করিতে না হয়। হে বরুণ! অদ্যাপি অনেক উষার উদয় হয় নাই, আমাদিগকে সেই সমস্ত উষার জীবিত থাকিতে দিন। (৯)

“নিদ্রিতাবস্থায় যে আমার অনিষ্ট কামনা করে, সে সহচর হউক, কিংবা বন্ধুই হউক—আর যে আমাকে আঘাত করিতে ইচ্ছা করে, সে তক্ষর বা ব্যাঘ্রই হউক, হে বরুণ! আপনি আমাকে তাহাদের হস্ত হইতে রক্ষা করুন”। (১০)

কোন গ্রীক কবি জিউসের স্তবসময়ে ইহা অপেক্ষা অধিক কিছু বলিতে পারিতেন না। স্তোত্র হইতে এমন অনেক অংশ অনায়াসে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, যাহাতে অগ্নি, মিত্র, সোম ও অনাগ্র দেবতারাও উক্ত রূপ বা তাহা অপেক্ষা অধিকতর উচ্চ ভাবে স্তুত হইয়াছেন।

## ইষ্টেশ্বরবাদ ধর্মের বাক্কাল ।

ইষ্টেশ্বরবাদ শব্দে যাহা বুঝায়, তাহা উক্ত হইল । আমরা কেবল বেদের অলোচনা প্রসঙ্গে ধর্মের এই তত্ত্বটী প্রথমে জানিতে পারি । অন্যান্য ধর্মও যে, এক সময়ে এই অবস্থাপন্ন ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । ১৮৫৯ অব্দে মৎপ্রণীত প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের যে ইতিহাস প্রকাশিত হয়, তাহাতে ধর্মের এই অবস্থাটার বিষয় উল্লেখ করা গিয়াছে । উক্ত গ্রন্থের ৫৩২ পৃষ্ঠায় আমি লিখিয়াছি, “যখন এই সকল দেবতার প্রত্যেকটী স্তুত ও আহুত হইয়াছেন, তখন তাঁহারা অন্যান্যের ক্ষমতায় খর্বীকৃত কিংবা উচ্চ কি অল্প পদাক্রম বলিয়া কল্পিত হন নাই । উপাসকের মনে প্রত্যেক দেবতা অন্যান্য দেবতার ন্যায় উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইত । বহু দেবতার মধ্যে এক দেবতার অবশ্যই ক্ষমতার সীমা থাকিবে, আমাদের মনে একরূপ বোধ হইলেও, উপাসক তাঁহার উপাশ্রয় দেবতাকে তৎকালের জ্ঞাত প্রকৃত, স্বর্গীয়, সর্বশ্রেষ্ঠ ও অসীম ক্ষমতাপন্ন মনে করিতেন । উপাসনা-সময়ে তাঁহার উপাশ্রয় দেবতা ভিন্ন আর কেহই তাঁহার নয়ন-পথে পতিত হইতেন না । এই উপাস্য দেবতাই উপাসকগণের চক্ষে তাহাদের প্রার্থনা পূরণ জন্য জাজ্জল্যমান থাকিতেন । ‘হে দেবগণ ! আপনাদের মধ্যে কেহই ক্ষুদ্র বা তরুণ নহেন, আপনারা সকলেই মহৎ,’ এইরূপ ভাব বৈবস্বত মনু ভিন্ন অত্র কেহ স্পষ্টরূপে ব্যক্ত না করিলেও বেদের মধ্যে এই ভাবের প্রচুর সন্নিবেশ দেখা যায় । যদিও কোন কোন স্থলে (ঋগ্বেদ ১ম, ২৭, ১৩) দেবতারা, ছোট বড় ও তরুণ বৃদ্ধ বলিয়া স্তুত হইয়া থাকেন, তথাপি তাঁহাদিগকে কোথাও অপরাপর দেবগণের দাস বলিয়া বর্ণিত হইতে দেখা যায় না । দেবগণের এই তারুণ্য ও বার্কক্যের কল্পনা তাঁহাদের স্বর্গীয় শক্তির বিষয় বিস্তারিত রূপে প্রকাশ করিবার চেষ্টা বলিয়া বোধ হয় ।

কেহ এমন মনে করিবেন না যে, কেবল ভারতবর্ষেই এই ইষ্টেশ্বরবাদ বর্তমান ছিল । গ্রীশ, ইতালি, জার্মানি প্রভৃতি দেশেও উহার লক্ষণ লক্ষিত হয় । ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন জাতি হইতে সাধারণ জাতি সংগঠন-সময়ের পূর্বে উহা স্পষ্টরূপে অনুভূত হইয়া থাকে । ফলতঃ ইহাকে রাজতন্ত্রের পূর্ববর্তী

অরাজকতা বলা যাইতে পারে। ইহাকে ধর্মের বাক্কাল বলিয়া নির্দেশ করিলেই ঠিক হয়। সমাজের সাধারণ ভাষার পূর্বে যেমন ভিন্ন ভিন্ন কথা ভাষাস্থানীয় হইয়া থাকে, ধর্ম সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ। প্রথমে প্রতিগৃহেই উহা বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ক্রমে যখন বিভিন্ন পরিবার একত্র হইয়া জাতি হইয়া উঠে, তখন উহাও পল্লীর সাধারণ বেদীস্বরূপ হয়, এবং সমাজ-বন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে এই বেদী, সমুদয় জাতির পবিত্র ধর্ম-মন্দিরে পরিণত হইয়া উঠে। এইরূপ পদ্ধতি অতি স্বাভাবিক এবং তন্নিবন্ধন সর্বব্যাপী ও সর্বজনীন। আমরা বেদ ভিন্ন অত্র কোথাও ইহার উৎপত্তি ও উন্নতি এত স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারি না।

### ভিন্ন ভিন্ন দেবতার প্রাধান্য।

কয়েকটি উদাহরণ দিলে এই বিষয়টি সমধিক স্পষ্টীকৃত হইতে পারে (১)। দ্বিতীয় মণ্ডলের প্রথম স্তোত্রে অগ্নি বিশ্ব-নিয়ন্তা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তিনি লোক-পাল বা মানব-প্রভু, বিজ্ঞ রাজা, পিতা, ভ্রাতা, পুত্র ও মানব-বন্ধু বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন। এমন কি অত্যাগত সমস্ত দেবতার সমস্ত শক্তি ও নাম তাঁহাতে আরোপিত হইয়াছে। স্তোত্রটি যে আধুনিক রচনার মধ্যে পরিগণিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। যদিও অগ্নি উক্তরূপে স্তুত হইয়াছেন, তথাপি অপরাপর দেবতার স্বর্গীয় স্বভাবের বিরুদ্ধে যে, কিছু উল্লিখিত হইয়াছে, এরূপ দেখা যায় না।

ইন্দ্রের উদ্দেশে যাহা উক্ত হইতে পারে, ইন্দ্রের স্তোত্রে তাহা আমরা দেখাইয়াছি। স্তোত্রে ও আধুনিক সময়ের ব্রাহ্মণে ইন্দ্র অতি তেজস্বী ও দেবতাদের মধ্যে অত্যন্ত শূর ও বীর বলিয়া কথিত হইয়াছেন। দশম গীতির শেষ ভাগে লিখিত আছে, “ইন্দ্রই সর্ব শ্রেষ্ঠ”।

১। মৎ প্রণীত প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসের ৫৩২ পৃষ্ঠায় এবং মুইর সাহেবের “সংস্কৃত মূল” গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ১১৩ পৃষ্ঠায় ও এম খণ্ডের ২৮ পৃষ্ঠায় এই বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

সোম নামে অশ্ব দেবতার সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি মহৎ হইয়া জন্মিয়াছেন এবং সকলকেই জয় করিয়া থাকেন (১)। সোম সমস্ত জগতের রাজা বলিয়াও উক্ত হইয়াছেন (২)। তাঁহার মানবের জীবনী-শক্তি বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা আছে (৩)। এমন কি দেবতারাও তাঁহাদের জীবন ও অমরত্বের জন্ত তাঁহার নিকট ঋণী আছেন (৪)। তিনি স্বর্গ, পৃথিবী দেবতা ও মনুষ্যের রাজা বলিয়া কথিত হইয়াছেন (৫)।

আবার বরুণের উদ্দেশে যে সমস্ত স্তোত্র উক্ত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে বোধ হয় যে, কবির মনে যেন বরুণই একমাত্র সর্ব-শক্তিমান ও সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া অবধারিত হইয়াছেন।

বরুণের সম্বন্ধে কবি কহিয়াছেন “কি স্বর্গ, কি পৃথিবী, আপনি সকলেরই প্রভু” (১ম, ২৫, ২০); আবার অপর স্তোত্রে (২য়, ২৭, ১০) “আপনি দেবতা ও মনুষ্য, সকলেরই রাজা”। মানব-ভাষা, স্বর্গীয় ও শ্রেষ্ঠ শক্তির ধারণা ব্যক্ত করার সময়ে ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক প্রকাশ করিতে পাবে? বরুণ “ধৃতব্রত” বলিয়া কথিত হইয়াছেন। বরুণের এই সংজ্ঞায় জানা যায় যে, তিনি কেবল প্রকৃতির প্রভু নহেন, প্রত্যুত প্রকৃতির নিয়ম-বেত্তা ও উহার পালন কর্তা। পদার্থরাশি যেমন অটল শৈলোপরি সংস্থাপিত থাকে, তেমনি প্রকৃতির ব্রত বা নিয়ম সমূহ বরুণের উপর স্থাপিত রহিয়াছে। দ্বাদশ মাস তাঁহার বিদিত আছে। তিনি বায়ু, পক্ষী ও অর্ণবপোতাদিরও গতি অবগত আছেন। প্রকৃতির সমস্ত বিচিত্র ব্যাপার তিনি জানেন। এমন কি ভূত ও ভবিষ্যতেও তাঁহার দৃষ্টি আছে। ইহার উপর আবার বরুণের নৈতিক জগতের নিয়মাবলী তত্ত্বাবধান করাও যেন একটি ক্ষমতা। কবি কোন একটি স্তোত্রে বলিয়াছেন, তিনি বরুণেব কার্যের অবমাননা করিয়াছেন, এবং

২ ঋগ্বেদ, ৯ম, ৫৯, ৪।

৩ ঐ, ৯ম, ৯৬, ১০।

৪ ঐ, ৮ম, ৪৮, ৪।

৫ ঐ, ৯ম, ৮৭, ২।

৬ ঐ, ৯ম, ৯৭, ২৪।

ঐহার নিয়মের প্রতিকূলাচারী হইয়াছেন। সুতরাং তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন এবং আত্মসমর্থন জন্তু মানব-প্রকৃতির দৌৰ্দ্ধল্যের দোষ দিতেছেন। ঐহার মতে মৃত্যু পাপের পুরস্কার নয়। অশ্ব যেমন সদয় বাক্যে শাস্ত হয়, সেইরূপ তিনিও ঐহার দেবতাকে উপাসনা দ্বারা প্রসন্ন করিতে যত্নবান্ হইতেছেন। তিনি পরিশেষে বকণকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছেন, “আপনি প্রসন্ন হউন এবং পুনর্বার আমাদিগকে আপনার সহিত একত্র আলাপ করিতে দিন্” ইহা পাঠ করিলে বাইবেলোক্ত সাম কাহার না মনে পড়ে?—“তিনি আমাদের শরীরোপকরণের বিষয় অবগত আছেন। আমরা যে ধূলি মাত্র, তাহা ঐহার স্মরণ আছে”।

বকণেব সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হইলেও তিনি সর্ব-প্রধান নহেন। এমন কি দ্বিতীয় বৈ একমাত্র ও অদ্বিতীয় নহেন। বকণ প্রায়ই মিত্রেব সহায়রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। মিত্র বকণাপেক্ষা মহৎ, কি বকণ মিত্রাপেক্ষা মহৎ, তাহাব কোন উল্লেখ নাই।

ইহাকেই ইষ্টেশ্বরবাদ বা এক একটী দেবতার পূজা বলা গিয়া থাকে। একেশ্বরবাদমতে এক ঈশ্বর ভিন্ন অণ্ড কোন দেবতাব অস্তিত্ব একবারে অস্বীকৃত হইয়াছে, আর অনেকেশ্বরবাদে সর্বদেবতার উপর একের প্রাধান্য কল্পিত হইয়াছে। ইষ্টেশ্বরবাদের সহিত একেশ্বরবাদ ও অনেকেশ্বরবাদের এই প্রভেদ।

### ইষ্টেশ্বরবাদের পরিপুষ্টি ।

বৈদিক ইষ্টেশ্বরবাদের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঐহার কি অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা এক্ষণ দেখা যাউক।

আমরা প্রথমে এই সমস্ত স্বপ্রধান ও একত্বান-সম্ভূত দেবগণকে একত্র ধাবমান হইতে দেখিতে পাই। চিরবিরাজিত আলোক স্বরূপ আকাশের নাম দেওঃ। সর্বব্যাপক স্বরূপ আকাশের নাম বকণ, \*প্রাতঃকালেব আলোকোজ্জ্বল আকাশের নাম মিত্র। আকাশে দেদীপ্যমান দেবতাব

নাম সূর্য্য। আলোক ও জীবন-দাতা সূর্য্যের নাম সবিতা, ত্রিপদ, আকাশ-ব্রাহ্মী সূর্য্যের নাম বিষ্ণু, আকাশে জল-দাতার নাম ইন্দ্র, আকাশে বজ্র ও ঝটিকার সঞ্চারকের নাম রুদ্র ও মরুৎ, বায়ুদেবের নাম বাত ও বায়ু, প্রাতঃকালের অন্ধকারোথিত আলোক বা সন্ধ্যাকালের অন্ধকার-নিমগ্ন আলোকের নাম অগ্নি। ইতর দেবতাদের সম্বন্ধেও ঠিক ঐরূপ।

এই জন্যই এক দেবতার সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইত, অন্য দেবতার সম্বন্ধে ঠিক তাহাই উক্ত হইবার কোন বাধা ছিলনা। কোন এক বিশেষণ বহু দেবতায় প্রযুক্ত হইত এবং একই দেবতার গল্প ভিন্ন ভিন্ন দেবতাদের সম্বন্ধেও কথিত হইত।

সূর্য্য প্রভৃতি সৌর দেবতাগণের ন্যায় জলদেব ইন্দ্র, ও ঝটিকাদেব মরুৎ প্রভৃতিও দ্যৌঃ (আকাশের) সন্তান বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। আকাশ পৃথিবীর স্বামী বলিয়া কল্পিত হওয়াতে পৃথিবী সমস্ত দেবতার প্রভৃতি বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিয়াছেন।

সূর্য্য যখন উদিত হইতেন, তখন প্রাচীন কবিগণ তাঁহাকে কেবল আলোক-দাতা মনে না করিয়া স্বর্গ ও মর্ত্যের প্রকাশক ও প্রসারক বলিয়া মনে করিতেন। সূর্য্য তৎপরে সহজেই স্বর্গ ও মর্ত্যের স্রষ্টা বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন। ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি ও বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাতেও ঠিক ঐরূপ শক্তি ও গুণ আরোপিত হইয়াছে।

মতান্তরে অগ্নি আবার সূর্য্যের আনয়নকারী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। অন্যান্য কবিগণ ইন্দ্র, বরুণ ও বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাতে ঐ শক্তি আরোপ করিয়াছেন।

যদিও মেঘ ও অন্ধকারের সহিত তুমুল সমরে প্রধানতঃ ইন্দ্রই ব্যাপৃত থাকেন, তথাপি দ্যৌঃকে বজ্র ধারণ করিতে, অগ্নিকে অন্ধকার-পিশাচ-গণকে বধ করিতে এবং বিষ্ণু, মরুৎ ও পর্জন্য প্রভৃতি দেবগণকে এই সকল দৈনিক ও বাৎসরিক যুদ্ধে ইন্দ্রের সহযোগী হইতে দেখা যায়।

আমাদের ন্যায় প্রাচীন কবিগণও এই সমস্ত দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা এতদূর পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে, সকল দেবতাই এক (১)। অর্থাৎ তাঁহারা

(১) মুইর, 'সংস্কৃত মূল,' ৫ম খণ্ড, ২১৯ পৃষ্ঠা।



এক দেবতার সহিত অন্যান্য দেবতার অভেদ কল্পনা করিয়াছেন। যথাঃ—অগ্নিকে, ইন্দ্র, বিষ্ণু, সবিতা, পুষা ও অদিতি বলা হইয়াছে। এমন কি অগ্নি অনেক স্থানে সৰ্বদেব বলিয়াও বর্ণিত হইয়াছেন (১)। অথর্ববেদের একস্থানে দেখা যায়, (১৩শ, ৩, ১৩) :—

“সন্ধ্যাকালে অগ্নি বরুণ হইয়া উঠেন, প্রাতঃকাল-কালে তিনি মিত্র হন, শেষে সবিতা হইয়া আকাশ-মার্গে পরিভ্রমণ করেন এবং মধ্যাহ্ন-কালে ইন্দ্র হইয়া স্বর্গ উত্তপ্ত করেন”।

সূর্য্যের সহিত ইন্দ্র ও অগ্নির, সবিতার সহিত মিত্র ও পুষার, ইন্দ্রের সহিত বরুণের এবং দ্যৌঃর সহিত পর্জন্মের একত্ব কল্পিত হইয়াছে। যদিও এইরূপ হওয়াতে স্বাধীন দেবতাগণের সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া গিয়াছে, তথাপি অদ্বৈতবাদের এখনও অনেক বিলম্ব আছে।

প্রাচীন কবিগণ কর্তৃক আর একটি উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। তাঁহারা একত্র দুই দেবতার কল্পনা করিয়াছেন। ইহা বেদের একটি বিশেষ ধর্ম্ম (২)। একরূপ শক্তি-সম্পন্ন দুইটী দেবতার নাম একত্র দ্বিবচনান্ত হইয়া নূতন একটি দেবতার নাম হইয়া উঠিয়াছে। কেবল মিত্র ও বরুণের ভিন্ন ভিন্ন স্তোত্র ব্যতিরিক্ত “মিত্রাবরুণো” নামে এক দেবতার স্বতন্ত্র স্তোত্র দেখা গিয়া থাকে। কখন কখন ইহারা দুই মিত্র ও দুই বরুণ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

ইহার পর তৃতীয় উপায়ে সকল দেবতাকে সাধারণতঃ “বিশ্বদেব” নামে অভিহিত করা হইয়াছে, সকলেই একত্র স্তুত হইয়াছেন এবং একত্র সকলের উদ্দেশেই বলি প্রদত্ত হইয়াছে।

বহু দেবতার সহিত অপ্রতিদ্বন্দ্বিভাবে একেশ্বরের উপাসনা করার সম্বন্ধে আর একটি উপায় আমাদের নিকট অত্যন্ত স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। গ্রীক ও রোমকেরা এই উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। উপায়টি এই—বহু দেব-

(১) ঋগবেদ ৫ম, ৩।

(২) দ্বিদেবতাগণের মধ্যে এইগুলি প্রধান ;—

অগ্নিসোমো।	ইন্দ্রবৃহস্পতী।	পর্জন্মবাতো।
ইন্দ্রবায়ু।	ইন্দ্রাবরুণো।	মিত্রাবরুণো।
ইন্দ্রাগ্নী।	ইন্দ্রাবিষ্ণু।	সোমাপুষণো।
ইন্দ্রপুষণো।	ইন্দ্রাসোমো।	সোমারুদ্রো।

তার মধ্যে এক দেবতাকে সর্বশ্রেষ্ঠ কল্পনা করা। লোকাচারের ব্যতিক্রম না ঘটাইয়া এবং প্রতিদেবতার উপাসনায় (যেমন জিউসের পার্শ্বে আপোলো, এথিনা প্রভৃতির উপাসনা) একবারে বিরত না হইয়া সর্বেশ্বর-তৃষ্ণা চরিতার্থ করিবার এই একটা সুন্দর উপায়। অনেকে এরূপ বলিয়া থাকেন যে, যে জাতির মধ্যে রাজতন্ত্র প্রচারিত ছিল, তাঁহারাই কেবল দেবতাদের মধ্যে রাজতন্ত্র কল্পনা করিতে পারিতেন (১)। এই মত সত্য হইলে আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষের দেবতাদের মধ্যে রাজার অস্তিত্বের অভাব দেখিয়া স্থির করিতে পারি যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজতন্ত্র-শাসনও প্রচলিত ছিল না।

### একেশ্বরবাদের উপক্রম।

বৈদিক আৰ্য্যগণ তাঁহাদের দেবতাগণের মধ্যে একের প্রাধান্য কল্পনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই প্রয়াস গ্রীশ প্রভৃতি দেশের ন্যায় ভারতে যে, ফলবতী হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় না।

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, সবিতা, বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণ তাঁহাদের আলোকদ্বারা কেবল জগৎপ্রকাশক বলিয়া উক্ত না হইয়া, স্বর্গ মর্ত্যের বিস্তারক, পরিমাপক ও অবশেষে উহাদের স্রষ্টা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (২)। এইরূপে তাঁহারা কেবল বিশ্বদ্রষ্টা, বিশ্বব্যাপক, বিশ্ববেদ নাম

---

১। ‘Aristotelis Politica,’ I. 2. 7:—‘মনুষ্যেরা বলিয়া থাকে যে, দেবতাদের মধ্যেও রাজা আছেন, যেহেতু পূর্বেই হউক, বা এক্ষণেই হউক, তাহাদের মধ্যেও রাজা রহিয়াছেন। মনুষ্য আপনাদের কল্পনা অনুসারে দেবগণের সৃষ্টি করিয়া থাকে। কল্পিত দেবগণ কেবল তাহাদের আকারপ্রকারের অনুসারী হয় না, অধিকন্তু তাহাদের আচার ব্যবহারেরও অনুগত হইয়া থাকে।’

(২) ঋগ্বেদ, ৫ম, ৮৫, ৫, “মানেন ইব তস্থিবান্ অস্তরীক্ষে বি যঃ মমে পৃথিবী সূর্য্যোণ” মানদণ্ড দ্বারা যেমন পরিমাণ করা যায়, সেইরূপ তিনি অস্তরীক্ষে থাকিয়া সূর্য্য দ্বারা পৃথিবীর পরিমাণ করেন।

পরিগ্রহ করেন নাই, অধিকন্তু বিশ্বকর্মা (১) ও প্রজাপতি বলিয়াও কথিত হইয়াছেন। শেষোক্ত দুই নাম সময়ক্রমে আবার দুইটি নূতন দেবতার নাম হইয়া উঠে। বিশ্বকর্মা ও প্রজাপতি যে, সৌরবীজ হইতে উদ্ভূত, তাহার ষৎসামান্য প্রমাণ তাঁহাদের উদ্দেশে উক্ত কতিপয় স্তোত্রে লক্ষিত হইয়া থাকে। এই সকল স্তোত্র পাঠ করিলে বাইবেলোক্ত সামের ভাষা মনে পড়ে। এই সকল স্তোত্র দেখিলে মনে হয় যে, প্রজাপতি কিংবা প্রজাপতির ন্যায় কোন দেবতা দ্বারা একেশ্বরবাদ-তৃষ্ণা চরিতার্থ হইতে পারিত এবং প্রাচীন ভারতবাসী আৰ্য্যগণের ধর্মোন্নতির চরম সীমা লঙ্ঘন হইয়াছিল। কিন্তু ঠিক যে, সে রূপ হয় নাই, তাহা পরে দেখান যাইবে।

### বিশ্বকর্মা।

ঋগ্বেদের অপেক্ষাকৃত আধুনিক স্তোত্র হইতে কতিপয় স্থান এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে; উহাতে জগৎস্রষ্টা ও জগৎশাস্তা একেশ্বরের ধারণা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

বিশ্বকর্মা কে উদ্দেশ করিয়া যে কয়েকটি স্তোত্র উচ্চারিত হইয়াছে, প্রথমতঃ এস্থলে তাহাই উদ্ধৃত হইল (১) :—

“ সে কোন্ স্থান, তাহার অবলম্ব কি, এবং কোথাই বা তাহা, যেখান হইতে সর্বস্রষ্টা বিশ্বকর্মা জগৎস্রষ্টিকালে স্বীয়শক্তি-বলে স্বর্গ প্রকাশ করিয়াছিলেন ? (২)

“ একেশ্বর সেই বিশ্বকর্মা—ঈহার মুখ, বাহ ও পদ সর্বত্র বিরাজমান রহিয়াছে—স্বর্গ ও মর্ত্যের সৃষ্টি সময়ে তাঁহার নিজ বাহ ও পক্ষ দ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবী উভয়কে একত্র গঠিয়াছেন। (৩)

“ সে বনই বা কোন্ বন, সে বৃক্ষই বা কি বৃক্ষ, যাহা হইতে স্বর্গ ও পৃথিবী কাটিয়া বাহির করা হইয়াছে ? হে বিজ্ঞগণ ! আপনারা মনে মনে

(১) ইন্দ্র বিশ্বকর্মা নামেও উক্ত হন। ঋগ্বেদ, ৮ম ৯৮, ২।

(২) ঋগ্বেদ ১০ম, ৮১, ২।

সেই স্থান অন্বেষণ করুন, জগৎরক্ষাকালে তিনি যাহার উপর দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। (৪)

“যে বাচস্পতি বিশ্বকর্মা আমাদের মনকে অনুপ্রাণিত করেন, যুদ্ধ-কালে আমাদের রক্ষার জন্য অদ্য তাঁহাকে আহ্বান করা যাউক। যিনি সকলেরই মঙ্গল স্বরূপ, যিনি আমাদের নিরাপদের জন্য সংকল্পের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তিনি যেন আমাদের সমস্ত উপহার গ্রহণ করেন” (৭)

বিশ্বকর্মার উদ্দেশ্যে অন্য একটি স্তোত্রে (১) দেখা যায় :—

“যিনি আমাদের জন্মদাতা পিতা, যিনি সমস্ত নিয়ম ও জগৎবেত্তা, যিনি শাস্তা ও যিনি দেবগণের নাম রাখিয়াছেন, অপর সাধারণ সমস্ত জীবই তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে (৩)

“আকাশের অতীত, পৃথিবীর অতীত, দেবের অতীত ও অসুরের অতীত সেই আদি বীজ কি, জল যে বীজ বহন করিয়াছিল, সমস্ত দেবতাকে যাহাতে দেখা গিয়াছিল? (৫)

“জল সেই আদি বীজ বহন করিয়াছিল, যাহাহইতে সমস্ত দেবতাই একত্র আসিয়াছেন। সেই একমাত্র বস্তু—যাহাতে সমস্ত জীবই অধিষ্ঠিত ছিল—অজাতের কোড়ে স্থাপিত ছিল (৬)

“যিনি এই সমস্ত বিষয় সৃজন করিয়াছেন, তুমি তাঁহাকে কখনই জানিতে পারিবে না, তাঁহার ও তোমার মধ্যে কোন পদার্থের ব্যবধান আছে। কবিগণ আনন্দপূর্ণ জীবনে, কুহেলিকায় আবৃত হইয়া, কম্পিত স্বরে তাঁহার স্তুতি গান করেন। (৭)

### প্রজাপতি।

সর্বজীবের প্রভু প্রজাপতি দেবতা অনেক বিষয়ে বিশ্বকর্মার সদৃশ (২) তথাপি ব্রাহ্মণে প্রজাপতিকে বিশ্বকর্মার অপেক্ষা সমধিক স্বাধীনতা ভোগ

১ ঋগ্বেদ, ১০ম, ৮২।

২ শতপথ ব্রাহ্মণ, ৮ম, ২, ১, ১০, প্রজাপতিবৈ বিশ্বকর্মা।

করিতে দেখা যায়। বেদের কোন কোন স্তোত্রে ‘প্রজাপতি’ সবিতার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে :—

“ স্বর্গের আশ্রয়ভূত, জগতের প্রজাপতি তাঁহার উজ্জ্বল বর্ণ পরিধান করেন, সবিতা দীপ্তি পাইয়া সকল স্থান প্রসারিত ও ব্যাপ্ত করিয়া পরম সুখ উৎপাদন করেন;” (১)।

অপিচ প্রজাপতি সন্তানসন্ততিদাতা বলিয়াও আহূত হইয়া থাকেন। ঋগ্বেদের (১০, ১২১) স্তোত্রে তিনি বিশ্বশ্রষ্টা, দেবতাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ও হিরণ্য-গর্ভ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। যথা ;

“ সর্বপ্রথমে হিরণ্যগর্ভ উত্থিত হন; তিনিই এই সমস্তের একমাত্র প্রভু হইয়া জন্মিয়াছিলেন। তিনি পৃথিবী ও আকাশ স্থাপন করেন; সেই দেবতা কে, যাহাকে আমরা উপহার প্রদান করিব ? (১)

“ যিনি শ্বাস প্রদান করেন, যিনি বল দান করেন, উজ্জ্বল দেবতারা যাহার আদেশ মান্ত করেন, অমরত্ব যাহার ছায়া, মৃত্যু ও যাহার ছায়া, সেই দেবতা কে, যাহাকে আমরা উপহার প্রদান করিব ? (২)

“ যিনি নিজ মহিমাবলে জাগ্রত ও নিদ্রিত সমস্ত জগতের একমাত্র রাজা হইয়াছেন, যিনি মনুষ্য ও পশু সকলকেই শাসন করিয়া থাকেন, সেই দেবতা কে, যাহাকে আমরা উপহার প্রদান করিব। (৩)

“ যাহার মহিমাবলে আকাশ উজ্জ্বল হইয়াছে, পৃথিবী দৃঢ়ীভূত হইয়াছে এবং যাহার মহিমায় স্বর্গ এমন কি সর্বোচ্চ স্বর্গও সংস্থাপিত রহিয়াছে, যিনি আকাশপ্রদেশের পরিমাণ করিয়াছেন, সেই দেবতা কে, যাহাকে আমরা উপহার প্রদান করিব ? (৪)

“ যাহার মহিমা-বলে তুমারাবৃত পর্বতগণ বিদ্যমান রহিয়াছে, সরিৎ, সমুদ্র যাহার ক্ষমতায় অবস্থিতি করিতেছে; এই সমস্ত প্রদেশ যাহার দুই বাহু বলিয়া কথিত হইয়া থাকে;—সেই দেবতা কে, যাহাকে আমরা উপহার প্রদান করিব ? (৫)

“ যাহার ইচ্ছায় স্বর্গ ও পৃথিবী দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে এবং সভয়ে যাহার

প্রতীক্ষা করিতেছে ; উদীয়মান সূর্য্য যাহার উপর কিরণজাল বর্ষণ করিতেছেন ; সেই দেবতা কে, যাহাকে আমরা উপহার প্রদান করিব ? ( ৬ )

“ বীজ বহন করিতে ও অগ্নি উৎপাদন করিতে করিতে জলরাশি যখন সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিয়াছিল, তখন যিনি দেবগণের একমাত্র জীবন, তিনি তাহা হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন ; সেই দেবতা কে, যাহাকে আমরা উপহার প্রদান করিব ? ( ৬ )

“ যিনি মহিমাবলে ক্ষমতাশালী ও হোমাগ্নি-প্রসবকারী জলরাশির উপরে রূপাদৃষ্টি করিয়াছিলেন, যিনি সর্ব্ব দেবতার উপর একমাত্র দেবতা, সেই দেবতা কে, যাহাকে আমরা উপহার প্রদান করিব ?” ( ৮ )

“ যিনি স্বর্গ, পৃথিবী ও উজ্জ্বল প্রভাশালী জলরাশির সৃজন করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মপরায়ণ যেন আমাদিগকে আঘাত না করেন, সেই দেবতা কে যাহাকে আমরা উপহার প্রদান করিব ?” ( ৯ )

“ প্রজাপতি ! আপনি ভিন্ন আর কেহ এই সমস্ত সৃষ্ট পদার্থকে আলিঙ্গন করেন না ; আপনাকে আহুতি প্রদান কালে আমরা যাহা প্রার্থনা করি, তাহাই যেন আমাদের হয় ; আমরা যেন ধনেশ্বর হইতে পারি” । ( ১০ )

বৈদিক কবিগণের মনে উপরোক্ত ভাবের অভ্যুদয় দেখিয়া আমরা সহজেই একরূপ মনে করিতে পারি যে, তাঁহাদের প্রাচীন ধর্ম্ম বর্দ্ধিত হইয়া পরিশেষে একেশ্বরবাদের অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল ; অর্থাৎ উহা ক্রমে এক সর্ব্বপ্রধান দেবতার পূজার দিকে অগ্রসর হইতেছিল । নানা আকার ও নানা নাম অকার্য্যকর হওয়ার পর, মানুষ অনন্তকে যে সর্ব্বোচ্চ আকার দিতে ইচ্ছা করেন, ভারতবর্ষেও এইরূপে তাহা পাওয়া গিয়াছিল । কিন্তু ইহাতে বিশেষ কোন ফল হয় নাই । যে সকল স্তোত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, ঋগ্বেদে ও রূপ স্তোত্রের সংখ্যা অতিক্রম এবং তৎপরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ-কালে, উহাদের অপেক্ষা সমধিক নিশ্চিত ও সমধিক সারবান্ কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না । স্তোত্র অপেক্ষা ব্রাহ্মণে যে, দেবতা ও অসুরগণের ( ১ ) পিতা প্রজাপতির প্রাধান্য কল্পিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্তু সেন্থলেও তাঁহার পৌরাণিক চরিত্রের কথা বর্ণিত হইতে দেখা

বায়ু । সেখানে তিনি অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্র ও উষার পিতারূপে বর্ণিত হইয়াছেন (১) । তাঁহার নিজ কন্যা উষার সহিত সেখানে তাঁহার প্রণয়ের উপাখ্যানও বর্ণিত হইয়াছে । ভবিষ্যতে এই উপাখ্যানটাই প্রজাপতির উপাসকগণের উপাসনা-নিবর্তনের হেতু হইয়া উঠে ।

ব্রাহ্মণের কোন কোন অধ্যায় পাঠ করিলে কাহারও এমন মনে হইতে পারে যে, একেশ্বর-ত্বের পরিশেষে প্রজাপতিতেই পরিতৃপ্ত হইয়াছিল, এবং অপরাপর দেবতার প্রজাপতির নব-জ্যোতিপ্রভাবে তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল । আমরা দেখিতে পাই—

“ সৰ্ব্ব প্রথমে এক প্রজাপতিই এই সমস্তস্বরূপ ছিলেন (২) । প্রজাপতি ভরণ-কর্তা । কারণ তিনিই এই সমস্ত ভরণ করিতেছেন (৩) । প্রজাপতি সকল জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন । তাঁহার উচ্চতর শ্বাস বায়ু হইতে তিনি দেবতাদিগকে সৃজন করিয়াছেন । নিম্নতর শ্বাস হইতে মনুষ্য সৃষ্ট হইয়াছে । তৎপর তিনি জীবমাত্রের নাশক স্বরূপ মৃত্যুকে সৃজন করিয়াছেন । এই প্রজাপতির একাঙ্গী মরণশীল, অপরাঙ্গী অমর, মরণ-ধর্মের অর্দ্ধাংশ থাকায় তিনি মৃত্যুকে ভয় করেন (৪) ।

### নিরীশ্বরবাদের উপক্রম ।

এস্থলে আমরা দেখিতে পাই যে, ব্রাহ্মণ-গ্রন্থকারের প্রজাপতিতেও মরণধর্মশীল কোন স্বভাব অনুভব করিয়াছিলেন । এক স্থানে তাঁহারা এতদূর পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে, প্রজাপতি পরিশেষে খণ্ড খণ্ড হইয়া পতিত হন এবং মনুষ্য ভিন্ন আর সমস্ত দেবতারাই তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া যান (৫) ।

১ সাখ্যায়ন ব্রাহ্মণ, ৬ষ্ঠ, ১ ।

২ শতপথ ব্রাহ্মণ, ২য়, ২, ৪, ১ ।

৩ ঐ ৬ষ্ঠ, ৮, ১, ১৪ ।

৪ ঐ ১০ম, ১, ৩, ১ ।

৫ ঐ ৯ম, ১, ১, ৬ ।



উপাসকদের অভিপ্রেত বিষয়ে ভিন্ন ভাব দৃষ্ট হইলেও এতৎসম্বন্ধে যাহা উক্ত হইল, তাহা মিথ্যা নহে।

দিন দিন হিন্দুগণের মন ক্রমেই উন্নত ও দৃঢ়তর হইতেছিল। অনন্তের অন্তেষণে ইহা কিছুকাল পর্তত, নদীর আশ্রয় চাহিয়া ও তাহাদের অসীম মহিমার কীর্তন করিয়া পরিতৃপ্ত ছিল। কিন্তু যাহা অন্তেষণ করা যাই-তেছে, এই সকল যে, তাহার চিহ্ন মাত্র, হিন্দুদের এ জ্ঞান কখনও বিচলিত হয় নাই। তৎপরে আমাদের আৰ্য্য পূৰ্ব্বপুরুষগণ আকাশ, সূর্য্য ও উষার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে শিখেন এবং তথায় অর্দ্ধউন্মেষিত ও তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গণ হইতে অর্দ্ধ-লুকাইত কোন জীবন্ত শক্তির অস্তিত্ব দেখিতে অভ্যাস করেন। তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গণ আপনাদের বিষয়াতীত কোন পদার্থের ধারণা করিতে এ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল।

আৰ্য্যগণ এই পর্য্যন্ত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহারা উজ্জল নভো-মণ্ডলে একজন দীপ্তিকারক, সৰ্বব্যাপী আকাশে একজন ব্যাপ্তকারক, বজ্র নিনাদে ও প্রচণ্ড ঝটিকাতে একজন শব্দকারী ও ছরন্ত আঘাত-কারীর অস্তিত্ব অনুভব করেন, এবং বৃষ্টি হইতে বৃষ্টিদায়ক ইন্দের সৃজন করিয়া লন।

এই শেষোক্ত কার্যের সহিত কার্যের প্রতিঘাত ও সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয়। যত দিন প্রাচীন আৰ্য্যগণের মন প্রত্যক্ষ ও সম্পৃক্ত পদার্থে ব্যাপ্ত ছিল, তত দিন যে, তাঁহারা তাঁহাদের ধর্ম্ম-লালসায় দৃষ্ট পদার্থের সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তথাপি কেহই এই সমস্ত কাল্পনিক দেবতার অস্তিত্ববিষয়ে সন্দিহান হইতে সাহসী হন নাই। নদী, পর্তত প্রভৃতি চিরকালই বিদ্যমান ছিল, ইহাদের স্তোত্রে উচ্চভাব দৃষ্ট হইলে তাঁহারা উহা খর্ব্ব করিতে পারিতেন, কিন্তু ইহাদের অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিহান হইতেন না। আকাশ, সূর্য্য ও উষা সম্বন্ধেও ঠিক ঐরূপ হইত। তাহারাও বিদ্যমান ছিল। যদিও তাহাদিগকে কেবল দর্শন-যোগ্য পদার্থ বলা যাইতে পারে, তথাপি মানব মন একপে গঠিত হইয়াছে যে, আবির্ভূত পদার্থের সত্তা স্বীকার না করিয়া উহার আবির্ভাব স্বীকার করে না। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণী-ভুক্ত অর্থাৎ অসম্পৃক্ত ও অদৃশ্য দেবতাদের সম্বন্ধে

সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ দেখা যায়। বৃষ্টিদাতা ইন্দ্র ও বজ্রধারী রুদ্র মানব-মনের কল্পনা-সিদ্ধ পদার্থ মাত্র। বৃষ্টি ও বজ্র মাত্র দৃষ্ট হইত, কিন্তু যাহাকে স্বয়ং ঈশ্বরের আকার বলা যাইতে পারে, প্রকৃতিতে তাহা কিছুই দেখা যাইত না। বজ্র ও বৃষ্টি স্বর্গীয় বলিয়া পরিগণিত না হইয়া অবয়ব-বিহীন অদৃশ্য দেবতার কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত।

মনুষ্য কেবল আপনাদের কার্য্য মাত্র দেখিতেন। কেহই ইন্দ্র ও রুদ্রের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতে আকাশ, সূর্য্য উষা বা অন্য কোন প্রকার দৃশ্য পদার্থের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেন না। ইতিহাসের দূরবর্তী সময়ে মানব-জীবন ও মানব-চেষ্টার অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতে নরকপাল বা প্রস্তর ব্যবহার করা যে রূপ, ইহাও ঠিক সেইরূপ। উপাসকের মনে ইন্দ্রের অস্তিত্ব ও ইন্দ্রের উন্নতির সম্বন্ধে যে ধারণা রহিয়াছে, তাহা রোধ করিতে পারে, প্রকৃতিতে এরূপ কোন পদার্থ না থাকায় ইন্দ্র যে, অন্যান্য দেবতা অপেক্ষা সমধিক পৌরাণিক দেবতা হইয়া উঠেন, তাহা আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি। অন্য বৈদিক দেবতা অপেক্ষা ইন্দ্রের সম্বন্ধেই অধিক যুদ্ধ ও উপাখ্যান বর্ণিত হইয়া থাকে। প্রাচীন কবিগণ কি রূপে যে, ইন্দ্রকে দ্যৌঃর পরাভবকারী ও প্রাধান্য-বিলুপ্তকারী মনে করিতেন, ইহা হইতে তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এখনও “নেমিসিস্” বা বৈরদেবীর আগমন হয় নাই।

যে ইন্দ্র কিছু কালের জন্য এইরূপে অন্যান্য দেবতার গৌরব বিলুপ্ত করিয়াছিলেন, যাহাকে অনেকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দেশ না করিলেও অন্ততঃ বেদের অতি প্রসিদ্ধ দেবতা বলিয়া স্বীকার করিতেন, প্রথমে সেই ইন্দ্রের অস্তিত্ব বিষয়েই অনেকে সন্দেহান হইয়া উঠেন।

### ইন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও ইন্দ্রের প্রতি সংশয়।

বৈদিক স্তোত্রে অন্যান্য দেবতা অপেক্ষা ইন্দ্রের প্রতি যে, অধিক শ্রদ্ধা দেখা যায়, ইহা বড় বিস্ময়জনক বোধ হয়। বেদে আমরা এই ভাব দেখি, “অগ্নিময় ইন্দ্র যখন তাঁহার বজ্র নিক্ষেপ করেন, তখন লোকে তাঁহাকে

শ্রদ্ধা করে” (১) আবার দেখা যায় (২) যে, “তঁাহার এই মহৎ ও অলৌকিক কার্য্য অবলোকন কর এবং ইন্দ্রের শক্তিতে বিশ্বাস কর”। “হে ইন্দ্র! আপনি আমাদের আত্মীয়বর্গকে আঘাত করিবেন না, যেহেতু আমরা আপনার মহৎ শক্তিতে বিশ্বাস করি” (৩)। “হে ইন্দ্র! আমাদের শ্রদ্ধা জন্মিবে বলিয়া চন্দ্র সূর্য্য যথানিয়মে পর্য্যায়ক্রমে পরিভ্রমণ করিতেছেন” (৪)। এইরূপ উক্তিসমূহকে ধর্ম্ম বিষয়ক যুক্তি বলিয়া বোধ হয়। এত প্রাচীন কালেও যে, এইরূপ ভাব উপস্থিত হইবে, তাহা কখনই আশা করা যায় নাই। কিন্তু মানব-মনের ইতিহাসেও আমরা এই নীতি শিথিতে পারি যে, নূতন বস্তু মাত্রই পুরাতন ও পুরাতন বস্তুমাত্রই নূতন। জগৎ ও মনুষ্যের চিন্তা কেমন একত্র সংলগ্ন রহিয়াছে; তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন। এস্থলে যে শ্রদ্ধা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, লাতিনে তাহা *credo* ও ইংরাজীতে *creed*। রোমকেরা যেখানে *Credidi* পদ ব্যবহার করিতেন, ব্রাহ্মগণ-কর্তৃক সেখানে ‘শ্রদ্ধার্থে’ পদ ব্যবহৃত হইত। আবার রোমকেরা যেখানে *Creditum* পদ ব্যবহার করিতেন, ব্রাহ্মণেরা তথায় ‘শ্রদ্ধিতম্’ পদ প্রয়োগ করিতেন। ইহা হইতেই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, আর্য্যবংশ পৃথক হইয়া পড়িবার পূর্বে ও সংস্কৃত সংস্কৃত হইবার এবং লাতিন, লাতিন হইবার পূর্বে ঐ শব্দ ও ঐ ভাব অবশ্যই বিদ্যমান ছিল। মনুষ্য এই প্রাচীন কালেও ইন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূত ও জ্ঞানের অগোচর বস্তুতে বিশ্বাস করিতেন। তঁাহারা বিশ্বাস করিতেন; কেবল সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তঁাহারা বিশ্বাস অর্থ-বাচক একটা শব্দ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ এইরূপ বিশ্বাস করিয়া, তঁাহারা কি করিতে-ছিলেন, তাহা তঁাহারা মনে মনে জানিতেন। এই মানসিক ব্যাপারকে

১ ঋগ্বেদ, ১ম, ৫৫, ৫।

২ ঐ ১ম ১০৩, ৫।

৩ ঐ ১ম, ১০৪, ৬

৪ ঐ ১ম, ১০২, ২।

তাহারা “শ্রদ্ধা” (১) নামে অভিহিত করেন। Credo আর শ্রদ্ধা শব্দ-দ্বয়ের একত্রে যে কতদূর পর্য্যন্ত বুঝিতে পারা যায়, এস্থলে তাহার সবিস্তার বর্ণনা কবিবাব অবকাশ নাই, এই একটী শব্দ আমাদের সম্মুখে আল্লম্ ও ককেশম্ হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত সে অসীম বিস্তৃতি বিকাশ করে, আপনা-দিগকে কেবল তাহাবই প্রতি মনোযোগ দিতে অনুবোধ করি।

অন্যান্য দেবতার বিশ্বাস সত্ত্বেও যে ইল্দের প্রতি বিশ্বাস করা একান্ত আবশ্যক, সেই ইল্দের অস্তিত্ব বিষয়েও তাহার উপাসকেরা সন্দিহান হন (২)।  
যথা—

“যদি ধন চাহ, ইল্দের উপাসনা কর, যদি ইল্দ প্রকৃত প্রস্তাবে থাকেন, তবে প্রকৃতকপে তাঁহার প্রশংসা কর। কেহ কেহ বলেন ইল্দ নাই। কে ই বা তাঁহাকে দেখিয়াছে? আমরা কাহাবই বা প্রশংসা করিব?”

নিম্নলিখিত স্তোত্রে কবি স্বয়ং ইল্দকে প্রবেশ করাইয়াছেন এবং বলাই-তেছেন, “হে উপাসক! এই আমি, আমাকে দেখ, আমি পরাক্রমে সর্ব-জীবকে পরাজয় করিয়া থাকি (৩)।”

অপর একটী স্তোত্রে এইরূপ দৃষ্ট হয় (৪) :—

লোকে যে ভয়জনকের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, “তিনি কোথায়? এবং বাহার সম্বন্ধে তাহারা কহে যে, তিনি নাই, ক্রীড়াকালে যেমন পণ গৃহীত

১ শ্রদ্ধার অন্তর্গত শ্রং শব্দের প্রকৃ অর্থ আমাব স্পষ্ট বোধ হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, শ্রং শব্দ জং (অন্তঃকরণ), শব্দের অনুরূপ, শ্রদ্ধাব অর্থ, যাহা হৃদয়ে গৃহীত হইয়াছে। আমি এই মতের অনুমোদন কবিতে পারি না। কেবল শব্দগত বৈষম্য ন্যূন, স্বপ্নেদে যে শ্রং শব্দ দেখা যায়, তাহার অর্থও একপা নম বলা, “শ্রং বিশ্বা বার্যা ক্রিদি”। বেন্ফির ন্যায আমাবও বিশ্বাস যে শ্রু, (শ্রবণ কবা) ধাতুব সহিত শ্রং শব্দের সম্বন্ধ আছে। সূতরাং ইহার প্রকৃত অর্থ, যাহা সত্য বলিয়া প্রকৃত হইয়াছে, বিদিত হইয়াছে। কিন্তু আমি ইহার ব্যুৎপত্তিব সম্ভাষণজনক ব্যাখ্যা কবিতে পারি না।

২ ঋগ্বেদ, ৮ম, ১০০, ৩।

৩ অয়মস্মি জরিতঃ পশ্যমা ইহা বিশ্বা জাতানি ইত্যাদি।

৪ ঐ, ২য়, ১২, ৫।

হয়, সেইরূপ তিনি শত্রুর ধন হরণ করিয়া থাকেন। হে মনুষ্যাগণ ! তাঁহাকে শ্রদ্ধা কর, কারণ তিনিই প্রকৃত ইন্দ্র।”

এইরূপে যখন আমরা দেখি যে, প্রাচীন দেবতা “দ্যৌঃ” অপ্রচলিত হইলেন, ইন্দ্র স্বয়ং অস্বীকৃত হইলেন, প্রজাপতি খণ্ডীকৃত হইয়া পড়িলেন, এবং অন্য এক কবি দেবতাগণকে নানমাত্র দেবতা বলিতে কুণ্ঠিত হইলেন না, তখন আমাদের মনে উদয় হয়, যে ধর্ম-চিত্তার স্রোত পর্বত নদী হইতে উথিত হইয়া সর্বপ্রথমে আকাশের ও সূর্য্যের উপাসনা করিতেছিল, শেষে ইন্দ্র ও বৃদ্ধপ্রভৃতি অদৃশ্য দেবতাগণের পূজা করিতে থাকে, তাহা প্রায় তাহার চব্বন সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল। আইসলণ্ডস্থ ইডর্ কবিগণ বাবুবার বলিয়াছেন যে, জগৎ ধ্বংস হইবার পূর্বে দেবতাবা হীনপ্রভ হইবেন, আমরা ভাবতবর্ষেও সেইরূপ কোন ছন্দেবের আশঙ্কা করিতে পারি। যে অবস্থায় ইষ্টেশ্বরবাদ একদিকে বহু দেবতার উপাসনার ও অপরদিকে একেশ্বরের উপাসনার পর্য্যবসিত না হইয়া নিবীধরবাদে পরিণত হইয়া উঠিতেছিল, বোধ হয় আমরাও সেই অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।

### প্রকৃত ও সাধারণ নাস্তিকেতার প্রভেদ।

বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থা বিশেষে নিবীধরবাদ উপলব্ধ হইলেও ভাবতবর্ষীয় ধর্মের উহা শেষ ফল নহে। ভারতের ধর্মসম্বন্ধে এই শব্দটা প্রয়োগ করা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বোধ হয়। প্রাচীন হিন্দুদিগের মধ্যে হোম-রীয় গায়ক বা ইলিয়ার দার্শনিক, এতদুভয়ের কিছুই ছিল না। তাঁহাদের নিবীধরবাদকে বং প্রাচীন দেবতাদের অস্তিত্বের অস্বীকার-করণ বলা যাইতে পারে। এক সময়ে যাহা বিশ্বাস করা যাইত, তাহা অস্বীকার করা বা তাহাতে বিশ্বাস করিতে বিব্রত হওয়াকে ধর্মের বিনাশ বা ধ্বংস না বলিয়া, ধর্মের জীবনী-শক্তিই বলিতে হইবে। প্রাচীন আর্য্যগণ প্রথম হইতেই কোন অদীন, অনন্ত ও স্বর্গীয় বিষয়ের অস্তিত্ব অনুভব করিতে থাকেন এবং এক নামের পর নামান্তর করিয়া

করিয়া উহা অবধারণ করিতে চেষ্টা পান। তাঁহারা মনে করিতেন, পৰ্ব্বতে, নদীতে, উষায়, সূর্য্যে, আকাশে, স্বর্গে ও স্বর্গপিতায় তাঁহারা উহা পাইয়াছেন। কিন্তু একে একে সকলই বৃথা হইয়া আসিল। তাঁহারা যাহা অন্বেষণ করিতেছিলেন, তাহা প্রথমতঃ পৰ্ব্বতের ন্যায়, নদীর ন্যায়, উষার ন্যায়, আকাশের ন্যায়, পিতার ন্যায় ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে বোধ হইল, তাহা পৰ্ব্বত নহে, উষা নহে, নদী নহে, আকাশ নহে এবং পিতাও নহে। অতঃ সন্দেহেই উহা আছে—কিন্তু উহা এ সমস্ত হইতে উচ্চতর ও এসমস্তের অতীত। এমন কি অশ্বর, দেবতা প্রভৃতি সাধারণ নামেও তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে নাই। তাঁহারা বলিতেন, অশ্বর দেবতারা থাকিতে পারেন, কিন্তু আমরা ইহা অপেক্ষা অধিক চাই, আমরা উচ্চতর শব্দ ও পবিত্রতর ভাব চাই। তাঁহারা কম বিশ্বাস ও কম অভিলাষ করিতেন বলিয়া যে উজ্জল দেবতাদিগকে ভুলিয়া-ছিলেন, তাহা নহে। তাঁহারা উজ্জল দেবতা অপেক্ষা উন্নত বিষয়ে অভিলাষ করিয়া উহাদিগকে অবশেষে অনাদর করিতে বাধ্য হইয়া-ছিলেন।

তাঁহাদের মনে ক্রমে একটা নূতন কল্পনা জাগিতেছিল এবং তাঁহাদের নৈরাশ্রের চীৎকারেই অভিনব ভাবের সূচনা করিতেছিল।

ধর্ম্মের উন্নতি এই ভাবেই হইয়া থাকে, ভবিষ্যতেও এই ভাবে হইবে। আমরা দ্বিবিধ নিবীশ্বরবাদ দেখিতে পাইয়া থাকি। একরূপ নাস্তিকতায় সত্য মৃত্যু ভূয়া। কিন্তু আর এক প্রকার নাস্তিকায় প্রকৃত বিশ্বাসমাত্রের জীবনও শোণিত সন্দেহ। যখন কোন বিষয় একান্ত অসত্য বলিয়া বোধ হয়, তখন আমরা এই শেষোক্ত নাস্তিকতা-বলে তাহা পরিত্যাগ করিতে পারি। কোন অসম্পন্ন বিষয় আমাদের নিকট নিতান্ত প্রিয় ও পবিত্র হইলেও আমরা এই নাস্তিকতা-বলেই তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপাততঃ জগতের অনাদৃত সূক্ষ্ম বিষয় পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হই। ইহাই প্রকৃত আত্ম-সমর্পণ, ইহাই প্রকৃত আত্মত্যাগ, ইহাই সত্য প্রকৃত বিশ্বাস ও ইহাই প্রকৃত শ্রদ্ধা। একরূপ নাস্তিকতা না থাকিলে ধর্ম্ম অনেক পূর্ণ হইতেই কঠোর কপটতা হইয়া উঠিত। ইহা ব্যতীত নূতন ধর্ম্ম, কোন সংস্কার বা কোনরূপ বিপ্লব

একবারে অসম্ভব হইয়া উঠিত। ইহা ব্যতীত আমাদের মধ্যে কেহই নবজীবনের অধিকারী হইতে পারিতেন না।

একবার ধর্মের ইতিহাসপ্রতি দৃষ্টিপাত করুন। সর্বকালে ও সর্বদেশে কত লোকেই নাস্তিক বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা দৃশ্য ও সীমাবদ্ধের অতীত পদার্থ অস্বীকার করিয়াছেন বলিয়া এইরূপ উক্ত হন নাই, কিংবা কারণ ব্যতীত, অভিপ্রায় ব্যতীত ও ঈশ্বর ব্যতীত জগৎ বুঝিতে পারা যায় বলাতেও উক্ত রূপ নিবীশ্বরবাদী নামে অভিহিত হন নাই। তাঁহারা উক্তরূপ মত অস্বীকার বা প্রচার না করিলেও কেবল বাল্যকালে শিক্ষিত, লোকবিদিত ও সাময়িক ঐশ্বরিক ধারণা পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের উচ্চতর ও পবিত্রতর ধারণা করিতে অভিলাষী হওয়াতেই নাস্তিক নামে অভিহিত হইয়াছেন।

ব্রাহ্মণদের মতে বুদ্ধ এক জন নাস্তিক। অনেক বৌদ্ধ-দর্শনের মত নাস্তিকতা-পূর্ণ বটে, কিন্তু স্বয়ং গৌতম শাক্যমুনি নাস্তিক ছিলেন কিনা, সন্দেহ। ফলতঃ তিনি লোক-বিদিত দেবগণকে অস্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে নাস্তিক বলা যাইতে পারে না (১)।

এথেনীয় বিচারপতিদের মতে সক্রেটিস্ও একজন নাস্তিক। কিন্তু সক্রেটিস্ গ্রীশের দেবদেবী অস্বীকার করিতেন না। তিনি কেবল হিফেইস্তাস্ ও অফ্রদাইত প্রভৃতি দেবতা অপেক্ষা কোন উচ্চতর ও প্রকৃত স্বর্গীয় পদার্থে বিশ্বাস করিয়াছিলেন।

ইহুদিদিগের মধ্যে যে কেহ ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেন, তিনি একজন দেবদেষ্ঠা, এবং যে কেহ তাঁহার পূর্বপুরুষদের দেবতাকে ঐ নূতন পদ্ধতিতে পূজা করিতেন, তিনি বিধর্মী বলিয়া অভিহিত হইতেন। এমন কি খ্রিষ্টীয় এই নাম গ্রীক ও রোমকদের নিকট নাস্তিকদের নাম বলিয়া পরিগণিত হয়।

খ্রিষ্টীয়গণও উক্ত রূপ অপভাষা প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, এথনসিয়ন্সের মতে এরিয়ানেরা খ্রিষ্ট-বিদোহী, ইহুদি, উন্মত্ত, বহুদেবো-পাসক ও নাস্তিক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। এরিয়স যদি এথন-

১ বুলের সাহেবের “অশোকের তিনটি নূতন অনুশাসন,” ২৯ পৃষ্ঠা দেখ। বোম্বাই, ১৮৭৭।



সীবদিগকে অপেক্ষাকৃত ভাল চক্ষে না দেখিয়া থাকেন, আমাদের তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। তথাপি এথনসিয়স্ ও এরিয়স্ উভয়েই নিজ নিজ মতে ঈশ্বরের সর্বোচ্চ ধারণা চরিতার্থ করিতে ব্যস্ত ছিলেন। এরিয়স এই ভয় করিতেন যে, পাছে জেন্টাইলদিগেব ভ্রমে ইহাব গোবব ও সত্য খর্ব হয়, এবং এথনসিয়স এই ভয় করিতেন, পাছে ইহুদিদিগেব ভ্রমে উক্তরূপ বিপত্তি ঘটে।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে ধর্মতত্ত্ব নিয়া যে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহাতেও উক্ত রূপ কদর্যা ভাব দেখা গিয়া থাকে। ষোড়শ শতাব্দীতে সববিতস্, কলবিনকে ত্রিদেবোপাসক ও নাস্তিক বলিয়াছেন, কলবিন এদিকে সববিতস্কে বধেব যোগ্য বলিয়া মনে করিতেন। ইহাদের ঈশ্বর-বিষয়ক মত ভিন্ন রূপ ছিল।

পরবর্তী শতাব্দীর একটী ঘটনা এখানে উদ্ধৃত হইতেছে। আধুনিক সময়ে এই ঘটনার বিবয় বিশেষ রূপে বিচার করিয়া দেখা গিয়াছে। যদিও অনেকে বানিনিকে পাবণ্ড-শিবোন্নয়নাত্মক বলিয়াছেন, তথাপি তাঁহার বিচারপতি তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া তাঁহার জিহ্বা ছেদন করিতে ও তাহাকে পুড়াইয়া মাটিতে আদেশ দেন (১৬১৯)। আধুনিক লেখকেরাও বানিনিব প্রতিপক্ষীয়গণেব পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু এই নাস্তিক ঈশ্বরসম্বন্ধে কি বলিয়াছিলেন, তাহা শুনা আবশ্যক।

তিনি লিখিয়াছেন “তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ যে, ঈশ্বর কি, আমি যদি তাহা জানিতাম, তাহা হইলে আমি নিজেই ঈশ্বর হইতাম। কাবণ স্বয়ং ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহই ঈশ্বরকে জানিতে পারে না। যদিও মেঘেব মধ্য দিয়া সূর্য্য দেখাব ন্যায় আমরা তাঁহাকে তাঁহার কার্য্য-দ্বারা কোন প্রকারে বুঝিতে পারি, তথাপি উক্ত রূপে আমরা তাঁহার সম্যক্ অবধান করা করিতে পারি না। যাহা হউক, আমরা এইমাত্র বলিতে পারি, যে, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, মঙ্গলনয়, সর্বপ্রথম-সমুৎপত্ত, সর্বসম্পূর্ণ, সনন্ত, ন্যায়বান্, নিত্য-সদৃশ, স্থানীয় ও ধীর; তিনি সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, সনদর্শী, সর্বদ্রু ও সর্বশক্তিমান্; তিনি পিতা, রাজা, প্রভু, দাতা, শাস্তা, তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই মধ্য ও অনন্ত; তিনিই

প্রণেতা, জীবন দাতা, তিনিই দর্শক, কুশলী, বিধাতা, হিতকারী, তিনিই সর্ব্ব সর্ব্ব।”

যিনি এইরূপ লিখিয়াছেন তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া ভ্রমীভূত করা হইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে নাস্তিকতার প্রকৃত অর্থসম্বন্ধে এত দূর মত-ভেদ ও গোলমাল দেখা যায় যে, ১৬৯৬ খ্রিষ্টাব্দে এডিনবরা নগরের পার্লিয়ামেন্ট নাস্তিকতার বিরুদ্ধে একটি আইন বিধিবদ্ধ করেন (১), এবং স্পাইনোজা ও আর্ক বিশপ টিলোটসন্ প্রভৃতির ন্যায় লোক ভয়সাং না হইলেও নাস্তিক অপবাদগ্রস্ত হন (২)।

অষ্টাদশ শতাব্দীও একবারে উক্তরূপ কলঙ্ক হইতে মুক্ত নহে। যাহারা স্বপ্নেও কখন ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই, তাঁহারা কেবল মানব-প্রকৃতি-স্বলভ ভ্রম ও বাগাড়ম্বর হইতে ঈশ্বরের ধারণা পবিত্র রাখিতে অভিলাষী হওয়াতে নাস্তিক নামে অভিহিত হইয়াছেন।

আজি কালি আমরা নাস্তিক শব্দের অর্থ উত্তমরূপে বুঝিয়াছি। আর বিশেষ না ভাবিয়া চিন্তিয়া, উহার ব্যবহার করি না। তথাপি যে সকল সহৃদয় ব্যক্তি আপনাব ও অপরের প্রতি সাধুতা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের ইহা মনে থাকা আবশ্যিক যে, তাঁহাদের সমক্ষে যাহারা ঈশ্বরনিন্দক, পাষাণ ও নাস্তিক বলিয়া অভিহিত হন, তাঁহারা কি রূপ লোক ছিলেন।

যাহারা একান্তচিহ্নে ঈশ্বরের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, তাঁহারা অনেক সময় আপনাদিগকে ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত মনে করেন। তখন তাঁহারা “তবে আমি, ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করি কি না করি,” কদাচিৎ এইরূপ প্রশ্ন আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেও সাহসী হইয়া থাকেন।

তাঁহারা যেন নিরাশ না হন এবং আমবা ও যেন তাঁহাদের সম্বন্ধে কঠোর বিচার না করি। তাঁহাদের নৈরাশ্য অনেক ধর্ম্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

যাহার আত্মা অনন্ত ধামে গমন করিয়াছে, যাহার সাধুতা ও ধর্ম্ম-পরায়ণতার সম্বন্ধে কেহই সন্দিহান নহেন, এস্থলে সেই মহামাত্র সহৃদয় ধর্ম্মোপদেষ্টার কয়েকটি মাত্র কথা উদ্ধৃত করিয়া উপস্থিত প্রস্তাবের

১ Macaulay, ‘History of England,’ chap. XXII.

২ Macaulay, ‘History of England,’ chap. XVII.

উপসংহার করা যাইতেছে। তিনি বলিয়াছেন, “ঈশ্বর এই বাক্যটি অতি মহৎ, যিনি তাহা অবধারণ করিয়াছেন ও বুঝিতে পারিয়াছেন, তিনি ‘ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে’, যাহাদের এরূপ বলিতে সাহস হয় না, সমধিক ধীরতা ও সমধিক ন্যায়পরতার সহিত তাহাদের বিচার করিতে পারিবেন।”

আমি এক্ষণে বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, যাহা এক্ষণে বলিলাম, তাহা তাহার প্রকৃত অর্থে গৃহীত হইবে না এবং সম্ভবতঃ তাহা অসঙ্গতরূপে ব্যাখ্যাত হইবে। আমি যে, নিবীশ্বরবাদের সমর্থন করিয়াছি এবং নিবীশ্বরবাদকে গৌরবান্বিত করিয়া ধর্মভাবোৎপত্তির মনুষ্যলভ্য চরম সীমা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি, তাহাতে যে নিন্দিত হইব, তাহাও বেশ জানি। কিন্তু পাঠকবর্গের মধ্যে যদি একজনও প্রকৃত নাস্তিকতার অর্থ বুঝিয়া থাকেন এবং প্রকৃত ও সাধারণ নাস্তিকতার প্রভেদ স্পষ্টরূপে জানিতে সমর্থন হন, তাহা হইলেই আমি পরম পরিতোষ লাভ করিব। কারণ আমি জানি যে, কেবল এই প্রভেদ-জ্ঞানই নিতান্ত প্রয়োজনের সময় আমাদের সাহায্য করে। ইহা আমাদের কাছে বলিয়া দিবে যে, সুখদ মধুর বসন্তের পত্র ক্রমে শীতসমাগমে বৃন্তচ্যুত হইয়া নিপতিত হইলেও আবার নব বসন্তাগমের প্রত্যাশা রহিয়াছে, ইহা আমাদের কাছে শিখাইয়া দিবে যে, সাধুসন্দিগ্ধ-ভাব, সাধু বিশ্বাসের গভীর উৎস স্বরূপ।

ভারতবাসিগণের মন কিরূপে এই অবস্থায় উপনীত হইয়া ধর্ম বিষয়ক এই স্মহৎ উপপাদ্যের অনুশীলন করিয়াছিল এবং কিরূপেই বা লউকুনের ন্যায় নাস্তিকতা-রজ্জুচ্ছেদনে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা আমাদের শেষ প্রস্তাবে আলোচিত হইবে।

---

## দর্শনশাস্ত্র ও ধর্ম।

### দেবগণের তিরোধান।

ভারতবর্ষের আৰ্য্য অধিবাসিগণের যখন বিশ্বাস জন্মিল যে, দেবতাগণ কেবল নামমাত্র; তখন আমরা বুকিতে পারি, যাহাদিগকে তাঁহারা দীর্ঘকাল হইতে স্তুতি ও পূজা করিয়া আসিতেছিলেন, এখন নৈরাশ্য ও উপেক্ষার সহিত তাঁহারা সেই দেবগণের পূজা ও স্তুতিগান হইতে বিমুখ হইলেন। গ্রীকেরা যখন তাঁহাদের পবিত্র দেবমন্দির বিনষ্টপ্রায় দেখিল, জর্মনেরা যখন স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া তাহাদের পবিত্র ওক বৃক্ষ ভূপতিত দর্শন করিল, আপোলো কিংবা ওদিন দেব যখন এই অবমাননার প্রতিশোধ লইতে অগ্রসর হইলেন না, তখন সেই গ্রীক ও জর্মনদিগের হৃদয়ে যে ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল, ইন্দ্র অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ নামমাত্র বলিয়া অবধারিত হইলে পর আৰ্য্যগণেরও সেইরূপ ভাবাপন্ন হইবার সমধিক সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু পরিণামে আমরা যেরূপ ফলের আশা করিয়াছিলাম, ভারতবর্ষে সেইরূপ ফল দেখা যায় নাই। গ্রীক, রোমক ও জর্মনদের মধ্যে দেবতাগণ একবারে অন্তর্হিত অথবা তাহাদের অস্তিত্ব একবারে অস্বীকার্য্য হইয়া উঠিলে তাহারা কুকর্মান্বিত প্রেত-শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, ইহার সঙ্গে সঙ্গে আবার মানব-হৃদয়ের অদমনীয় ধর্ম-লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য খ্রিষ্ট ধর্ম বীরে বীরে অভ্যুত্থিত হইতেছিল।

কিন্তু ভারতবর্ষে এরূপ কোন অভিনব ধর্মের আবির্ভাব হয় নাই, এরূপ কোন অভিনব ধর্ম ব্রাহ্মণদের সম্মুখে আইসে নাই যে, ব্রাহ্মণেরা আপনাদের প্রাচীন দেবতাগণের উপাসনা হইতে বিরত হইয়া সেই ধর্ম পরিগ্রহ করিতে পারেন। সুতরাং তাঁহারা গ্রীক ও রোমকদিগের পথ অনুসরণ করিতে সমর্থ হন নাই। অবিশ্রান্ত অনুসন্ধান করিলে কৃতকার্য্য

হইতে পারা যাইবে, এই আশায়, যে ধর্ম তাঁহাদের জ্ঞান-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মনোমধ্যে উদিত হইয়াছিল, কিন্তু যাহা সম্যক্ আয়ত্ত করিতে কিংবা যাহার নামকরণ করিতে তাঁহাদের সামর্থ্য ছিল না, সেই প্রাচীন ধর্ম-পথেই ঈশ্বরের অনুসন্ধান করিতেছিলেন।

তাঁহারা উপাস্য দেবতার প্রাচীন নাম গুলি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু যাহার নাম নির্দেশ করিতে তাঁহারা যত্নবান্ ছিলেন, তাহাতে বিশ্বাস করিতে বিরত হন নাই। তাঁহারা তাঁহাদের প্রাচীন দেবগণের বেদি ভাঙ্গিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভগ্নাবশিষ্ট ইষ্টকাদি লইয়া অজ্ঞাত অনামকৃত তথাপি সর্বব্যাপী ঈশ্বরের এক নূতন বেদি নিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহারা আর তখন পর্বত, নদী, আকাশ, সূর্য, চন্দ্র বা বজ্র প্রভৃতিতে ঈশ্বর দেখিতেন না। তাঁহারা তখন আপনাদের সম্মুখে, আপনাদের চারিদিকে, আপনাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করিলেও সেই ঈশ্বরকে আর সর্বব্যাপী, সর্ববিষয়ালম্ব বরণ বলিয়া মনে করিতেন না।

### স্বর্গীয় নামের উদ্দেশ্য।

প্রাচীন বৈদিক কবিগণ কখনও বলেন নাই যে, মিত্র বরণ ও অগ্নি কেবল নাম মাত্র—নাম মাত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাঁহারা বলিয়াছেন (১), “তাঁহারা মিত্র, বরণ ও অগ্নির কথা কহিতেছেন। তিনি স্বর্গীয় পক্ষী গরুড়, তিনি সৎ ও অদ্বিতীয়, কবিগণ তাঁহাকেই নানা রূপে কহিয়া থাকেন; তাঁহারা যম, অগ্নি বায়ুর কথাও কহিয়া থাকেন।”

এস্থলে আমরা এই তিনটি বিষয় দেখিতেছি। প্রথমতঃ, সৎ অনির্কচ-নীয় কিছু যে, আছে, কবিগণ তাহাতে কখনই সন্দেহ করিতেন না। অগ্নি, ইন্দ্র, বরণ প্রভৃতি কেবল ঐ কিছুর নাম মাত্র।

(১) ঋগ্বেদ, ১ম, ১৬৪, ৪৬,

ইন্দ্রঃ মিত্রঃ বরণঃ অগ্নিমাহঃ

অথো দিব্যঃ সঃ স্পর্গঃ গরুড়ান্

একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি,

অগ্নি যমঃ মাতরশ্বিনামাহঃ।

দ্বিতীয়তঃ, এই প্রকৃত অনির্কচনীয় কিছু একমাত্র, ইহার দ্বিতীয় নাই।

তৃতীয়তঃ এই সৎ অনির্কচনীয় কিছু প্রজাপতি প্রভৃতি দেবগণের  
ন্যায় পুংলিঙ্গে উক্ত না হইয়া ক্লীবলিঙ্গে উক্ত হয়।

ক্লীবলিঙ্গ নাম পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ নাম হইতে মহৎ।

ক্লীব নাম যে, পুং বা স্ত্রী নাম অপেক্ষা মহৎ ও প্রশস্ত, ইহা শুনিতে  
ভাল বোধ হয় না। স্বর্গীয় নাম যে, ক্লীবলিঙ্গে কল্পিত হইবে, ইহা  
আমরা দেখিতে পারি না। ক্লীবলিঙ্গ শব্দে আমাদের নিকট কোন  
জড়, নিশ্চেষ্ট বা মৃত পদার্থ বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু প্রাচীন ভাষায় বা  
প্রাচীন চিন্তায় ক্লীবলিঙ্গ শব্দে ঐ রূপ বুঝাইত না; আজি কালি অনেক  
আধুনিক ভাষাতেও উহা প্রথম অর্থে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায় না। প্রাচীন  
আর্য্যগণ ক্লীবলিঙ্গ মনোনীত করিয়া উহা দ্বারা এরূপ কোন বিষয় প্রকাশ  
করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, উহা কোন পুরুষ বা কোন স্ত্রী হইবে না,  
উহা দুর্বল মানব-প্রকৃতির অতীত হইবে এবং উহা স্ত্রী, পুরুষ বা তদপেক্ষা  
কোন অপকৃষ্ট পদার্থ না বুঝাইয়া কোন উচ্চতর ও উৎকৃষ্ট পদার্থ বুঝাইবে।  
তাহারা সজীব অথচ লিঙ্গবিহীন ঈশ্বরের অনুসন্ধান করিতেন। এরূপ  
অনেক স্থলে দেখা যায় যে, কবিগণ বহু নামযুক্ত এক ঈশ্বরের পুংলিঙ্গ  
কল্পনা করিয়াছেন। সূর্য্যের উদ্দেশে যে স্তোত্র উক্ত হইয়াছে—যে স্তোত্রে  
পক্ষীর সহিত সূর্য্যের সাদৃশ্য কল্পনা করা হইয়াছে (১), তাহাতে এই  
পুংলিঙ্গেরই নির্দেশ দেখা যায়ঃ—“বিভ্র কবিগণ ঐ একমাত্র পক্ষীকে  
বাক্য দ্বারা নানা রূপে বর্ণন করেন।” আমাদের চক্ষে এই স্তোত্র পৌরা-  
ণিক গল্প মাত্র বলিয়া বোধ হয়।

নিম্নলিখিত কবিতায় পরমদেবতা অল্প পৌরাণিক অথচ সাকারভাবে  
এইরূপ বর্ণিত হইয়াছেনঃ—(২)

১ ঋগ্বেদ, ১০ম, ১১৪, ৫,  
স্বপর্ণং বিপ্রাঃ কবয়ঃ বাচোভিঃ  
একং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি।

২। ঐ, ১৬৪, ৪।

“কে তাহাকে প্রথমে জন্ম গ্রহণ করিতে দেখিয়াছে? যাহার অস্থি নাই, কে তাঁহাকে অস্থিবিশিষ্ট পদার্থ ধারণ করিতে দেখিয়াছে?”

জগতের প্রাণ, রক্ত, ও আত্মাই বা কোথায় ছিল? যিনি ইহা জানিতেন, কে ই বা তাঁহার নিকট ইহা জানিতে গিয়াছিল?”

উপরোক্ত শ্লোকের প্রত্যেক কথা ভাবে পরিপূর্ণ। যিনি আকার-শূন্য বা নিরাকার, এই ভাব বুঝাইবার জন্য আমরা যেমন “যাহার আকার নাই” এই বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকি, উপস্থিত স্থলে সেই রূপ “যাহার অস্থি নাই” বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে “যাহার অস্থি আছে” এই বাক্য, “যাহার আকার আছে,” বা “যিনি আকারবদ্ধ” এই অর্থ প্রকাশ করিতেছে। যে অজ্ঞাত বা অদৃশ্য শক্তি জগৎ পালন করিতেছে, তাহা জগতের প্রাণ ও রক্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আজি কালি আমরা যাহাকে জগতের মূল পদার্থ বা সারাংশ বলিয়া থাকি, তাহা “প্রাণ” শব্দ দ্বারা পরিষ্কৃত হইয়া থাকে।

### অন্তরাঙ্গা।

প্রাণ—সংস্কৃত ‘আত্মন’ শব্দ সচরাচর ইংরেজী self শব্দে ভাষান্তরিত হইয়া থাকে। আদৌ এই শব্দে শ্বাস তৎপরে জীবন এবং কখন কখন শরীরও বুঝাইত। কিন্তু প্রায়ই ইহা “আত্মা” অর্থে প্রযুক্ত হইত। ইহা ক্রমে self শব্দের ন্যায় একটী সাধারণ বৈয়াকরণিক সংজ্ঞায় পরিণত হয়। যাহা হউক, ইহা কেবল এই সংজ্ঞার মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া ভারতের—এমন কি সমস্ত জগতের একটী অত্যাচ্চ দার্শনিক সংজ্ঞার অন্তর্গত হইয়া উঠে। ইহা কেবল “অহম্” বা “আমি” অর্থে প্রযুক্ত হইত না। যেহেতু এই “অহম্” বা “আমি” ইহ জীবনের অনিত্য উপাদানে সংগঠিত। ইহাতে “অহম্” বা “আমি”র অতীত অথচ অহংএর আশ্রয়-স্বরূপ কোন পদার্থ বুঝাইত। ইহা কিছুকাল পরে মানব-প্রকৃতি-স্বলভ অহংএর অবস্থা ও বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া পবিত্র আত্মা বলিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে।



অন্যান্য ভাষাতে যে যে শব্দ আদৌ স্বাস্ বুঝাইয়া পশ্চাৎ জীবন, জীবনী শক্তি ও আত্মা বুঝাইয়াছে, সেই সকল শব্দের সহিত আত্মন শব্দের প্রভেদ দেখা যায়। অতি প্রাচীন কালে উহার স্বাস্ অর্থ বিলুপ্ত হইয়া যায়। পশ্চাৎ উহা উহার প্রথমার্থ-বর্জিত হইয়া এবং সর্ব্ব নামের কার্য্য করিয়া লাতিন amima বা amimus এবং সংস্কৃত অস্ম বা প্রাণ শব্দ অপেক্ষা অধিকতর সূক্ষ্ম বস্তুর গতির উপায়ভূত উঠে। উপনিষদে “আত্মায় বিশ্বাস” অপেক্ষা “প্রাণে বিশ্বাস” কথা দার্শনিক জ্ঞানের অধিকতর হীনাবস্থা বিকাশ করিয়া থাকে। ইংরেজীতে যেমন I অপেক্ষা selfএর প্রাধান্য অধিক, হিন্দুদিগের মধ্যে সেইরূপ প্রাণ অপেক্ষা আত্মার প্রাধান্য অধিক ছিল। পরিশেষে আত্মাতে প্রাণ বিলীন হইয়া যায়।

ভারতের প্রাচীন দার্শনিকগণ শেষে এইরূপে তাঁহাদের জীবনের আশ্রয়ভূত অহম্‌এর অতীত অনন্ত অন্তরাত্মা আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

### বাহ্যাত্মা।

এক্ষণে দেখা যাউক, ভারতীয় আখ্যগণ কি রূপে বাহ্য জগতে অনন্তের আবিষ্কার করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

বৈদিক কবিগণ কিছুকাল একমাত্র অদ্বিতীয়েই পরিতৃপ্ত ছিলেন। এই এককে তাঁহারা একেশ্বর মনে কবিতেন, কিন্তু এই ঈশ্বরের সম্বন্ধেও কখন কখন পৌরাণিক গল্প কথিত হইত এবং ইনিও পুংলিঙ্গে উক্ত হইতেন। বস্তুত ইনি স্বর্গীয় আত্মা বলিয়া পরিগণিত না হইয়া স্বর্গীয় অহং বলিয়া পরিগণিত হইতেন। আবার আমরা হঠাৎ বেদের ভিন্ন প্রকৃতির কবিতার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হই। এই সকল কবিতা পাঠে বোধ হয়, যেন আমরা এক নূতন জগতে বিচরণ করিতেছি। এখানে পৌরাণিক কথা-মূলক প্রত্যেক দেহ, প্রত্যেক নামই যেন আত্মসমর্পণ করে, এখানে কেবল সং কিংবা একমাত্রের বিকাশ দেখা যায়। ইহাই যেন অনন্ত অব-ধারণের শেষ চেষ্টা। বেদে এক, অদ্বিতীয় ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ইহার পর বৈদিক কবিগণকে আর আকাশ, উষা প্রভৃতির স্তুতি করিতে দেখা যায় না। তাঁহারা আর ইন্দ্রের ক্ষমতায় মুগ্ধ হন না, এবং বিশ্বকর্মা ও প্রজাপতির জ্ঞান-বিকাশেও প্রীত হন না। তাঁহারা স্বয়ংই কহেন, তাঁহারা “যেন কুজ্জাটিকা ও বৃথা বাক্যে পরিবৃত হইয়া বিচরণ করিতেছেন (১)। অপর কবি বলেন (২), “আমার চক্ষু ক্ষীণ হইতেছে, আমার কণ্ঠ ক্ষীণ হইতেছে, আমার হৃদয়ের আলোক ক্ষীণতর হইতেছে, আমার দুর্ভাগ্যগ্রস্ত মনও আমাকে পরিত্যাগ করিতেছে, আমি কি ই বা বলিব, কি ই বা ভাবিব” ?

তাহার পর আর একস্থলে দেখা যায়, “কিছুই না জানিয়া,—অনভিজ্ঞ, আমি জ্ঞানী ঋষিদিগকে জিজ্ঞাসা কবিতেছি, যিনি এই ষড়্ জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই কি সেই এক, যিনি অজাত ও যিনি নিয়ত বিরাজমান রহিয়াছেন” (৩) ?

যে ঋটিকার অবসানে আকাশ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিবে, অভিনব বসন্তের সমাগম দেখা যাইবে, উল্লিখিত ভাব সকল সেই ঋটিকার প্রারম্ভ।

পরিশেষে বেদে (৪) অদ্বিতীয়ের বিংয় সাহসসহকারে সমর্থিত হইয়াছে। এই এক, অদ্বিতীয় সমুদয় সৃষ্ট পদার্থের পূর্বে, সমুদয় দেবগণের পূর্বে বর্তমান ছিলেন। কোথা হইতে ইহার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা দেবতারাও অবগত নহেন।

আমরা বেদে দেখিতে পাই, সমুদর বস্তব পূর্বে, মৃত্যু ও অমরত্বের পূর্বে এবং দিবা রাত্রির প্রভেদের পূর্বে, কেবল সেই এক, অদ্বিতীয়ই বিদ্যমান ছিলেন। এই এক, অদ্বিতীয় স্বয়ং শ্বাসবিহীন হইলেও শ্বাস প্রশ্বাস লইতেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। প্রথমে সমস্তই ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল। সমুদয়ই আলোক-শূন্য সমুদ্রের ন্যায় বোধ

১। ঋগ্বেদ ১০ম, ৮২, ৭।

২। ঐ ৬ষ্ঠ, ৯, ৬,

৩। ঐ ১ম, ১৬৪, ৬,

৪। ঐ ১০ম, ১২৯, ২।

হইত। অনন্তর তুষারাবৃত বীজ—সেই এক অদ্বিতীয় তাপপ্রভাবে আবি-  
ভূত হন”। এইরূপে কবি সৃষ্টির প্রারম্ভবিষয়ক কঠিন সমস্যার উদ্বেদ  
করিয়াছেন, এক ক্রিকে বহু প্রাপ্ত হইল, অবিদিত ক্রিকে বিদিত  
ও নামযুক্ত হইল, এবং অনন্ত ক্রিকে অন্তবান্ হইয়া উঠিল, তাহা এইরূপে  
উল্লেখ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। পরিশেষে তাঁহার মুখ হইতে এই বাক্য  
নিঃসৃত হইয়াছে:—

“কে এই সকল গুপ্ত বিষয় অবগত আছে? কে ই বা ইহা প্রচার  
করিয়াছে? এই সুবিশাল বিশ্ব কোথা হইতেই বা উদ্ভূত হইল?  
দেবগণ পরে সৃষ্ট হইয়াছেন, কে জানে তাঁহারা কোথায় সৃষ্ট  
হইয়াছেন? যাহা হইতে এই বিশাল বিশ্ব আবিভূত হইয়াছে, তাহা  
তাঁহার ইচ্ছাতে সৃষ্ট হইয়াছে কি না, তাহা সেই সৰ্বদর্শী, স্বর্গবাসী ঈশ্বরই  
জানেন। হয়ত তিনি ইহা নাও জানিতে পারেন”।

ঋগ্বেদের স্তোত্রে এই প্রকার যে সকল ভাব প্রথমোদিত ক্ষীণজ্যোতি  
নক্ষত্রের ন্যায় বোধ হয়, কালসহকারে তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে  
এবং কালসহকারে তাহাদের এই ক্ষীণ আলোক অধিকতর উজ্জল হইয়া  
উঠে। পরিশেষে তৎসমুদয় উপনিষদে একটী সম্পূর্ণ ছায়াপথে সম্মিলিত  
হয়। এই উপনিষদ বৈদিক কালের অন্তর্গতও বৈদিক কালের শেষাংশে  
রচিত। কিন্তু এই সীমার বাহিরেও উহা আপনার প্রভাব বিকাশ করিয়া  
থাকে।

### উপনিষদের দার্শনিক ভাব।

স্তোত্র-কালের পরেই ব্রাহ্মণ-কাল। ব্রাহ্মণ গদ্যে রচিত, প্রাচীন যাগ  
যজ্ঞের বর্ণন ইহার উদ্দেশ্য।

ব্রাহ্মণকালের পর “আরণ্যক” দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা গৃহস্থা-  
শ্রম পরিত্যাগ করিয়া বিজন অরণ্যের নিভৃত প্রদেশ আশ্রয় করেন, এ গ্রন্থ  
তাঁহাদের জন্য।

এই আরণ্যকের শেষে বা ইহার সঙ্গে প্রাচীন “উপনিষদ” দৃষ্ট হইয়া থাকে। উপনিষদের প্রকৃত অর্থ গুরু-সন্নিধানে ছাত্রসমূহের সমাগম। এই সকল উপনিষদে বৈদিক কালের ধর্মসম্বন্ধীয় দার্শনিক মত সংগৃহীত হইয়াছে। উপনিষদের গভীর ভাব—চিন্তার অপূর্ণ বিকাশ যাহাতে আপনাদের সম্মুখে পরিষ্কৃত হয়, তাহার জন্য উপস্থিত প্রস্তাবে উপনিষদের সমস্ত মত গুলিই ব্যাখ্যা করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম; এই সম্বন্ধে অনেক বিষয় আমার নিকট সংগৃহীত ছিল; কিন্তু সময় অল্প থাকাতে আমি অতি সংক্ষেপে এ বিষয়ের বর্ণনা করিতেছি।

প্রকৃত দার্শনিক পদ্ধতিতে যাহা বুঝায়, তাহা উপনিষদে কিছুই নাই। উপনিষদ মতের অনুমান মাত্র, পরস্পর বিষংবাদী হইলেও এই সকল মতকে এক দিকে ধাবিত হইতে দেখা যায়। “আত্মজ্ঞান-লাভ”ই—প্রাচীন উপনিষদের মূল উদ্দেশ্য, এই “আত্মজ্ঞান-লাভের” অর্থ অতি গভীর। উপনিষদের “আত্মজ্ঞান-লাভ” শব্দে প্রকৃত আত্মজ্ঞান বুঝায়, যাহা “অহং”এর অন্তর্নিবিষ্ট তাহার জ্ঞান অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ ও অনন্ত আত্মাতে সমস্ত জগতের অন্তর্নিহিত একমাত্র অদ্বিতীয়ের জ্ঞানই উপনিষদের মতে প্রকৃত আত্ম-জ্ঞান।

অনন্ত, অদৃশ্য, অজ্ঞাত ও স্বর্গীয়ের জন্য অনুসন্ধানের ইহাই শেষ ও চূড়ান্ত ফল। এই অনুসন্ধান প্রথমে বেদের অতি সামান্য স্তোত্রে আরম্ভ হইয়া পরিশেষে উপনিষদে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। স্মৃতরাং উপনিষদ বেদান্ত বা বেদের শেষভাগ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

ভারতের—এমন কি সমস্ত জগতের এই অনুপম, মনোহর, সারগর্ভ ও অদ্বিতীয় সাহিত্য হইতে এ স্থলে কিছু উদ্ধৃত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না।

### প্রজাপতি ও ইন্দ্র।

প্রথমে ছানোগোপনিষৎ হইতে (৮ম, ৭-১২) কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে। ইহা একটী উপাখ্যান মাত্র। ইহাতে দেবগণের অধিনায়ক ইন্দ্র ও অসুরগণের অধিনায়ক বিরোচন প্রজাপতির নিকট উপদেশ লাভ করি-

তেছেন। ঋগ্বেদের স্তোত্রের সহিত তুলনা করিলে ইহা আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ভারতের অন্যান্য সাহিত্যের মধ্যে ইহা কখনই আধুনিক নহে। দেবতা ও অসুরগণের মধ্যে বৈরভাব যে, পরবর্তী সময়ে ঘটিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঋগ্বেদে বিশেষতঃ উহার শেষ ভাগে এই বৈরভাবের চিহ্ন দেখা যায়। “অসুর” শব্দ আদৌ প্রকৃতির বিশেষতঃ আকাশের কোন শক্তির বিশেষণ-বাচক ছিল। কোন কোন স্থলে কেহ কেহ “সজীব দেবতা” শব্দ দ্বারা “দেবাসুর” শব্দের অন্তবাদ করিয়া থাকেন। কিছুকাল পরে অসুর শব্দ কোন প্রেতাশ্বার বিশেষণ হইয়া উঠে এবং পরিশেষে বহুবচনে প্রযুক্ত হইয়া সদাশ্রা দেবগণের অসদৃশ দৃষ্ট যোনির নাম হয়। ব্রাহ্মণে এই প্রভেদ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। দেবতা ও অসুরগণের মধ্যে কেবল যুদ্ধ দ্বারাষ্ট প্রায় সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা হইয়া থাকে।

ইন্দ্র যে, দেবগণের অধিনায়ক বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, তাহা অতি স্বাভাবিক। বিবোচন নামটী আধুনিক। স্তোত্রে উহার উল্লেখ নাই। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে সর্বপ্রথমে বিবোচনের আবির্ভাব দেখা যায়। উক্ত ব্রাহ্মণের ১ম, ৫, ৯, ১ শ্লোকে বিবোচন প্রহ্লাদ ও কয়াধুর পুত্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। এই উপাখ্যানে প্রজাপতির প্রধান দেবত্ব কল্পিত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১ম, ৫, ৯, ১) প্রজাপতি ইন্দের পিতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

যে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা হইতে ক্রমে প্রকৃত আত্মজ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা দেখাইবার জন্যই এই উপাখ্যানের বিষয় পরিকীর্তিত হইতেছে। প্রজাপতি প্রথমে অস্পষ্ট ভাবে কহিতেছেন,—“যে পুরুষ চক্ষুঃমধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকেন, তিনিই আত্মা”। ইহা দ্বারা তিনি চক্ষুর অনধীন দর্শক বুঝাইলেন। কিন্তু তাহার ছাত্রেবা তাহা বুঝিতে পারিল না। বিবোচন মনে করিলেন, যে ক্ষুদ্র দেহ দর্পণের ন্যায় চক্ষুর তাড়াতে দৃষ্ট হয়, তাহাই আত্মা। পক্ষান্তরে ইন্দ্র বুঝিলেন, দর্পণে কিংবা জলে যে ছায়া প্রতিবিম্বিত হয়, তাহাই আত্মা হইবে। বিবোচন নিজের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু ইন্দ্র আপনার ব্যাখ্যার পরিতপ্ত হইলেন না। তিনি প্রথমে ইন্দ্রিয় জ্ঞান-রহিত ও স্বপ্নগত কোন পদার্থে আত্মার অনুসন্ধানে যত্নবান হইলেন, তৎপরে

যে ব্যক্তি স্বপ্ন হইতে বিরত হইয়াও সম্পূর্ণ অচেতন রহিয়াছে, তাহাতে আত্মার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহা একবারে সৰ্ব্বধ্বংস অর্থাৎ নির্বাণ বলিয়া বোধ হওয়ায় ইন্দ্র অসন্তুষ্ট হইয়া অবশেষে দেখিলেন, যিনি ইন্দ্রিয়গণের ব্যবহার করিয়া থাকেন, অথচ ইন্দ্রিয়গণ হইতে যিনি পৃথক্, তিনিই আত্মা; যিনি চক্ষুমধ্যে দৃষ্ট হন, অর্থাৎ যিনি চক্ষুমধ্যে দর্শকরূপে অনুভূত হন, অথবা যিনি আপনাকে বোদ্ধা বা বেদিতা বলিয়া জানেন, এবং স্বর্গীয় চক্ষুরূপ মন যাহার যন্ত্র স্বরূপ, তিনিই আত্মা। অরণ্যবাসীরা যেকূপে সত্যের চরমোৎকর্ষের বিকাশ দেখিয়াছিলেন, এবং যেকূপে অনন্তের জন্য গভীর অন্বেষণ করিয়া, অনুসন্ধান বিষয়ের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা এই স্থলে প্রদর্শিত হইল।

### সপ্তম খণ্ড।

‘প্রজাপতি বলিলেন, “যাহা পাপ হইতে বিমুক্ত, বার্ককা, মৃত্যু, শোক, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা হইতে বিমুক্ত, যাহা কামনার যোগ্য বিষয় ছাড়া কিছুই কামনা করে না, যাহা চিন্তার যোগ্য বিষয় ছাড়া কিছুই চিন্তা করেনা, তাহাই আত্মা। এই আত্মা আমাদের অনুসন্ধান এবং এই আত্মা উপলব্ধি” করিতে আমাদের চেষ্টা করা কর্তব্য। যিনি এই আত্মার অনুসন্ধান করিয়া, তাহাকে জানিতে পারেন, তিনিই সৰ্ব্বজগৎ ও কামনা লাভ করিতে সক্ষম হন”। ১।

‘দেবতা ও অমুরগণ ইহা শুনিয়া বলিল, “আমরা এবংবিধ আত্মার অনুসন্ধান তৎপর হই, যিনি অনুসন্ধান করিয়া ইহা জানিতে পারিবেন, তিনি ইহা দ্বারা সৰ্ব্বজগৎ ও সৰ্ব্বকামনা লাভ করিতে সমর্থ হইবেন”।

‘এই রূপ কহিয়া ইন্দ্র দেবতাদিগের নিকট হইতে ও বিরোচন অমুরগণের নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন, এবং পরস্পর পরস্পরের সহিত কোন রূপ আলাপ না করিয়া, গুরুসমীপে উপনীত হইবার প্রথা অনুসারে সমিধ্ হস্তে প্রজাপতির সন্নিধানে উপনীত হইলেন”। ২।

‘তাহারা তথায় ছাত্ররূপে বত্রিশ বৎসর অবস্থিতি করিলে প্রজাপতি

তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমরা কি জন্য এখানে অবস্থান করিতেছ ?”

‘তাঁহারা বলিলেন, আপনি কহিয়াছেন, “যাহা পাপ হইতে বিমুক্ত, বার্কিকা, মৃত্যু, শোক, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা হইতে বিমুক্ত, যাহা কামনার যোগ্য বিষয় ছাড়া কিছুই কামনা করে না, যাহা চিন্তার যোগ্য বিষয় ছাড়া কিছুই চিন্তা করে না, তাহাই আত্মা। এই আত্মা আমাদের অনুসন্ধান এবং এই আত্মা উপলব্ধি করিতে আমাদের চেষ্টা করা কর্তব্য, যিনি অনুসন্ধান কবিয়া ইহা জানিতে পারেন, যিনি সর্বজগৎ ও সর্বকামনা লাভ করিতে সক্ষম হন, আমরা এই আত্মা লাভ করিবার ইচ্ছায় এখানে অবস্থান করিতেছি” ৩।

‘প্রজাপতি কহিলেন “যে পুরুষ চক্ষুর মধ্যোদৃষ্ট হন (১), তিনিই আত্মা। আমি তাহাই বলিয়াছি। ইহাই অমর ও অভয় এবং ইহাই ব্রাহ্মণ”।

“তাঁহারা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘মহাশয় ! যিনি জলে ও দর্পণে দৃষ্ট হন, তিনি কে’ ?

‘প্রজাপতি উত্তর করিলেন; “তিনি স্বয়ং কেবল এই সকলের মধ্যে দৃষ্ট হন’ (২)। ৪।

১ টীকাকার যথাযথরূপে, ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যিনি চক্ষুে দৃষ্ট হন, যিনি দৃষ্টির যথার্থ কারণ, জানীরা চক্ষু নিম্নলিখিত করিয়াও ঐহাকে দেখিয়া থাকেন, প্রজাপতি সেই পুরুষকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ছাত্রেরা তাঁহার কথা বুঝিতে পারেন নাই। ছাত্রেরা বুঝিয়াছেন, যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনিই আত্মা, যে পুরুষ দেখেন, তিনি নহেন। চক্ষুে যে পুরুষ দৃষ্ট হন, ইহার অর্থ তাঁহাদের নিকট চক্ষু-প্রতিফলিত ক্ষুদ্র আকৃতি বলিয়া বোধ হইয়াছিল, এই জন্য তাঁহারা জল কিংবা দর্পণের মধ্যগত ছায়া আত্মা কিনা, তাহাই প্রজাপতিকে জিজ্ঞাসা করেন।

২। প্রজাপতি যে, মিথ্যা বলেন নাই, টীকাকার তাহা সপ্রমাণ করিতে যথেষ্ট আগ্রাস স্বীকার করিয়াছেন। তিনি পুরুষ অর্থে দেহসম্বন্ধীয় “আত্মা” নির্দেশ করিয়াছেন, ছাত্রেরা যে, উহা সামান্য মনুষ্য বা শরীর অর্থে বুঝিয়াছে, তাহা তাঁহার দোষ নয়।



## অষ্টম খণ্ড ।

‘জলপূর্ণ পাত্রে তোমার আত্মার প্রতি দৃষ্টিপাত কর এবং তদ্বিষয়ে যাহা বুঝিতে না পাব, আমার জিজ্ঞাসা কর ।’

‘তাহারা জল পাত্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, তখন প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, “তামরা কি দেখিলে” ?

‘তাহারা বলিলেনঃ—“আমরা উভয়েই আত্মার দর্শন লাভ করিলাম । উহা কেশ ও নখ-বিশিষ্ট প্রতিকৃতি বলিয়া বোধ হইল” । ১ ।

‘প্রজাপতি কহিলেনঃ—“তোমরা গাত্র ধৌত করিয়া ও বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া পুনর্বার জল-পাত্রে দৃষ্টিপাত কর ।”

‘তাহারা গাত্র ধৌত করিয়া উত্তম বস্ত্র পরিধান ও অলঙ্কার ধারণপূর্বক পুনরায় জল-পাত্রে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন ।’

‘প্রজাপতি কহিলেন, “তোমরা কি দেখিতেছ” ? ২ ।

‘তাহারা কহিলেনঃ—“আমরা যেমন বেশভূষায় সজ্জিত ও যেমন ধৌত-কলেবর হইয়াছি, আপনাদিগেও ঠিক সেইরূপ দেখিতেছি, মহাশয় ! আমরা উত্তম রূপে অলঙ্কৃত, উত্তম বস্ত্র-পরিহিত ও উত্তম রূপে পরিষ্কৃত বহিয়াছি ।”

‘প্রজাপতি কহিলেনঃ—“উহাই আত্মা, উহাই অমর ও অভয় এবং উহাই ব্রাহ্মণ ।”

‘তখন উভয়েই সন্তুষ্টচিত্তে প্রস্থান করিলেন ! অনন্তর প্রজাপতি তাহাদের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, “ইহারা আত্মাকে বুঝিতে না পারিয়া এবং আত্মাকে দর্শন করিতে সমর্থ না হইয়া, চলিয়া গেল, এক্ষণে দেবতা ও অশুরদের মধ্যে যে কেহ এই উপনিষদের অনুবর্তী হইবে, তাহারই মৃত্যু হইবে” ।

‘এদিকে বিবোচন দৃষ্টচিত্তে অশুরগণের নিকট উপনীত হইয়া তাহাদিগকে এই উপদেশ দিতে আরম্ভ করিল যে, আত্মা (শরীর)ই কেবল উপাস্য এবং আত্মাই (শরীর) একমাত্র সেবার যোগ্য । যাহারা আত্মার উপাসনা করেন এবং সেবার তৎপর, হন, তাহারা ইহ ও পর জগৎ, উভয়েই লাভ করিয়া থাকেন ।’

‘এজন্য যে ব্যক্তি ভিক্ষা না দেয়, যাহার বিশ্বাস নাই, এবং যে বলি প্রদান না করে, সে অসুর বলিয়া উক্ত হয়। যেহেতু এটা অসুরদিগের উপনিষৎ। তাহারা গন্ধদ্রব্য পুষ্প ও উৎকৃষ্ট বস্ত্র দ্বারা মৃত শরীরের শোভা সম্পাদন করে এবং মনে করে যে, তাহারা এইরূপে পর জগৎ জয় করিতে পারিবে’। ৫।

### নবম খণ্ড।

‘এ দিকে ইন্দ্র দেবগণসমীপে উপনীত হইবার পূর্বে ভাবিয়া দেখিলেন, যখন শরীর অলঙ্কৃত হইলে আত্মা (জল-মধ্যগত ছায়া)ও (১) অলঙ্কৃত হয়, শরীর উত্তম বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইলে আত্মাও উত্তম বস্ত্রাচ্ছাদিত হয়, এবং শরীর পরিস্কৃত হইলে আত্মাও পরিস্কৃত হইয়া থাকে, তখন শরীর অন্ধ হইলে আত্মাও অন্ধ হইবে, শরীর খঞ্জ হইলে আত্মাও খঞ্জ হইবে, শরীর বিকলাঙ্গ হইলে আত্মাও বিকলাঙ্গ হইয়া উঠিবে, শরীরের ধ্বংসের সহিত আত্মারও ধ্বংস হইবে, সুতরাং আমি এই উপনিষদের কার্যকারিতা কিছুই দেখিতেছি না’ ১।

“তিনি পুনরায় সমিধ্বস্তে প্রজাপতির সমীপে উপস্থিত হইলেন। প্রজাপতি কহিলেনঃ—“মঘবন্! তুমি সন্দ্বষ্টহৃদয়ে বিরোচনের সহিত এই কতক্ষণ হইল গিয়াছ, আবার এখন তোমার প্রত্যাগমনের কাবণ কি” ?

‘ইন্দ্র কহিলেন, যখন শরীর অলঙ্কৃত হইলে আত্মা (জল-মধ্যগত-ছায়া) অলঙ্কৃত হয়, শরীর উত্তম বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইলে আত্মাও উত্তম বস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়, এবং শরীর পরিস্কৃত হইলে আত্মা পরিস্কৃত হইয়া থাকে, তখন শরীর অন্ধ হইলে আত্মাও অন্ধ হইবে, শরীর খঞ্জ হইলে আত্মাও খঞ্জ হইবে, শরীর বিকল হইলে আত্মাও বিকল হইয়া উঠিবে এবং শরীরের ধ্বংসের সহিত আত্মারও ধ্বংস হইবে; সুতরাং আমি এই উপনিষদের কার্য কারিতা কিছুই দেখিতেছি না।’

১। টীকাকার নির্দেশ করিয়াছেন যে, ইন্দ্র ও বিরোচন, উভয়েই প্রজাপতির কথার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। বিরোচন শরীরকে আত্মা বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, আর ইন্দ্র শরীরের ছায়াকে আত্মা ভাবিয়াছিলেন।

‘প্রজাপতি উত্তর করিলেনঃ—“ইন্দ্র ! তুমি যাহা বলিলে তাহাই ঠিক, তুমি আর বত্রিশ বৎসর আমার নিকট অবস্থান কর, আমি তোমাকে প্রকৃত আত্মার সম্বন্ধে আরও অনেক শিক্ষা দিব” ।

ইন্দ্র আর বত্রিশ বৎসর সেখানে থাকিলে, তৎপরে প্রজাপতি বলিতে লাগিলেনঃ—৩ ।

### দশম খণ্ড ।

“যিনি স্বপ্নে স্মৃতে সঞ্চরণ করেন তিনিই আত্মা, তিনিই অমর ও অভয় এবং তিনিই ব্রাহ্মণ” ।

‘তখন ইন্দ্র সন্তুষ্টহৃদয়ে প্রশ্ন করিলেন । কিন্তু দেবগণের নিকট উপনীত হইবার পূর্বে আবার তাঁহার সন্দেহ হইল । যদিও এক্ষণে শরীর বিকল হইলে আত্মার বৈকল্য হয় না, শরীর দুষ্ট হইলে আত্মা দুষ্ট হয় না এবং শরীর আহত হইলে আত্মা আহত হয় না, তথাপি আত্মা স্বপ্নাবস্থায় ঠিক যেন আহত ও দূরীকৃত হইতে থাকে, যেন কষ্ট অনুভব করিতে ও অশ্রুপাত করিতে থাকে । সুতরাং আমি এই উপনিষদের কার্য্যকারিতা দেখি না’ । ১ ।

“ইন্দ্র পুনরায় সমিধু হস্তে প্রজাপতির সমীপে উপনীত হইলে প্রজাপতি কহিলেনঃ—“ইন্দ্র ! তুমি সন্তুষ্টচিত্তে এখান হইতে গিয়াছে, আবার তোমার প্রত্যাগমনের কারণ কি ?”

‘ইন্দ্র কহিলেন, “মহাশয় ! যদিও এক্ষণে শরীর বিকল হইলে আত্মার বৈকল্য হয় না, শরীর দুষ্ট হইলে আত্মা দুষ্ট হয় না, এবং শরীর আহত হইলে আত্মা আহত হয় না, তথাপি আত্মা স্বপ্নাবস্থায় ঠিক যেন আহত ও দূরীকৃত হইতে থাকে, যেন কষ্ট অনুভব করিতে ও অশ্রুপাত করিতে থাকে । সুতরাং আমি এই উপনিষদের কার্য্যকারিতা দেখিতেছি না ।”

“প্রজাপতি কহিলেন, “মঘবন্ ! যাহা কহিলে, সকলই সত্য । আমার নিকট তুমি আরও বত্রিশ বৎসর অবস্থান কর ; আমি প্রকৃত আত্মার সম্বন্ধে তোমাকে আরও কিছু শিক্ষা দিব ।”

ইন্দ্র আর বত্রিশ বৎসর অবস্থান করিলে প্রজাপতি কহিলেনঃ—৪ ।

## একাদশ খণ্ড ।

“যখন মনুষ্য স্বচ্ছন্দে বিশ্রাম করিতে করিতে নিদ্রাভিত্ত হয় এবং স্বপ্ন দেখিতে ক্রান্ত থাকে, তখন তাহাই আত্মা, তাহাই অমর ও অভয় এবং তাহাই ব্রহ্মণ ।”

‘ইন্দ্র সন্তুষ্টচিত্তে প্রশ্ন করিলেন । কিন্তু দেবগণসমীপে উপনীত হইবার পূর্বে আবার তাঁহার সন্দেহ হইল । যিনি আর আপনাকে (আপনার আত্মাকে) ‘আমি’ বলিয়া জানিতে পারেন না, অথবা বর্তমান কোন বস্তুই জানিতে সমর্থ হন না, তিনিত একবারেই নির্কারণ প্রাপ্ত হইলেন । সুতরাং আমি এই উপনিষদের কার্যকারিতা দেখিতেছি না । ১ ।

‘ইন্দ্র পুনরায় সমিধ্বস্তে প্রজাপতির সমীপে উপনীত হইলেন । প্রজাপতি তাহাকে কহিলেন, “মঘবন্ ! তুমি সন্তুষ্টচিত্তে গিয়াছ, আবার তোমার প্রত্যাগমনের কারণ কি ?”

‘ইন্দ্র কহিলেন, তিনি এই উপায়ে আপনাকে (আপনার আত্মাকে) ‘আমি’ বলিয়া জানিতে পারেন না, অথবা তিনি বর্তমান কোন বস্তুও জানিত সমর্থ হন না । তিনিত একবারেই নির্কারণ প্রাপ্ত হইলেন । আমি এই উপনিষদের কার্য-কারিতা দেখিতেছি না ।’

‘প্রজাপতি কহিলেনঃ—‘ইন্দ্র ! তুমি যাহা কহিলে, সকলই সত্য । তোমাকে এবার কেবল প্রকৃত আত্মার সম্বন্ধে উপদেশ দিব (১) । তুমি এখানে আর পাঁচ বৎসর অবস্থিতি কর ।’

ইন্দ্র আর পাঁচ বৎসর কাল অতিবাহিত করিলেন । এইরূপে এক শত পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইল । কথিত আছে, ইন্দ্র ছাত্ররূপে প্রজাপতির নিকট ১০৫ বৎসর অবস্থান করেন । অতঃপর প্রজাপতি কহিলেনঃ—

---

১ । শব্দের মতে প্রকৃত আত্মা, আত্মা হইতে ভিন্ন নহে ।

## দ্বাদশ খণ্ড ।

“মঘবন ! এই শরীর নশ্বর ও মৃত্যুর অধীন । ইহাতে সেই অমর ও শরীর-বিহীন আত্মা বাস করিয়া থাকেন (১) । এই শরীরেই (এই শরীর আমি, এবং আমি এই শরীর এই ভাবিয়া) আত্মা সুখ দুঃখের অনুভব করেন । যত দিন আত্মা শরীরে থাকে, তত দিন উহা সুখ দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে না । কিন্তু যখন শরীর হইতে মুক্ত হয়, (যখন আপনাকে শরীর হইতে ভিন্ন বলিয়া জানিতে পারে) তখন সুখ দুঃখ আর তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে পারে না (২) ।” ১ ।

“বায়ু, শরীর-শূন্য । মেঘবিহীন ও বজ্রও শরীর শূন্য, হস্তপদাদি-বিহীন । ইহারা যেমন স্বর্গীয় স্থান হইতে উত্থিত হইয়া সর্বোচ্চ আলোকের নিকট আগমন পূর্বক নিজ নিজ আকার ধারণ করে, ২ ।

“এই নির্মল আত্মাও সেইরূপ শরীর হইতে উত্থিত হইয়া সর্বোচ্চ আলোক (৩) অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ পূর্বক নিজ আকার ধারণ করে, এই অবস্থায় তাহাকে “উত্তম পুরুষ” বলা যায় । এই অবস্থায় তাহা নিজ জন্মস্থান শরীরকে ভুলিয়া গিয়া, জীলোকের সহিত, আপনাদের আত্মীয়গণের সহিত হাসিয়া খেলিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে থাকে (৪) ।

---

১ । কাহারও মতে শরীর আত্মার পরিণাম মাত্র । ক্ষিতি, অপ্, তেজ আত্মা হইতে উদ্ভূত হয়, শেষে আত্মা উহাদের মধ্যে প্রবেশ করে ।

২ । সাধারণ সামান্যিক সুখ ।

৩ । প্রাচীন উপমাগুলি যেমন হৃদয়-গ্রাহিণী, উপস্থিত উপমাটী সেরূপ নহে । আত্মার সহিত বায়ুর তুলনা করা হইয়াছে । আত্মা যেমন দেহে থাকে, বায়ুও তেমনি আকাশে থাকে । শেষে উভয়েই মহত্ত্ব আলোকের নিকট উপস্থিত হয় । এক দিকে ঐশ্বর্য কালীন সূর্যালোক, অপর দিকে জ্ঞানালোক ।

৪ । আত্মা যে সুখ ও শাস্তির অনিকারী, এই সকল সুখ তৎসমুদয়ের তুল্য নহে । এই অংশ প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে । অথবা একপ হইতে পারে, আত্মা অভ্যন্তরীণ দর্শক রূপে এই সকল সুখ ভোগ করিয়া থাকেন । সুখ ও দুঃখের সহিত তাঁহার একত্ব থাকে না । তিনি স্বর্গীয় চক্ৰ দ্বারা এই সমস্ত দেখিয়া থাকেন । আত্মা এই সকলের মধ্যে আপনার আত্মার অনুভব করেন মাত্র ।

‘অশ্ব যেমন রথে সংযুক্ত থাকে, সেইরূপ প্রাণ (১) এই শরীরে সংযোজিত রহিয়াছে।’ ৩।

“দৃষ্টি যেখানে (চক্ষুতরকার) প্রবিষ্ট হইয়াছে, চক্ষুর পুরুষ তথায় বিদ্যমান রহিয়াছেন। চক্ষু স্বয়ং কেবল দর্শনের যন্ত্রমাত্র। যিনি জানেন, আমি ইহা আশ্রয় করিতেছি, তিনিই আত্মা। নাসিকা কেবল আশ্রয়-বোধ-সাধক যন্ত্র মাত্র। যিনি জানেন, আমি ইহা কহিতেছি, তিনিই আত্মা। জিহ্বা কেবল কথা বলিবার যন্ত্র মাত্র। যিনি জানেন, আমি ইহা শুনিতেছি, তিনিই আত্মা। কর্ণ কেবল শ্রবণযন্ত্র মাত্র”। ৪।

“যিনি জানেন, আমি ইহা চিন্তা করিতেছি, তিনিই আত্মা। মন তাঁহার স্বর্গীয় চক্ষুমাত্র (২)। আত্মা তাঁহার এই দিব্য চক্ষুদ্বারা পরমানন্দ (যাহা মৃত্তিকা-প্রোথিত স্বর্ণের ন্যায় অপরের নিকট লুক্কায়িত রহিয়াছে) লাভ করিয়া পবিত্র হন”।

‘দেবগণ এই আত্মার (প্রজাপতি যাহা ইন্দ্রকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং ইন্দ্র যাহা দেবগণকে শিখাইয়াছেন) আরাধনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা সমস্ত জগৎ ও সূর্য অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। যিনি এই আত্মাকে জানিতে পারিয়াছেন এবং ইহার উপলব্ধি কবিত্তে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই সমস্ত জগৎ ও সমস্ত কামনা লাভ করিয়াছেন’। প্রজাপতি এইরূপ কহিলেন, প্রজাপতি এইরূপ কহিলেন।’

### যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ী ।

দ্বিতীয় অংশ বৃহদারণ্যক হইতে উদ্ধৃত হইতেছে। এই উপনিষদে উক্ত অংশের দুইবার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই অংশদ্বয়ের বিভিন্নতা অতি সামান্য।

১। দেহের সহিত প্রাণের একত্ব নাই। অশ্ব যেমন বথে সংযুক্ত হয়, ইহাও সেইরূপ দেহে সংযুক্ত হয় মাত্র। অথবা সাবমি যেমন বথ চালনা করে, ইহাও সেইরূপ দেহ চালনা করিয়া থাকে। অনান্যস্থলে ইন্দ্রিয়গণ ঘোটকস্বরূপ, বুদ্ধি সারথিস্বরূপ, মন বল্লভ-স্বরূপ। চেতনকর্তৃক প্রাণ বথে (দেহে) সংযুক্ত হয়।

২। যেহেতু ইহা কেবল বর্তমান বিষয় অনুভব করে না, ভবিষ্যৎ ও অতীত বিষয়ও জানিয়া থাকে।

ইহা প্রথমবার দ্বিতীয় অধ্যায়ে এবং দ্বিতীয়বার চতুর্থ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে (১)।

‘যাজ্ঞবল্ক্যের মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী নামে দুই স্ত্রী ছিল (২)। ইহাদের মধ্যে মৈত্রেয়ী বেদের ব্রাহ্মণ আয়ত্ত করিয়াছিলেন; কাত্যায়নীর কেবল স্ত্রীজাতি সুলভ জ্ঞান মাত্র ছিল।

যাজ্ঞবল্ক্য গৃহস্থশ্রম হইতে বানপ্রস্থশ্রমে প্রবেশকালে মৈত্রেয়ীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেনঃ—“আমি গৃহস্থশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থশ্রমে চলিলাম, অতএব তোমার ও কাত্যায়নীর মধ্যে একটি নিয়ম করিয়া যাইতে ইচ্ছা করি”। ১।

‘মৈত্রেয়ী কহিলেনঃ—“স্বামিন্! বলুন দেখি, যদি আমি এই ধনসম্পত্তি-পূর্ণ পৃথিবীর অধীশ্বরী হই, তাহা হইলে কি অমর হইতে পারি” (৩)?

‘যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেনঃ—“না, তাহা হইলে তোমার জীবন ধনবান লোক-দের জীবনের ন্যায় হইবে। ধনদ্বারা অমরত্বের কোন আশা নাই”। ২।

‘মৈত্রেয়ী কহিলেনঃ—“যাহাতে অমরত্বের কোন সম্ভাবনা নাই, তাহাতে আমার প্রয়োজন কি? স্বামিন্! আপনি অমরত্বের সম্বন্ধে যাহা জানেন, আমায় বলুন”। (৪)। ৩।

‘যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর কবিলেনঃ—“তুমি আমার প্রিয়তমা, তুমি যথার্থই প্রিয় কথা কহিয়াছ। আইস, এই খানে উপবেশন কর, (৫)। আমি তোমার কথার উত্তর দিতেছি, যাহা কহিতেছি, তাহাতে অবধান কর”। ৪।

‘অনন্তর তিনি কহিলেনঃ—“বস্তুতঃ স্বামীকে ভাল বাস বলিয়া স্বামী তোমার প্রিয় নহে। তুমি যে, আমাকে ভাল বাস, তজ্জন্যই স্বামী তোমার প্রিয়।

১। এই অংশের দ্বিতীয় বার উল্লেখের সময় পাঠের কিছু বিভিন্নতা দেখা যায়। দ্বিতীয় পাঠের মর্ম্ম খ চিহ্নিত করা গেল।

২। এই ভূমিকা কেবল দ্বিতীয় পাঠে আছে।

৩। আমি অমর হইতে পারিব কি না? খ।

৪। আমায় পরিক্রম করিয়া বলুন। খ।

৫। তুমি আমার প্রিয় হইতে প্রিয়তর, অতএব উপবেশন কর। খ।



“বস্তুতঃ স্ত্রীকে ভাল বাস বলিয়া স্ত্রী তোমার প্রিয় নহে, তুমি যে, আত্মাকে ভাল বাস, তজ্জন্যই স্ত্রী তোমার প্রিয়।

“বস্তুতঃ পুত্রগণকে ভাল বাস বলিয়া, পুত্রগণ তোমার প্রিয় নহে, তুমি যে, আত্মাকে ভাল বাস, তজ্জন্যই পুত্রগণ তোমার প্রিয়।

“বস্তুতঃ ধনসম্পত্তি ভাল বাস বলিয়া ধনসম্পত্তি তোমার প্রিয় নহে, তুমি যে, আত্মাকে ভাল বাস, তজ্জন্যই ধনসম্পত্তি তোমার প্রিয় (১)।

“বস্তুতঃ ব্রাহ্মণজাতিকে ভাল বাস বলিয়া ব্রাহ্মণ জাতি তোমার প্রিয় নহে, তুমি যে, আত্মাকে ভাল বাস, তজ্জন্যই ব্রাহ্মণ জাতি তোমার প্রিয়।

“বস্তুতঃ ক্ষত্রিয় জাতিকে ভাল বাস বলিয়া ক্ষত্রিয় জাতি তোমার প্রিয় নহে, তুমি যে, আত্মাকে ভাল বাস, তজ্জন্যই ক্ষত্রিয় জাতি তোমার প্রিয়।

“বস্তুতঃ জগৎকে ভাল বাস বলিয়া জগৎ তোমার প্রিয় নহে, তুমি যে, আত্মাকে ভাল বাস, তজ্জন্যই জগৎ তোমার প্রিয়।

বস্তুতঃ দেবগণকে ভাল বাস বলিয়া দেবগণ তোমার প্রিয় নহেন, তুমি যে, আত্মাকে ভাল বাস, তজ্জন্যই দেবগণ তোমার প্রিয় (২)।

“বস্তুতঃ প্রাণিগণকে ভাল বাস বলিয়া প্রাণিগণ তোমার প্রিয় নহে, তুমি যে, আত্মাকে ভাল বাস তজ্জন্যই প্রাণিগণ তোমার প্রিয়।

‘বস্তুতঃ সমস্ত বিষয় ভাল বাস বলিয়া সমস্ত বিষয় তোমার প্রিয় নহে, তুমি যে, আত্মাকে ভাল বাস, তজ্জন্যই সমস্ত বিষয় তোমার প্রিয়।

“হে মৈত্রেয়ি! বস্তুতঃ আত্মাকেই দর্শন, শ্রবণ ও অনুভব করা হয়। যখন আমরা আত্মাকে দর্শন করি, শ্রবণ করি, অনুভব করি ও জানি (৩), তখন এই সমস্ত আমাদের বিদিত হয়। ৫।

“যিনি আত্মা ভিন্ন অন্যত্র ব্রাহ্মণ জাতির অনুসন্ধান করিবেন, তিনি ব্রাহ্মণ-জাতি কর্তৃক পরিত্যক্ত হইবেন। যিনি আত্মা ভিন্ন অন্যত্র ক্ষত্রিয় জাতির অন্বেষণ করিবেন, তিনি ক্ষত্রিয় জাতি কর্তৃক পরিত্যক্ত হইবেন। যিনি আত্মা

১। ইহাব পৰ খতে উল্লেখ আছে “বস্তুতঃ গবাদি গৃহপালিত পশুকে ভাল বাস বলিয়া,” ইত্যাদি।

২। খতে উল্লেখ আছে, “বস্তুতঃ বেদকে ভাল বাস বলিয়া” ইত্যাদি।

৩। যখন আত্মা দৃষ্ট হয়, শ্রুত হয়, অনুভূত হয়, এবং পৰিজ্ঞাত হয়। খ।

ভিন্ন অন্যত্র জগৎ অন্বেষণ করিবেন, তিনি জগৎকর্তৃক পরিত্যক্ত হইবেন। যিনি আত্মা ভিন্ন অন্যত্র দেবগণের অনুসন্ধান করিবেন, তিনি দেবগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইবেন (১)। যিনি আত্মা ভিন্ন অন্যত্র প্রাণিগণের অন্বেষণ করিবেন, তিনি প্রাণিগণকর্তৃক পরিত্যক্ত হইবেন। যিনি আত্মা ভিন্ন অন্যত্র সমস্ত বিষয়ের অন্বেষণ করিবেন, তিনি সমস্ত বিষয়কর্তৃক পরিত্যক্ত হইবেন। এই ব্রাহ্মণজাতি, এই ক্ষত্রিয় জাতি, এই জগৎ, এই দেবগণ (২) এই প্রাণিগণ এবং এই সমস্তই আত্মা”। ৬।

“যেমন বাদ্যমান ঢকা বা উহার বাদনকারীকে না ধরিলে বাদ্যমান ঢকার শব্দ ধরা যাইতে পারে না ; ৭।

“যেমন শব্দায়মান শঙ্খ বা উহার ধ্বনি-কারককে না ধরিলে শঙ্খের ধ্বনি ধরা যাইতে পারে না” ; ৮।

“যেমন বংশী বা বংশি-বাদকে না ধরিলে বংশি-ধ্বনি ধরা যায় না” ; ৯।

“যেমন আদ্র্কাঠের অগ্নি শিখা হইতে ধূমস্তূপ আপনা আপনিই উদ্গত হইতে থাকে ; হে মৈত্রেয়ি ! সেইরূপ এই পরমাত্মা হইতে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাস, পুৰাণ, বিদ্যা, উপনিষৎ, শ্লোক, সূত্র, অমু-ব্যাখ্যা ও ব্যাখ্যান প্রভৃতি সমস্তই (৩) প্রসূত হইয়াছে। ১০।

“যেমন সকল সরিৎই সমুদ্রে সন্মিলিত হয়, যেমন ত্বকে স্পর্শ, জিহ্বায় আশ্বাদ, নাসিকায় ঘ্রাণ, চক্ষুতে বর্ণ, কর্ণে শব্দ, হস্তে কার্য্য, মনে অনুভূতি, হৃদয়ে জ্ঞান, পদে সঞ্চরণ এবং ভাষায় বেদাদি—১১।

“যেমন জলে লবণ নিক্ষেপ করিলে উহা জলে দ্রবীভূত হইয়া যায়, এবং আর তুলিয়া লওয়া যায় না, কিন্তু স্বাদ লইলে লবণের আশ্বাদন পাওয়া যায়, হে মৈত্রেয়ি ! সেইরূপ অনন্ত, অসীম ও জ্ঞানময় (৪) পরমাত্মা এই

১। খৃতে উল্লেখ আছে, যিনি আত্মাভিন্ন অন্যত্র বেদের, ইত্যাদি।

২। এই বেদ। খ।

৩। খৃতে উল্লেখ আছে, যজ্ঞ, উপহার, খাদ্য, পানীয়, ইহ জগৎ ও পর জগৎ এবং সমস্ত প্রাণী।

৪। যেমন ঘনীভূত ও বিশুদ্ধ লবণ স্বাদভিন্ন আর কিছুই নহে, সেইরূপ হে প্রিয়তমে ! সংহত, বিশুদ্ধ ও সমস্ত আত্মা জ্ঞানভিন্ন কিছুই নহে। খ।

সমস্ত ভূত হইতে উখিত হন, এবং এই সকল ভূতেই আবার অন্তর্হিত হইয়া যান। হে মৈত্রেয়ি! তাঁহার অন্তর্ধানের পর আর কোন জ্ঞান থাকে না”। যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ কহিলেন’। ১২।

‘তখন মৈত্রেয়ি বলিলেনঃ—“স্বামিন্! আপনি “অন্তর্ধানের পর কোনও জ্ঞান থাকে না” বলিয়া আমায় বড় গোলযোগে ফেলিলেন” (১)।

‘যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেনঃ—“হে মৈত্রেয়ি! আমি বোধের অতীত কিছুই তোমাকে বলি নাই; প্রিয়তমে! জ্ঞানার্থে ইহাই যথেষ্ট” (২)। ১৩।

“যখন দ্বৈতভাব থাকে, তখন একে অপরকে দেখিতে পায়, একে অপরের আশ্রয় পায়, একে অপরকে শ্রবণ করে (৩), একে অপরকে অভিবাদন করে (৪), একে অপরকে অনুভব করে (৫) এবং একে অপরকে জানে; কিন্তু যখন আত্মাই এই সকল, তখন কিরূপে তাহা অপরকে আশ্রয় করিবে (৬), কিরূপে অপরকে (৭) দেখিবে (৮), কিরূপে অপরকে শ্রবণ করিবে (৯), কিরূপে অপরকে অভিবাদন করিবে (১০), কিরূপে অপরকে অনুভব করিবে (১১) এবং কিরূপে অপরকে জানিবে? যিনি আপনা দ্বারা

১। ‘আমাকে গোলযোগে আনিয়া ফেলিলেন, আমি আপনার কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না’। ২।

২। প্রিয়তমে! আত্মা অক্ষয়, এবং ধ্বংসাতীত-প্রকৃতি-বিশিষ্ট। ২।

৩। একে অপরকে আশ্রয় করে। ২।

৪। একে অপরকে শ্রবণ করে। ২।

৫। একে অপরকে স্পর্শ করে। ২।

৬। ২। দেখ।

৭। ২। এর পাঠ, স্পর্শ করিবে।

৮। আশ্রয় করে।

৯। অভিবাদন।

১০। শ্রবণ।

১১। ২। এর পাঠ, ‘কিরূপে অপরকে স্পর্শ করিবে?’

এই সকল] জানিতেছেন, তিনি কিরূপে আপনাকে জানিবেন? হে প্রিয়তমে! কিরূপে সৰ্ব্বজ্ঞ, সৰ্ব্বজ্ঞ আপনাকে জানিবেন (১)?”

### যম ও নচিকেতা ।

উপনিষদেব মধ্যে কঠোপনিষৎ অতি প্রসিদ্ধ। স্বদেশ-হিতৈষী—অধিক কি সমস্ত মানবজাতির পরমহিতাকাঙ্ক্ষী স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায় প্রথমে এই উপনিষৎ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের সমক্ষে প্রকাশ করেন। তদবধি ইহা বারংবার ভাষান্তরিত ও সমালোচিত হইয়াছে। যাহারা ধর্মসম্বন্ধীয় ও দার্শনিক ভাবের উন্নতির আলোচনায় আমোদিত হন, তাঁহাদের ধীর-তার সহিত এই উপনিষৎ পাঠ করা উচিত। এই উপনিষদে যখন আধুনিক বিষয়ের সমাবেশ আছে, তখন ইহা যে, ইহার আদিম অবস্থায় রহিয়াছে, এমন বোধ হয় না। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৩য়, ১১, ৮) যে উপাখ্যান কথিত হইয়াছে, ইহাতেও সেই উপাখ্যান দেখা যায়; কেবল এইমাত্র প্রভেদ যে, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের মতে কোন বিশেষ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়, আর উপনিষদের মতে কেবল জ্ঞান দ্বারাই তাহা সিদ্ধ হইতে পারে।

এই উপনিষদে যম ও নচিকেতা নামে একটী বালকের কথোপকথন আছে। নচিকেতার পিতা সর্ষগ করিয়াছিলেন। এই মহাযজ্ঞে সর্ষগ ত্যাগ করিতে হয়। তাঁহার পুত্র পিতার অঙ্গীকার শুনিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি আপনার অঙ্গীকার অবাধে প্রতিপালন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন কি না, পিতা প্রথমে উত্তর দানে বিলম্ব করিতে

---

১। এই শোষণোক্ত পংক্তির স্থলে ঋতে (৪র্থ, ৫, ১৫) এইরূপ উল্লেখ আছে;—‘আত্মা “কিছুই না” ইহা আয়ত্তের অতীত, যেহেতু ইহা আয়ত্ত করা যায় না; ধ্বংসের অতীত, যেহেতু ইহা ধ্বংস হয় না; ইহা স্পর্শের অতীত, যেহেতু ইহা স্পর্শ করা যায় না; ইহা কল্পিত হয় না, ইহা অকৃতকার্য হয় না। হে প্রিয়তমে! কিরূপে সৰ্ব্বজ্ঞ সৰ্ব্বজ্ঞ—আপনাকে জানিবেন? হে মৈত্রেয়ি, তোমাকে এইরূপ উপদেশ দিলাম। অমরত্ব এইরূপ,”। ইহা কহিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বনে গমন করিলেন।’

লাগিলেন, পরে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন :—“হাঁ ! তোমাকেও মৃত্যু মুখে দিব” ।

পিতা যখন এইরূপ বলিলেন, তখন তাঁহাকে অঙ্গীকার প্রতিপালন জন্য পুত্রকে মৃত্যুর নিকট বলিদান করিতে বাধ্য হইতে হইল । পিতাকে এই কঠোর অঙ্গীকার হইতে মুক্ত করিবার জন্য পুত্রও মৃত্যু-সদনে যাইতে ইচ্ছা করিল ।

পুত্র কহিল—‘যাহারা অতঃপর মৃত্যু মুখে পাতিত হইবে, আমি তাহাদের অগ্রে এবং যাহারা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছে, তাহাদের মধ্যে চলিলাম, যমের যাহা কর্তব্য, অদ্য তিনি আমার প্রতি তাহাই করিবেন ।

‘ফিরিয়া দেখুন, যাহারা পূর্বে আসিয়াছে, তাহাদেরই বা কি হইয়াছে, এবং সম্মুখে দেখুন, যাহারা পরে আসিতেছে, তাহাবাই বা কি হইবে । নশ্বর মানব শস্যের ন্যায় জীর্ণ হয় এবং শস্যের ন্যায় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ।’

নচিকেতা যখন যম-ভবনে প্রবেশ করিল, যম তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন না, সুতরাং তাঁহার নূতন অতিথি—নচিকেতাকে যথাযোগ্য অতিথি-সংকার ব্যতিরেকে তিন দিন অতিবাহিত করিতে হইল ।

সেই অনাদরের পরিপূরণ জন্য, যম প্রত্যাগত হইয়া তাঁহাকে তিনটি বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন ।

নচিকেতা প্রথম এই বর প্রার্থনা করিলেন যে, তাঁহার পিতা যেন তাঁহার উপর আর ক্রুদ্ধ না হন (১) ।

দ্বিতীয়বর এই, যম যেন তাঁহাকে কোন বিশেষ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে শিক্ষা দেন (২) ।

ইহার পর তৃতীয় বর প্রার্থনার সময় উপস্থিত হইল ।

১ । তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে, তাহার প্রথম বর এইরূপ ছিল যে, সে যেন জীবিত অবস্থায় পিতার নিকট ফিরিয়া যাইতে পারে ।

২ । তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে তাহার দ্বিতীয় বর এই যে, তাহার সংকার্য্য যেন বিনষ্ট না হয়, ইহাতে যম তাহাকে একটি বিশেষ যজ্ঞের কথা বলেন, এই যজ্ঞ তাহার নামানুসারে নচিকতা নামে প্রসিদ্ধ হইবে ।

নচিকেতা কহিল (১) “মম্বুষ্যোর মৃত্যু হইলে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, তিনি আছেন, কেহ কেহ বলেন, তিনি নাই; আপনার কাছে এই বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি। এই আমার তৃতীয় বর” ২০।

‘যম উত্তর করিলেন :—“পূর্বে দেবতাদেরও এবিষয়ে সংশয় ছিল। ইহা জানা বড় সহজ নহে। এই বিষয়টী অতি দুর্লভ। হে নচিকেত! অন্য কোন বর-প্রার্থনা কর; আমাকে আর এ বিষয়ের জন্য অমুরোধ করিও না, এই বর প্রার্থনা পরিত্যাগ কর”। ২১।

“মানবের পক্ষে যে সকল অভিলাষ সিদ্ধ করা দুর্ঘট, তোমার ইচ্ছামু-সারে তদনুরূপ কোন অভিলাষ-সিদ্ধির বিষয় প্রার্থনা কর। পরমসুন্দরী বিদ্যাধরীগণ তাহাদের রথ ও বীণা লইয়া তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে, নশ্বব মানব ইহাদিগকে লাভ করিতে পারে না। আমি ইহাদিগকে তোমায় দিলাম। কিন্তু মৃত্যুর সম্বন্ধে আমার নিকট কিছুই জিজ্ঞাসা করিও না”।

‘নচিকেতা কহিল :—“ইহারা অচির-স্থায়ী, আজ আছে, কা’ল নাই। হে মৃত্যু! ইহারা ইন্দ্রিগণের শক্তি ক্ষয় করে। একেত মানবের জীবন অতি সংক্ষিপ্ত। অশ্ব ও নৃত্যগীতাদি তোমার জন্যই থাকুক। কেহই ধন-সম্পত্তিতে সুখী হইতে পারে না। হে মৃত্যু! আমরা যখন তোমার সম্মুখীন হইব, তখন কি আমরা পূর্বের ন্যায় ধনসম্পত্তির অধিকারী থাকিব? হে মৃত্যু! যাহাতে আনাদের সন্দেহ আছে, অর্থাৎ ভবিষ্যতে কি হইবে, তাহাই বলুন। নচিকেতা এই বর ভিন্ন আর কোন বর চাহে না”। ২২।

পরিশেষে যম নিতান্ত অনিচ্ছাসহকারে তাহার আশ্রয় জ্ঞানের পরিচয় দিতে সম্মত হইলেন।

তিনি কহিলেন—“নির্কোণেরা অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন থাকিয়া আপনাদের চক্ষে আপনাদিগকে জ্ঞানী দেখে এবং বৃথা জ্ঞানে ক্ষীণ হইয়া অন্ধকর্তৃক চালিত অন্ধের ন্যায় চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়”। ২৩, ৫।

---

১। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে, তাহার তৃতীয় বর—কিরূপ মৃত্যুকে জয় করিতে হয়, তাহা যেন যম তাহাকে বলেন। ইহাতে যম তাহাকে পুনর্বার নচিকেতা যজ্ঞের কথা কহেন।

“অবোধ বা অসাবধান শিশু ধন-মদে মত্ত হইয়া ভবিষ্যতের প্রতি অন্ধ থাকে। সে মনে করে, এই জগৎ ব্যতীত অন্য জগৎ নাই। এইরূপে সে পুনঃপুনঃ আমার অধীন হইয়া থাকে”। ৬।

“যে জ্ঞানী ব্যক্তি আত্মচিন্তা দ্বারা পুরাতনকে—যিনি দুর্লভ্য, যিনি অন্ধকারে লুপ্তায়িত, যিনি গুহায় বিলীন, যিনি অন্ধকারাবৃত গভীর রন্ধুবাসী—ঈশ্বর বলিয়া জানেন, তিনিই স্মৃতি হুঃখকে পশ্চাতে ফেলিয়া থাকেন।” ১২।

“জ্ঞানী আত্মার জন্ম ও নাই, মৃত্যুও নাই। ইহা কিছুই হইতে আইসে না এবং কিছুই হয় না। ইহা পুরাতন ও অজাত। শরীরের ধ্বংস হইলেও ইহার ধ্বংস হয় না।” ১৮।

“আত্মা ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্রতর। মহৎ হইতেও মহত্তর; ইহা প্রাণী-হৃদয়ে লুপ্তায়িত। যে ব্যক্তি কামনা ও হুঃখ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তিনিই বিধাতার কৃপায় আত্মার মহত্ত্ব দেখিয়া থাকেন।” ২০।

“তিনি স্থিরভাবে অবস্থিতি করিলেও দূরে সঞ্চরণ করেন, শয়ান হইয়াও সমুদয় স্থলে গিয়া থাকেন। আমি ভিন্ন কে সেই ঈশ্বরকে চিনিতে সক্ষম, যিনি পূর্ণানন্দ ও অপূর্ণানন্দ উভয়ই।” ২১।

“বেদ দ্বারা বুদ্ধি দ্বারা বা বিদ্যা দ্বারা আত্মলাভ হয় না। আত্মা যাহাকে মনোনীত করেন, তিনিই আত্মলাভে কৃতকার্য হন। আত্মা তাঁহাকে আপনার বলিয়া চিনিতে পারেন।” ২৩।

“কিন্তু যে কুকর্মে হইতে বিরত হয় নাই, যে স্থির ও বশীভূত হয় নাই, যাহার মনের স্থিরতা নাই, সে জ্ঞান দ্বারাও আত্ম-লাভে সমর্থ হয় না।” ২৪।

“কোন মানবই উর্দ্ধাধোগামী শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা জীবিত থাকে না। আমরা আর কিছু দ্বারা জীবিত রহিয়াছি, যাহাতে এই দুইটাই একত্র বিদ্যমান রহিয়াছে।” ৫ম, ৫।

“আমি তোমাকে এই সকল গূঢ় রহস্য—অনন্ত ব্রাহ্মণের বিষয় বলিতেছি, এবং মৃত্যুর পর আত্মার কি ঘটে, তাহাও বলিতেছি।” ৬।

“কেহ কেহ জীবন্ত প্রাণী রূপে আবার জন্ম গ্রহণ করে, আর কেহ কেহ



তাহাদের কৰ্ম্মানুসারে এবং তাহাদের জ্ঞানানুসারে প্রস্তরাদিতে প্রবেশ করে।” ৭।

“আমরা নিদ্রিত হইলেও যে প্রধান পুরুষ আমাদের মধ্যে জাগিয়া থাকেন, যিনি এক সূদৃশ্যের পর অপর সূদৃশ্য সংগঠিত করেন, তিনিই উজ্জল বলিয়া, ব্রাহ্মণ বলিয়া ও অবিদ্যার বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। সমস্ত জগৎ তাঁহার উপর স্থাপিত রহিয়াছে, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করে না।” ৮।

“অগ্নি যেমন এক হইলেও বিভিন্ন সামগ্রী দাহন করাতে বিভিন্ন হয়, সেইরূপ সৰ্ব্বাস্তর্গত এক আত্মা বস্তুবিশেষে প্রবেশভেদে বিভিন্ন হইয়াছেন এবং পৃথক পৃথক রূপে অবস্থিতি করিতেছেন”। ৯।

“জগৎচক্ষু সূর্য্য যেমন মালিন্য-দোষ-দৃষ্টে চক্ষু চক্ষুতে দৃষ্ট হইলে মলিন হন না, সেইরূপ সৰ্ব্বাস্তর্গত এক আত্মা জগৎ হইতে পৃথক হওয়ায় জগতের শোকহঃখে আক্রান্ত হন না”। ১১।

“কেবল একমাত্র নিত্য ভাবুক আছেন, তিনি অনিত্যভাবেই ভাবিতেছেন; তিনি একক হইলেও অনেকের মনোরথ পূর্ণ করিয়া থাকেন। যে সকল জ্ঞানী জীবাত্মাব মধ্যে তাঁহার দর্শনলাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই অনন্ত শান্তির অধিকারী হইয়াছেন।”

“সমস্ত জগতের যে কিছুই হউক, একবার ব্রাহ্মণ হইতে বিচ্যুত হইলে সেই ব্রাহ্মণের স্বাসেই উহারা কম্পিত হইয়া থাকে। এই ব্রাহ্মণ নিষ্কোশিত অসির ন্যায় তাহাদের অতিশয় ভয়ের কারণ হইয়া উঠে। যাহারা ইহা জানেন, তাঁহারাই অমরত্ব লাভ করেন”। ৬ষ্ঠ, ২।

“তাঁহাকে (ব্রাহ্মণকে) বাক্য দ্বারা, মন দ্বারা, দৃষ্টি দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আন্তরিক ভিন্ন অন্য কেহ তাঁহার ধারণা করিতে পারে না”। ১২।

“যখন হৃদয়ের সমস্ত কামনার নিবৃত্তি হয়, তখন নশ্বর অবিদ্যার হন এবং ব্রাহ্মণ লাভ করেন”। ১৪।

“ইহ জগতে যখন হৃদয়ের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হয়, তখনই মরণশীল অমর হন—এই খানে আমার উপদেশ সমাপ্ত হইল”। ১৫।

## উপনিষদের ধর্ম ।

অনেকে উপনিষদের উপদেশ গুলিকে সম্ভবতঃ ধর্ম বলিয়া উল্লেখ করিবেন না। যথারীতি সজ্জিত না হইলেও এই সমুদয় উপদেশ তাঁহাদের নিকট দর্শনশাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইবে। আমরা ভাবার যে, কেমন দাস হইয়া চলি, তাহা ইহা দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে। ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্র, এই উভয়ের মধ্যে একটি প্রভেদ কল্পিত হইয়াছে। বিষয় ও উদ্দেশ্যের সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে এই প্রভেদ-কল্পনার যে আবশ্যকতা আছে, তাহা আমি অস্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু একরূপ দেখা গিয়া থাকে যে, যে সমস্ত বিষয়ের সহিত ধর্মের সংশ্রব আছে, সেই সেই বিষয়ের সহিত দর্শনশাস্ত্রেরও সম্বন্ধ রহিয়াছে, অধিক কি তৎসমুদয় হইতে দর্শন শাস্ত্রের উৎপত্তিও হইয়াছে।

ধর্ম যদি তাহার জীবনী শক্তির জন্য অন্তর্বানের মধ্যে এবং বাহিরে অনন্তের অনুভূতির অপেক্ষা করে, তাহা হইলে দর্শনবেত্তা ভিন্ন আর কে এই অনুভূতিব বৈধতানির্ণয়ে সক্ষম হইবেন? মনুষ্য যে ক্ষমতায় আপনাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা সীমাবদ্ধ বিষয় পরিগ্রহ করেন, এবং যুক্তি দ্বারা সেই সীমাবদ্ধ ভাব কল্পনায় পরিণত করিয়া তুলেন, দর্শনবেত্তা ভিন্ন আর কে সেই ক্ষমতা নির্ণয় করিবেন? ইন্দ্রিয় ও যুক্তি, এই উভয়ে বিরোধী হইলেও মনুষ্যের যে, অনন্তের অস্তিত্ব স্বীকারের অধিকার রহিয়াছে, দর্শনবেত্তা ভিন্ন এ কথা আর কে বলিবে? আমরা যদি দর্শন শাস্ত্র হইতে ধর্মকে পৃথক করি, তাহা হইলে ধর্ম পতিত হইবে, আমরা যদি ধর্ম হইতে দর্শনশাস্ত্র বিযুক্ত করি, তাহা হইলে দর্শন বিলম্বিত হইয়া যাইবে।

প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ সাংখ্যিক ও বৈষ্ণবিক গ্রন্থের নির্মাচন-বিষয়ে এবং তাঁহাদের ধর্ম-গ্রন্থ সকল যে, পবিত্র ও ঈশ্বর-প্রচারিত এই মতের সমর্থনবিষয়ে আমাদের অগ্ৰাণু ধর্ম সম্প্রদায়ের অধিনায়কগণ অপেক্ষাও সমধিক নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। উপনিষদকে তাঁহারা তাঁহাদের পবিত্র গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিতে বিমুখ হন নাই। উপনিষৎ তাঁহাদের স্মৃতি, তাঁহাদের মহাকাব্য ও তাঁহাদের আধুনিক পুরাণের শ্রেণীভুক্ত না হইয়া শ্রুতি-

ভুক্ত হইয়াছে। তাঁহারা প্রাচীন ঋষিগণের দর্শনশাস্ত্রকে স্তোত্র ও হোমা-  
দির ন্যায় পবিত্র জ্ঞান কবিতেন।

একমত অন্য মতের বিরোধী হইলেও উপনিষদে যাহার উল্লেখ  
আছে, তাহা সত্য বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। আশ্চর্যের বিষয়  
এই, মূল বিষয়সম্বন্ধে যে সকল আধুনিক দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে পরস্পরের বিরোধ  
আছে, তৎসমুদয় আপন আপন মত সমর্থন জন্য উপনিষদের কোন না  
কোন অংশের আশ্রয় লইয়াছে।

### বৈদিক ধর্মের পরিপুষ্টি।

কিন্তু প্রাচীন হিন্দুধর্মের পবিণাম সম্বন্ধে আর একটি বিষয় বিশেষ  
ধীরতার সহিত আলোচনা করা উচিত হইতেছে।

সংহিতা যে, কালক্রমে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহার চিহ্ন  
এই সংহিতাতেই দেখা যায়। যদিও পূর্ব প্রস্তাবগুলিতে আমি  
নির্দেশ করিয়াছি যে, এই সকল চিন্তার ক্রমোন্নতির সময় নিরূপণের  
চেষ্ঠা অনাবশ্যক, তথাপি উক্ত প্রস্তাবসমূহে আমি এই ক্রমোন্নতি  
দেখাইবার চেষ্ঠা করিতে ক্রটি করি নাই। সময় বিশেষে যে, প্রথর বীশক্তি-  
সম্পন্ন লোক জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং তিনি স্বীয় বুদ্ধিবলে যে, সূক্ষ্ম  
বিষয়ের মীমাংসা করিতে সমর্থ হন, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে  
হইবে। বারুকি যে, ধর্মনিষ্ঠ কবি ওয়াট্‌সের সমকালিক হইয়াও সূক্ষ্মদর্শী  
প্রাচীন হিন্দু দর্শনবেত্তাদের সম্বন্ধে অনেক বিষয় বিবৃত করিয়া গিয়াছেন,  
তাহাও আমরা বিশ্বাস করিব না।

প্রাচীন বৈদিক কালের সমালোচনার পর আমরা এমন বলিতে পারি  
যে, অদিতির স্তোত্র অপেক্ষা উষা ও সূর্য্যের স্তোত্র প্রাচীন এবং অদিতির  
স্তোত্র আবার প্রজাপতির স্তোত্র অপেক্ষাও প্রাচীন। কবি যে কবিতার  
“স্বয়ং শ্বাসহীন হইলে ও একমাত্র শ্বাসবান্,” প্রভৃতি কথা বলিতেছেন,  
তাহা যে, আবার এই সকলের অনেক পরে রচিত হইয়াছে, ইহা বলাও  
আমাদের অমুচিত হয় না।

বেদের স্তোত্রগুলি পর্যালোচনা করিলে উহার ক্রমোৎকর্ষ সুন্দররূপে বুঝিতে পারা যায়। সময়নির্ণায়ক তালিকার আলোচনা অপেক্ষা এই ক্রমোৎকর্ষের আলোচনা করাই বিশেষ প্রয়োজনীয় ও শিক্ষাপ্রদ। অতি প্রাচীন ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক সমস্ত স্তোত্রই সংহিতা শেষ হইবার পূর্বে বর্তমান ছিল। খ্রিষ্টের প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বে এই সংহিতা শেষ হইয়াছে, এরূপ বলিলে বোধ হয়, কেহই প্রতিবাদ করিবেন না।

ব্রাহ্মণ-রচনার পূর্বে সংহিতার রচনা শেষ হইয়াছে। স্তোত্র ও ব্রাহ্মণে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যাহারা যথাবিধি প্রাচীন যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহারাই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভে সমর্থ হইবেন। যে যে দেবতার উদ্দেশে যাগ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহাদের অধিকাংশই স্তোত্রে প্রশংসিত হইয়াছেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক ব্রাহ্মণে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রজাপতি প্রভৃতি দেবগণ দেবত্বের সূক্ষ্ম কল্পনায় পর্যাবসিত হইয়াছেন।

ইহার পর আরণ্যক। ব্রাহ্মণের শেষে থাকাতাই ইহা আধুনিক নয়, ইহার প্রকৃতি দেখিলেও ইহাকে আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। ব্রাহ্মণ ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক সূত্রে যাগযজ্ঞের যেরূপ আড়ম্বর বর্ণিত আছে, সেইরূপ আড়ম্বর ব্যতিরেকে কেবল মানসিক চেষ্টা দ্বারা কিরূপে যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারা যায়, তাহা প্রদর্শন করাই আরণ্যকের প্রধান উদ্দেশ্য। যাজ্ঞিক মনে মনে যজ্ঞটী ভাবিবেন, এবং তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় মনে মনে অনুশীলন করিবেন। এইরূপ করিলে দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যে ফল হয়, তাহারও সেই ফল লাভ হইবে।

সর্ব শেষে উপনিষৎ। এই উপনিষদের উদ্দেশ্য কি? কস্মিন্কাণ্ডের অসার্থকতা ও অনিষ্টকারিতা প্রদর্শন, পরিণামে পুরস্কার প্রাপ্তির আশায় যে সকল যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তৎসমুদয়ের উপর দোষারোপকরণ, দেবতাদের অস্তিত্ব অস্বীকার না করিলেও তাহাদের উচ্চ ও গর্ভিত প্রকৃতি অস্বীকারকরণ এবং প্রকৃত ও বিশ্বজনীন আত্মজ্ঞান ব্যতীত যে, মুক্তিলাভ অসম্ভব, যেখানে শান্তি বিরাজিত রহিয়াছে, সেই স্থান ব্যতীত যে, শান্তি লাভ হুর্ঘট, তদ্বিষয়ে শিক্ষাদানই উপনিষদের প্রধান উদ্দেশ্য।

কিরূপে এই চিন্তার প্রবাহ সমাগত হইয়াছে, কিরূপে একটা আর একটীর অনুসরণ করিয়াছে, এবং যাঁহারা তৎসমুদয় বিকাশ করিয়াছেন, কিরূপেই বা তাঁহারা কেবল সত্যের প্রেমে প্রেমিক হইয়া, সত্য লাভ মানসে মানব-সাধ্য চেষ্টার একশেষ করিয়াছেন, তাহাই এই কয়েকটা প্রস্তাবে আমি যথাসাধ্য বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

এক্ষণে অনেক যেকপ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, আপনারাও সেইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, এপ্রকার পরস্পরবিসংবাদিত ও বিবিধ মতসম্বলিত ধর্ম কিরূপে সাধারণে গ্রহণ করিয়াছিল ? যাঁহারা দেবগণের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন এবং যাঁহারা উহা স্বীকার করিতেন না, যাঁহারা যাগযজ্ঞে সর্কস্ব ব্যয় করিতেন, যাঁহারা উহা ভণ্ডামি মাত্র বলিয়া নির্দেশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, তাঁহারা কিরূপে এক ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোক হইয়া একত্র বাস করিতেন ? কিরূপে পরস্পরের মত-বিরোধী গ্রন্থাবলী অভ্রান্ত, পবিত্র ও ঈশ্বর-প্রদত্ত বলিয়া পরিগণিত হইত ?

যেখানে প্রাচীন বৈদিক ধর্মের প্রচলন দেখা যায়, সেখানে সহস্র বৎসর পূর্বেও এইরূপ ছিল, কালসহকারে নানা পরিবর্তন ঘটিলে এখনও ঠিক এইরূপ আছে। চেষ্টা করিয়া ইহা বুঝিলে আমাদের জ্ঞানলাভ হইলেও হইতে পারে।

### চারি জাতি ।

ভারতের প্রাচীন ভাষা ইউরোপের পণ্ডিত-সমাজে প্রবেশ করিবার পূর্বে ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে সকলে এইরূপ উল্লেখ করিতেন যে, ইহঁারা একদল পুরো-হিতমাত্র। ইহঁারা দ্রিষ্ণ-পরতন্ত্র হইয়া অন্যান্য জাতিকে আপনাদের অধিগত পবিত্র জ্ঞানে বঞ্চিত রাখেন। এইরূপে মূর্খ লোকদিগের উপর ইহঁারা আপনার প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনার পর এই অপবাদ সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। চারি জাতি মধ্যে কেবল শূদ্রেরাই বেদ পাঠ করিতে পারিত না। কিন্তু বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বেদালোচনা অকর্তব্য না হইয়া বরং অবশ্যকর্তব্যের মধ্যে

পরিগণিত ছিল। সকলেরই বেদপাঠে অধিকার ছিল, কেবল ব্রাহ্মণেরা বেদাধ্যাপনার অধিকারী ছিলেন।

ব্রাহ্মণদের কখনও এরূপ অভিপ্রায় ছিল না যে, নীচ বর্ণ কেবল কৰ্ম্ম-কাণ্ডের অনুষ্ঠান করুক, আর আমরা কেবল উপনিষৎ লইয়াই থাকি। প্রত্যুত এরূপ প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে যে, উপনিষৎ প্রথম বর্ণ হইতে উদ্ভূত হয় নাই, দ্বিতীয় বর্ণ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে।

বস্তুতঃ এখন জাতিভেদ-প্রণালীতে সাধারণতঃ যাহা বুঝায়, বৈদিক কালে সে রকম জাতিভেদ-প্রথা ছিল না। বেদে যেরূপ জাতিভেদ-প্রথা দেখা যায়, মনুর জাতিভেদ-প্রথা হইতে তাহা অনেকাংশে বিভিন্ন, বর্তমান সময়ের প্রথার সহিত উহার আরও অধিক প্রভেদ দেখা যায়। প্রাচীন ভারতীয় সমাজকে প্রথমতঃ আর্য্য ও শূদ্র, এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন শ্রেণী লইয়া আর্য্য-সম্প্রদায় সংগঠিত হইয়াছিল। এই তিন জাতির যে যে কার্য্য, কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল, অন্যান্য দেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতির করণীয়ের সহিত তৎসমুদয়ের বিশেষ কোন প্রভেদ নাই, স্মরণ্য এ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন দেখা যায় না।

### চারি আশ্রম ।

চারিজাতি অপেক্ষা চারি আশ্রম বৈদিক সমাজের একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ।

এই চারি আশ্রমের মধ্যে ব্রাহ্মণকে চারিটি (১), ক্ষত্রিয়কে তিনটি, বৈশ্যকে একটি এবং শূদ্রকে ঐ চারিটির কোন একটি যথাবিধি প্রতিপালন করিতে হইত। প্রাচীন ভারতবর্ষে ব্যক্তিমান্ত্রেরই শৈশবাবস্থা হইতে সমস্ত জীবনের কর্তব্য কৰ্ম্ম নির্দ্ধারিত ছিল। মানব-স্বভাব সহজে কোন নিয়মের বশীভূত না হইলেও এই নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে যে, অধিকাংশ কার্য্য হইত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন

কারণ নাই। যখন কোন আৰ্য্যের সন্তান জন্মগ্রহণ করিত, তখন হইতেই এমন কি তাহার ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বে তদীয় পিতা মাতাকে নির্দিষ্ট সংস্কারের অনুষ্ঠান করিতে হইত। এই সকল সংস্কার না হইলে ভূমিষ্ঠ সন্তান সমাজের অর্থাৎ আপনাদের ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের বিধি-সিদ্ধ লোক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত না। পঞ্চবিংশ কখন কখন তদপেক্ষাও অধিক সংস্কারের উল্লেখ দেখা যায়। কেবল শূদ্রগণ এই সংস্কারের অধিকারী ছিল না (১)। পক্ষান্তরে আৰ্য্যেরা এই সকল সংস্কারের অনুষ্ঠান না করিলে শূদ্র হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিতেন না।

### প্রথম আশ্রম, ব্রাহ্মচর্য্য।

আৰ্য্য সন্তানের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বালকের সপ্তম বৎসর হইতে একাদশ বৎসর বয়সের মধ্যে প্রথম আশ্রম অর্থাৎ ব্রাহ্মচর্য্য আরম্ভ হইয়া থাকে (২)। তখন তাঁহাকে বিদ্যা শিক্ষার্থ গৃহ হইতে গুরু-সন্নিধানে গমন করিতে হয়। একটী বা সমগ্র বেদ কণ্ঠস্থ করাই তাঁহার শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। বেদের নাম ব্রাহ্মণ হওয়ায় তিনি ব্রাহ্মচারী অর্থাৎ বেদ-শিষ্য বলিয়া উক্ত হন। বেদ পাঠ করিতে ন্যূনকমে বার বৎসর ও উক্ত সংখ্যায় আটচল্লিশ বৎসর অতিবাহিত হইত (৩)। গুরু-গৃহে বাস-কালে তরুণবয়স্ক ছাত্রকে অতি কঠিন নিয়মাবলীর অনুবর্তী হইয়া চলিতে হয়। তিনি প্রতি দিন দুই বার অর্থাৎ সূর্য্যোদয় ও সূর্যাস্ত-সময়ে সন্ধ্যো-

১। যম লিখিত নিয়মামুসারে শূদ্রের উপনয়ন পর্য্যন্ত হইতে পারিত। কিন্তু শূদ্র বেদপাঠের অধিকারী ছিল না।

২। আৰ্য্যাবিদ্যামুখানিধি, ১০১ পৃষ্ঠা। আপস্তম্বসূত্র, ১ম, ১, ১৮, ব্রাহ্মণ বসন্ত-কালে, ক্ষত্রিয় গ্রীষ্মকালে, বৈশ্য শরৎকালে উপনীত হইবে। ব্রাহ্মণ অষ্টম বর্ষে, ক্ষত্রিয় একাদশ বর্ষে এবং বৈশ্য দ্বাদশ বর্ষে উপনীত হইবে।

৩। আপস্তম্ব সূত্র, ১ম, ২, ১২, উপনীত ছাত্রকে গুরুগৃহে ৪৮বৎসর (যদি সমস্ত বেদ পাঠ করিতে হয়), ৩৬বৎসর, ২৪বৎসর এবং ১৮বৎসর থাকিতে হইবে। ন্যূনকমে ১২বৎসর না থাকিলে হইবে না।



পাসনা করিবেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে তাঁহাকে ভিক্ষার্থ পল্লীতে পল্লীতে পরিভ্রমণ করিতে হইবে। তিনি এই ভিক্ষা-লব্ধ সমস্ত সামগ্রীই গুরুর হস্তে আনিয়া দিবেন। গুরু যাহা খাইতে দেন, তদ্বিন্তি তিনি আর কিছুই খাইতে পাইবেন না। তাঁহাকে জল আনয়ন, যজ্ঞের জন্য সমিধ্ আহরণ, হোমস্থান পরিষ্কারকরণ এবং দিবা রাত্রি গুরুর পরিচর্যা করিতে হইবে। এই সকল কঠোর নিয়মানুষ্ঠানের বিনিময়ে গুরু তাঁহাকে বেদ শিক্ষা দিবেন। এই বেদ যাহাতে কণ্ঠস্থ হয় এবং যাহাতে তিনি দ্বিতীয় আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া উপযুক্ত গৃহস্থ হইতে পারেন, গুরু তাঁহাকে তদ্বিনয়ের উপযোগী শিক্ষা দিবে ভ্রষ্টা করিবেন না। তিনি উপাধ্যায়ের নিকটেও অতিরিক্ত পাঠ গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু কেবল গুরু বা আচার্য্যের নিকটেই তাঁহার উপনয়ন হইবে (১)।

পাঠাবসানে সমুচিত গুরু-দক্ষিণা দিয়া ছাত্র যখন পিতৃ-গৃহে প্রত্যাগমন করেন, তখন তিনি “স্নাতক” (২) বা “সমাবৃত” নামে উক্ত হন। আমরা এই অবস্থায় বলিয়া থাকি, ছাত্র উপাধি গ্রহণ করিয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইলেন।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরা বিবাহ না করিয়া চিরজীবন গুরু-গৃহে বাস করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা পাঠাবসানে একবারেই সন্ন্যাসী হইয়া উঠেন। কিন্তু প্রচলিত নিয়মানুসারে আৰ্য্য যুবককে উনিশ বা বাইশ (৩) বৎসর বয়সে বিবাহ করিতে হয় (৪)।

১। প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহার সবিস্তর বিবরণ পাওয়া যাইবে।

২। ছাত্র যে সময়ের মধ্যে গুরু-গৃহ হইতে প্রত্যগত হইয়া বিবাহ-পাশে আবদ্ধ হন, কেবল সেই সময়ে তাঁহাকে “স্নাতক”, বলা যায় না, প্রতুত তিনি আজীবন এই নামের অধিকারী থাকেন।—“আর্য্যবিদ্যাসুধানিধি,” ১৩১ পৃষ্ঠা।

৩। ছাত্র সপ্তম বর্ষে বিদ্যাভাসে প্রবৃত্ত হন; অন্ততঃ বার বৎসর তাঁহাকে বেদাধ্যয়ন করিতে হয়; ইহাব পর কাহারও কাহারও মতে মহানামী ও অগ্ন্যস্ত্র ত্রত পাঠে আর তিন বৎসর যায়। অশ্বালায়ন গৃহ্য সূত্র, ১ম, ২২, ৩, দেখ।

৪। মনুর মতে পুরুষের ৩০ বৎসর বয়সে এবং স্ত্রীলোকের ১২ বৎসর বয়সে বিবাহ করা উচিত; কিন্তু নিয়মানুসারে পুরুষ ২৪ বৎসর বয়সে এবং স্ত্রীলোক ৮ বৎসর পরিণয়-শূদ্রে আবদ্ধ হন।

## দ্বিতীয় আশ্রম, গৃহস্থ্য ।

দ্বিতীয় আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলে তিনি গৃহস্থ বা গৃহমেধী বলিয়া উক্ত হন। এই সময়ে তাঁহাকে বিবাহ করিতে হয়। স্ত্রী মনোনীতকরণ ও বিবাহের সম্বন্ধে অতি সূক্ষ্ম নিয়ম প্রণীত হইয়াছে। যাহা হউক, এ সময়ে ধর্ম্মানুশীলনই তাঁহার পক্ষে সমধিক প্রয়োজনীয়। এ সময়ে তিনি বৈদিক স্তোত্র কণ্ঠস্থ করিয়াছেন। অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, প্রজাপতি প্রভৃতি বৈদিক দেবগণের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছে। ব্রাহ্মণ তাঁহার অধীত হইয়াছে; এই পবিত্র গ্রন্থের নিয়মানুসারে তিনি সমুদয় যাগ যজ্ঞে অনুষ্ঠান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি কোন কোন আরণ্যক ও উপনিষৎও (১) অভ্যাস করিয়াছেন। যদি তিনি এই পবিত্র গ্রন্থ বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার অন্তঃকরণ প্রসারিত হইয়াছে। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এই দ্বিতীয় আশ্রম তাঁহাকে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর তৃতীয় আশ্রমের উপযোগী করিয়া তুলিতেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় আশ্রম অতিক্রম না করিলে কেহই এই উচ্চতর তৃতীয় আশ্রমে প্রবেশ করিতে পারেন না। এইটাই গৃহস্থাশ্রমের সাধারণ নিয়ম। কিন্তু সময়ে সময়ে ইহার অন্যথাও ঘটিত (২)। পরিণীত হইলে গৃহস্থকে নিম্নলিখিত পাঁচটি ব্রত পালন করিতে হইত :—

- (১) বেদাধ্যয়ন বা বেদাধ্যাপন।
- (২) পিতৃলোকের তর্পণ।
- (৩) দেবলোকের তর্পণ।
- (৪) জীবের আহার দান।
- (৫) অতিথি সৎকার।

গৃহ্য সূত্রে গৃহস্থের দৈনিক কর্তব্য যেরূপ নির্ধারিত হইয়াছে, তদপেক্ষা

১। আপস্তম্বসূত্র, ১১শ, ২, ৫; ১।

২। বেদান্ত সূত্রে—(৩য়, ৪) চারি আশ্রমের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। এসম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম এই, ব্রহ্মচর্য্যঃ সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ, বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ। ইহার পর উল্লেখ আছে, “যদি যেতরথা ব্রহ্মচার্য্যাদেব প্রব্রজেদ্ গৃহাদ্ বা বনাদ্ বা।”

অধিকতর সম্পূর্ণ ও অধিকতর সুন্দর নিয়ম আর হইতে পারে না। ইহা কাল্পনিক হইলেও হইতে পারে। কিন্তু কাল্পনিক হইলেও এরূপ নিয়ম আর কোথাও দৃষ্ট হয় না।

প্রাচীন ভারতবাসীদের এইরূপ একটা ধারণা ছিল যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই ঋণগ্রস্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ তিনি ঋষিগণের নিকট ঋণী, দ্বিতীয়তঃ দেবগণের সমক্ষে ঋণী, তৃতীয়তঃ পিতৃলোকের নিকট ঋণী (১)। ছাত্ররূপে সাবধানে বেদ অধ্যয়ন করিয়া তিনি ঋষিগণের ঋণ পরিশোধ করেন। গৃহস্থ হইয়া যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহাকে দেবতাদের ঋণ হইতে মুক্ত হইতে হয়। ইহাব পর তিনি পিতৃলোকের তর্পণ ও পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতামাতার ঋণ হইতে মুক্ত হন।

এই তিন ঋণ পরিশোধ হইলে মানব ইহ জগতের বন্ধন-মুক্ত বলিয়া পরিগণিত হন।

ধর্মনিষ্ঠ আর্ধ্যমাত্রই এই সমস্ত কর্তব্যানুষ্ঠানে বাধ্য। এতদ্ব্যতীত ক্ষমতা থাকিলে তিনি অন্যান্য যাগযজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করিতে পারেন। এই সকল যজ্ঞের মধ্যে কতকগুলি দৈনিক ও কতকগুলি পার্শ্বিক যজ্ঞ। অপর-গুলিব-সহিত তিন ঋতু, শস্য-সংগ্রহের সময়, এবং অর্দ্ধ বর্ষ ও পূর্ণ বর্ষের সংশ্রব দেখা যায়। এই সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইলে পুরোহিতগণের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইত। অনেক সময়ে এই সকল যজ্ঞ বহুব্যয়-সাধ্য হইয়া উঠিত। পুরোহিতগণ কেবল আর্ধ্যগণের মঙ্গলার্থেই এই সমুদয়ের অনুষ্ঠান করিতেন। যজ্ঞানুষ্ঠানকালে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য উভয়েই, ব্রাহ্মণের ন্যায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইতেন। ব্রাহ্মণেরাই যজ্ঞ-সম্পাদনের অধিকারী ছিলেন, ইহাতে যে পুণ্য ছিল, তাহাও ব্রাহ্মণেরা লাভ করিতেন। অশ্বমেধ ও রাজসূয় প্রভৃতি যজ্ঞ ক্ষত্রিয়গণেব মঙ্গলার্থে অনুষ্ঠিত হইত।

---

১। মনু ৬ষ্ঠ, ৩৫, “যখন মনুষ্য ঋষিঋণ, দেবঋণ ও পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হন, তখন তিনি মোক্ষ-লাভে মনোনিবেশ করিবেন। কিন্তু এই সকল ঋণ পরিশোধ না করিয়া মুক্তির অন্বেষণ করিলে তাঁহাকে পতিত হইতে হইবে। যথানিয়মে বেদাধ্যয়নের পব তিনি পুত্রোৎপাদন ও সাধ্যানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন। অতঃপর তাঁহাকে নিত্য-মুখে মনোনিবেশ করিতে হইবে”।

শূদ্রেরা আদৌ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানের অধিকারী ছিল না। শেষে কোন কোন স্থলে ইহার অন্যথা দেখা যায়। কিন্তু তাহারা যজ্ঞানুষ্ঠান-কালে পবিত্র স্তোত্র উচ্চারণ করিতে পারিত না।

খ্রিষ্ট-পূর্বঃ সহস্র বৎসর হইতে পাঁচ শত বৎসর পর্য্যন্ত ভারতের প্রাচীন অবস্থা যাহা জানিতে পারা যায়, তাহা হইতে স্পষ্টই বোধ হয় যে, ব্রাহ্মণের জীবন কঠোরএতময় ছিল। ব্রাহ্মণকে প্রত্যেক বৎসরের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত অতি উৎসাহে ব্রত পালন করিতে হইত। এই সকল কর্তব্য-নুষ্ঠানে সামান্য ব্যতিক্রম ঘটিলে তিনি আপনাকে ইহলোকে নিন্দনীয় ও অপরাধী এবং পরলোকে দণ্ডনীয় মনে করিতেন। সাবধানে উপাসনা ও বজ্র প্রভৃতি সম্পন্ন করিয়া তিনি কেবল ইহ লোকে সুখ-শান্তি-পূর্ণ দীর্ঘ জীবনের প্রত্যাশা করিতেন না, পরলোকেও অনন্ত সুখের অধিকারী হইবেন বলিয়া, মনে করিতেন।

### তৃতীয় আশ্রম, বানপ্রস্থ্য।

এই তৃতীয় আশ্রম প্রাচীন ভারতবাসীদের জীবনের একটি অত্যাবশ্যক প্রধান ঘটনা। যখন গৃহস্থানীর কেশ স্বেত হইত, কিংবা যখন তিনি পুত্রের পুত্র দেখিয়া স্তম্ভী হইতেন, তখন তিনি বৃদ্ধিতে পারিতেন যে, তাঁহার সংসার পরিত্যাগের সময় উপস্থিত হইয়াছে। তখন তিনি তাঁহার পুত্রগণকে সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক বনে প্রবেশ করিতেন। তাঁহাকে এই সময়ে “বানপ্রস্থ্য” বলা হইত। তাঁহার জীও ইচ্ছা কবিলে তাঁহার অনুগমন করিতে পারিতেন। এই আশ্রম ও বনবাস-সংস্কে অন্যান্য বিষয়ের সম্বন্ধে প্রাচীন পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। পণ্ডিতগণ এতৎপ্রসঙ্গে স্থানীর ও সন্ন্যাসনিক ব্যবহার-প্রণালীর বর্ণনা করিয়াছেন, কি ভারতীয় সনাতন ক্রমোন্নতির ঐতিহাসিক অবস্থা বিবৃত করিয়াছেন, তাহা অবধারণ করা কঠিন। যেখানে সংসার পরিত্যাগ করিয়া বনগমন অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে পরিণত হইত, সেইখানেই উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত ব্যবস্থার সহিত সে, এই নিয়মেব সংশ্লিষ্ট হইত, তাহা স্পষ্টই বোধ হয়। স্বামীসহিত বনে গমন জীবন ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতে আবার গার্হস্থ্য

বন্দোবস্তেরও অনেক প্রভেদ বটত। যাহাহউক, এই সকল প্রভেদ থাকিতেও নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে যে, বানপ্রস্থ ব্যক্তি বনে প্রবেশ করিয়া নির্বিবাদে চিন্তা ও কার্যের স্বাধীনতা-সুখ ভোগ করিতেন। তিনি কিছুকাল কোন কোন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিতেন। কিন্তু এই যজ্ঞানুষ্ঠান গৃহশ্রমের অনুরূপ ছিল না। বানপ্রস্থকে মানসিক অনুষ্ঠান মাত্র করিতে হইত। তিনি যজ্ঞের সমস্ত অঙ্গই মনে মনে স্মরণ করিতেন। এইরূপ করিলেই তাঁহার যজ্ঞানুষ্ঠানের সমস্ত ফল লাভ হইত। কিছুকাল পবে এই অনুষ্ঠানও পরিসমাপ্ত হইত। বানপ্রস্থ ব্যক্তি তখন নানাবিধ তপ করিতে আরম্ভ করিতেন। স্বার্থপরতার বশবর্তী হইয়া বা পরলোকে পুরস্কার প্রাপ্তির আশায় কোন কার্যের অনুষ্ঠান অনাবশ্যক ও অনিষ্টজনক, বানপ্রস্থ ব্যক্তির এইরূপ ধারণা ক্রমে বলবতী হইয়া উঠিত এবং পরিশেষে আত্মানুসন্ধান, অর্থাৎ অনন্ত আত্মাব সহিত আপনার সম্বন্ধ অবধারণ করাই তাঁহার একমাত্র কার্য হইয়া দাঁড়াইত।

আরণ্য জীবনের সহিত অনেক বিষয়ের সংশ্রব আছে। এই বিষয়গুলি ভারতের ইতিহাস-পাঠকের বিশেষ আনন্দজনক। আমরা তৎসমুদয়ের আলোচনায় বিরত থাকিলাম।

এস্থলে কেবল দুটি বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যিক। প্রথমতঃ, তৃতীয় আশ্রমের পর চতুর্থ বা সন্ন্যাসাশ্রম দেখা যায়। এই অবস্থায় তিনি জন-সমাজ পরিত্যাগ পূর্বক একাকী বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে আপনাকে মৃত্যু-মুখে পাতিত করেন। পণ্ডিতগণ সন্ন্যাসীর “ভিক্ষুক” “যতি,” “পরিব্রাজক,” “মুনি” প্রভৃতি নাম দিয়াছেন। প্রথম তিন আশ্রমের লোকেরা পরজীবনে স্বকৃত কার্যের পুরস্কার প্রত্যাশা করিতেন (ত্রয়ঃ পুণ্যলোকলাভঃ) সন্ন্যাসী সর্বকর্ম পরিত্যাগ পূর্বক প্রকৃত অমরত্বের অভিলাষী হইতেন (একোহমৃতত্বভাক্)। অরণ্যবাসীরা পরিষদ-ভক্ত থাকিতেন, সন্ন্যাসীরা জগতের সহিত কোনরূপ সংশ্রব রাখিতেন না। সন্ন্যাসী ও বানপ্রস্থের মধ্যে আদৌ এইরূপ প্রভেদ থাকিলেও সকল স্থলে এতদুভয়ের মধ্যে এইরূপ প্রভেদ করা সহজ নহে। দ্বিতীয়তঃ, যে তৃতীয় আশ্রম ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের একটি প্রধান বিষয়, মনুসংহিতা,

রামায়ণ ও মহাভারতে ষাহার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা পরিশেষে বৌদ্ধ-মতের অধিকতর সমর্থন করিত বলিয়া ব্রাহ্মণেরা তাহা উঠাইয়া দেন (১), এই বৌদ্ধমতকে (২) প্রাচীন ব্রাহ্মণদিগের নিয়ম-সম্মত আরণ্য জীবনের সম্প্রসারণ বলিয়া নির্দেশ করাই সম্মত। যতদিন ব্রাহ্মণেরা লোকদিগকে একে একে এইরূপ নানা আশ্রমে প্রবর্তিত করিতে থাকেন এবং যতদিন ব্রাহ্মণ যথানিয়মে ছাত্রের ও গৃহস্থের কর্তব্য কর্ম না করিলে বনবাসের স্বাধীনতা বা নির্জন প্রদেশের সুখশান্তি লাভ করিতে পারা যায় না, এইরূপ ভাবেন, ততদিন তাঁহার শাস্ত্রানুগত মত নিতান্ত সরল থাকে। মহাভারতে (শান্তিপর্ক, ১৭৫ অধ্যায়ে) পিতা পুত্রের কথোপকথনে এই বিষয়টা স্পষ্ট বুঝা যায়। পিতা প্রাচীনগণের উপদেশ অনুসরণ করিবার জন্ত পুত্রকে কহিতেছেন, প্রথমে যথানিয়মে বেদাধ্যয়ন করিবে, তৎপরে বিবাহ করিয়া পুত্রমুখ দেখিবে, পরে বেদী নির্মাণ করিয়া যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। এবং সর্বশেষে বনে যাইয়া মুনি হইতে চেষ্টা করিবে। পুত্র পিতার এই পরামর্শ অগ্রাহ করিয়া গৃহস্থ-ধর্ম, কত্যা, পুত্র ও যাগযজ্ঞ সমস্তই অনাবশ্যক অধিকন্তু অনিষ্টকর বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন। তিনি কহিতেছেন, “পল্লিবাসীর সুখ-সন্তোষ মৃত্যাব দংষ্ট্রী মাত্র। ধর্মশাস্ত্রে অরণ্যই দেবতাদের আবাস-স্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পল্লিবাসীর সুখ-সন্তোষ তাহার বন্ধন রজ্জুস্বরূপ। জ্ঞানী লোকে উহা ছেদন করিয়া থাকেন কিন্তু অজ্ঞানীরা ছেদন করিতে পারে না। ব্রাহ্মণের নির্জনবাস, সমদর্শিতা, সত্য, ধর্ম, দয়া, ত্যাগপরতা ও সর্বকর্ম হইতে বিরতির ত্যাগ আর ধন নাই। হে ব্রাহ্মণ, যখন তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, তখন ধন, কিংবা আত্মীয়-বর্গ অথবা স্ত্রী দ্বারা তোমার কি উপকার হইবে? হৃদয়-নিহিত আত্মার অন্বেষণ কর। তোমার পিতাও পিতামহেরা কোথায় গিয়াছেন?”

১। নারদ কহিয়াছেন, মৃত ব্যক্তির ভ্রাতাদ্বারা পুত্রোৎপাদন, অতিথিসংকারে পোহতা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় মাংসাহার ও সন্ন্যাসগ্রহণ কলিযুগে নিষিদ্ধ। আদিত্য পুরাণেও এইমতের পোষকতা দেখা যায়।

২। আপস্তম্ব সূত্রের (১ম, ৬, ১৮, ৩১) টীকা দেখ।

এই উক্তি কবিকল্পনা-সম্মত বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু ইহা ভারতের প্রাচীন আৰ্য্যজীবনের প্রকৃত অবস্থা বিকাশ করিয়া দিতেছে। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে এই অরণ্য বাস যে, কাল্পনিক নহে, তাহা কেবল প্রাচীন ভারতের সাহিত্য হইতে কেন, গ্রীক লেখকগণ হইতেও বুঝিতে পারা যায়। গ্রীকেরা জনকোলাহল-পূর্ণ নগর ও পল্লীর পার্শ্বস্থ ধ্যান-নিমগ্ন জ্ঞানিগণের আশ্রম দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এই অরণ্য-বাসকে মনুষ্য-জীবনের সম্বন্ধে একটি নূতন কল্পনা বলিয়া মনে করেন। চতুর্থ শতাব্দীর খ্রিষ্টীয় সন্ন্যাসীদের জীবনের সহিত এই আরণ্য জীবনের অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। প্রভেদ এই, খ্রিষ্টীয় সন্ন্যাসীদের পর্বত-গুহা প্রভৃতি আশ্রয়-স্থান অপেক্ষা ভারতের আশ্রম গুলি অধিকতর জ্ঞানোন্নত ও অধিকতর স্বাস্থ্য-সম্পন্ন ছিল। সংসার পরিত্যাগ পূর্বক অরণ্যবাস স্বীকারের বিষয় খ্রিষ্টীয় সন্ন্যাসীরা বৌদ্ধগণ হইতে শিখিয়াছিলেন কি না, বৌদ্ধ ও রোমান ক্যাথলিকদের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মানুগত ক্রিয়াকলাপের মধ্যে যে, অসাধারণ সাদৃশ্য দেখা যায় (যেমন মঠ, বিহার, অক্ষমালা, পুরোহিতের ক্রিয়া-কলাপ) তাহা এক সময়ে ঘটিয়াছে, কি না, এসকল প্রশ্নের আজ পর্য্যন্ত কোন সুন্দর মীমাংসা হয় নাই। খ্রিষ্টীয় উদাসীন সম্প্রদায়কে ছাড়িয়া দিলে, কেবল ভারতবাসিদিগকে একমাত্র সভ্যজাতি বলিয়া বোধ হয়। এই ভারত-বাসীরা বুঝিয়াছিলেন যে, মানব-জীবনের এমন এক সময় আছে, যখন তরুণবয়স্ক দিগের উপর সংসার-ভার অর্পণ পূর্বক ইহলোক ও পরলোকের চিন্তাতে মগ্ন হইয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত। ভারত-বাসিগণই কেবল জীবনের এই গুঢ় তত্ত্বের মূল্য বুঝিতে পারিয়া ছিলেন। ভারতবর্ষে অনায়াসে জীবন যাত্রা নির্বাহ হইয়া থাকে। অতি অল্প পরিশ্রমেই পৃথিবী হইতে সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদিত হয়, এদিকে জলবায়ুর গুণে অরণ্য-বাস প্রীতিপ্রদ হইয়া উঠে। আৰ্য্যগণ এই অরণ্যবাসের যে সকল নাম দিয়াছেন, আদৌ তাহাতে আনন্দ বা সুখ বুঝাইত। কিন্তু ইউরোপে এরূপ কোন সুবিধা ছিল না; ইউরোপের স্থবিরগণ গৃহে থাকিয়া তরুণ-বয়স্ক-দিগের উপর কর্তৃত্ব করিতেন, তাঁহারা অনেক সময়ে ভবিষ্যৎবংশীয়দিগের



সৎকার্য্য প্রবলতার বেগ নিরুদ্ধ করিতেও ক্রটি করিতেন না। কিন্তু ভারতের স্থবিরগণ পৌত্রমুখ দেখিলেই অকাতরে জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপর সংসারের ভার সমর্পণ করিয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ নীরবে, নির্জনে, সুখ-শান্তিতে অতিবাহিত করিতে চেষ্টা করিতেন।

### আরণ্য জীবন।

প্রাচীন আর্য্যগণ যে, আমাদের অপেক্ষা জ্ঞানে ন্যূন ছিলেন, আমাদের এমন মনে করা উচিত নহে। আমাদের গ্রায় তাঁহারাও জানিতেন যে, অরণ্যে বাস করিলেও লোকের মন ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় কালীময় হইতে পারে। আমাদের গ্রায় তাঁহারাও ইহা বুঝিতেন যে, সমাজের জনতা ও গোলযোগের মধ্যেও মানব-হৃদয়ে পবিত্র আরণ্য আশ্রম বিরাজমান থাকিতে পারে, সেই আশ্রমে মানবের-প্রকৃত আত্ম-জ্ঞানও লাভ হইতে পারে। যাক্সবল্ল্য সংহিতায় উল্লেখ আছে (৩য়, ৬৬)— “বানপ্রস্থ হইলেই ধর্ম্ম হয় না। ধর্ম্মের প্রকৃত চর্চ্চা করিলেই কেবল ধর্ম্মলাভ হয়। অতএব আপনার পক্ষে যাহা কষ্টকর বলিয়া বোধ হয়, অন্যের প্রতি সেক্রপ ব্যবহার করিবে না।”

মনুতেও ঠিক এই ভাব দেখা যায় (৬ষ্ঠ, ৬৬) “মনুষ্য যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, সর্ব্বভূতের প্রতি সমদর্শী হইয়া যথানিয়মে কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করিবে। কোনকপ বাহু চিহ্ন ধারণ না করিলেও হয়, বাহু চিহ্ন ধারণকে কখনই কর্ত্তব্যকর্ম্মানুষ্ঠান বলা যাইতে পারে না। মহা-ভারতে এই ভাবের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখা যায়:—

“হে ভারত। সংযমী লোকের অরণ্য-বাসের প্রয়োজন কি? এবং অসংযমীরইবা অরণ্যের আবশ্যকতা কি? সংযমী যেখানে থাকেন, সেই স্থানই অরণ্য, সেই স্থানই আশ্রম” (১)।

১। শাস্তিপর্ক, ৫৯৬১,

দাস্তন্তুকিমরণ্যেন তথাদাস্তস্য ভারত।

যত্রৈব নিবসেদ্ দাস্তন্তদরণ্যং স চাশ্রমঃ ॥

“মুনি যদি পরিচ্ছদে ও অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া গৃহে বাস করেন, আর চির দিন যদি গুণ্ডাচারী ও দয়াশীল থাকেন, তাহা হইলেই তিনি সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হন” (১) ।

“আত্মা পবিত্র না হইলে ত্রিদণ্ড ধারণ, মৌনাবলম্বন, জটাভারবহন, মুণ্ডন, বকুল ও অজিন পরিধান, ব্রতপালন, অভিষেচন, অগ্নিহোত্র, বনে বাস ও শরীরশোষণ, সমস্তই নিষ্ফল” (২) ।

কাল সহকারে ক্রমেই ধর্ম সম্বন্ধে এইরূপ ভাবের আধিক্য দৃষ্ট হয় । এমন কি অতঃপর এই সকল ভাবই বৌদ্ধ-ধর্মের জয়লাভে সহায়তা করে । বৌদ্ধ-গণ ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান বা বাহ্য চিহ্ন-ধারণ নিরর্থক বলিয়া বিবেচনা করিতেন । বৌদ্ধধর্মাস্তর্গত ধর্মপদনামক গ্রন্থের এক স্থানে ( সংখ্যা ১৪১, ১৪২ ) দেখা যায় ;—

“যে মানব অভিলাষকে জয় করিতে পারে নাই, উলঙ্গভাবে অবস্থিতি, জটাভার, ধরাশয়ন, উপবাস, ভস্মলেপন ও নিশ্চলভাবে অবস্থান, কিছুতেই তাঁহাকে পবিত্র করিতে পারে না ।”

“যিনি পরিচ্ছদ প্রভৃতিতে সজ্জিত হইয়াও শাস্ত, সংযত, অমুদ্বত, ইন্দ্রিয়-বিকার-শূন্য এবং হিংসা-রহিত থাকেন, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, তিনিই শ্রমণ এবং তিনিই ভিক্ষু ।”

ঠিক আমাদের ন্যায় প্রাচীন ভাবুকদের মনেও ক্রমাগত এই সকল ভাবের উদয় হইয়াছিল । ধর্ম-সংক্রান্ত কবিতায় ও মহাকাব্যে এই ভাব মনো-হারিণী শোভা পবিগ্রহ করিয়াছে । মহাভারতোক্ত (৩) জনক রাজা ও সুনভার

(১) বনপর্ব, ১০৪৫০,

তিষ্ঠন্ গৃহে চৈব মুনির্নিত্যং শুচিরলঙ্কৃতঃ ।

যাবজ্জীবং দয়াবাংশ্চ সর্বপাপৈঃ প্রমুক্ততে ॥

(২) বনপর্ব, ১৩৪৪৫,

ত্রিদণ্ডধারণং মৌনং জটাভারোহথ মুণ্ডনম্ ।

বকুলাজিনমশ্বেষ্টং ব্রতচর্যাভিষেচনম্ ॥

অগ্নিহোত্রং বনে বাসঃ শরীরপরিশোষণম্ ।

সর্বানোতানি মিথ্যাস্বার্থাদি ভাবো ন নির্মলঃ ।”

(৩) মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩২০ অধ্যায় ।

কথোপকথনের বিষয় উল্লেখ করিলেই ইহার সৌন্দর্য্য বুঝা যাইবে। জুলভা পরমসুন্দরী কামিনীর বেশ ধারণ কবিতা জনকের প্রতি এই বলিয়া দোষা-রোপ করিতেছে যে, তিনি জগতের না হইয়াও জগতে বাস করিতেছেন এবং রাজা হইয়াও ঋষি হইবেন, মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিয়া আপনাকে বঞ্চনা করিতেছেন। তাহাতে জনক রাজা এই বলিয়া গৌরব করিয়াছিলেন যে, যদি তাঁহার রাজধানী সনাত মিথিলানগরী ভস্মমাং হয়, তাহা হইলেও তাঁহাব কোন সামগ্রীই বিনষ্ট হইবে না (১)।

তথাপি প্রাচীন ব্রাহ্মদিগের এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, জীবনের প্রথম ও দ্বিতীয়াংশ অতিবাহিত হইবার পর মানুষ যখন পঞ্চাশৎ বর্ষে উপনীত হয়, অর্থাৎ আমবা সংসারিক কার্য্যে আসক্তি প্রযুক্ত যাহাকে জীবনের অতি উৎকৃষ্ট সময় বলিয়া মনে কবি, তাহা যখন শেষ হয়, তখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হইবার পূর্বে মানুষের সুখ-শান্তিতে এবং তপস্যা দ্বারা অভ্যস্তবে, বহির্ভাগে ও সম্মুখ-ভাগে দৃষ্টপাত করিবার অধিকার জন্মে।

যাহা হউক, এই দুই প্রথা দ্বারা প্রকৃত উন্নতি, প্রকৃত সভ্যতা ও মানব-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ বা প্রতিরুদ্ধ হইত কি না, এস্থলে তাহার কোন সমালোচনার প্রয়োজন নাই। কোন নূতন ও অপরিচিত বিষয় দেখিয়া আমবা যাহাতে উহার উপর দোষাধোপ না করি, আর যাহা আমা-দের পরিচিত, কেবল তাহারই গৌরবে প্রবৃত্ত না হই, আমাদের তাহাই সর্লদা মনে রাখা উচিত। ইউরোপের স্ববিরগণ নিঃসন্দেহ অনেক উপ-কার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের কর্তৃত্ব, তাঁহাদের প্রভুত্ব যে, অনেক সময়ে তরুণবয়স্ক যুবক-হৃদয়ের উদার সঙ্কল্প নষ্ট করিত, ইতিহাস তাহাও নির্দেশ করিতেছে। নবীনেরা প্রাচীনদিগকে নির্লোধ ভাবেন এবং প্রাচীনেরা নবীনদিগকেও এইরূপ নির্লোধ বলিয়া জানেন, এই যে একটা কথা আছে, তাহা মিথ্যা না হইতে পারে। কিন্তু প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম ও রাজনীতিজ্ঞদের মানসিক ভাবের নবীনত্ব ও মানসিক তেজের ত্রাসের সঙ্গে সঙ্গে যে, তাঁহাদের ইষ্টের পরিবর্তে অনিষ্ট উৎপাদনের শক্তি বৃদ্ধি পায়, তাহাও কি এইরূপ সত্য নহে?

এই বানপ্রস্থ-ধর্ম ইচ্ছাবিকল্প বনবাস মাত্র ছিল না। ইহা আর্ষাদিগের একটি পবিত্র অধিকারের মধ্যে পরিগণিত ছিল। যাহারা যথানিয়মে ছাত্র ও গৃহস্থের কর্তব্য সম্পাদন করেন নাট, তাহারা এই আশ্রমে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। মানব-হৃদয়ের দুর্দমনীয় রিপু দমন জন্য প্রথম দুই অবস্থায় শিক্ষা লাভ করা অতি আবশ্যিক। মানব-জীবনের এই সর্বোৎকৃষ্ট সময়ে চিন্তা ও কার্যের স্বাধীনতা অতি অল্প ছিল। ছাত্র যেমন পাঠাভ্যাসে নিয়ত থাকিতেন, সেইরূপ তিনি দেবতায় বিশ্বাস করিতেন, দেবতার উপাসনা করিতেন এবং দেবতার উদ্দেশে বলি দিতেন। বেদ ছাত্রের পরম পবিত্র গ্রন্থ ছিল। ইহা অকৃত্রিম, দেবদত্ত বলিয়া ভারতীয় সাহিত্যে যেকোন সমাদরে সংরক্ষিত হইয়াছে, অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ নেক্রপ সমাদৃত দেখিতে পাওয়া যায় না।

মানব তৃতীয়াশ্রম প্রবেশ করিবামাত্র এই সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইতেন। তিনি এই আশ্রমে থাকিয়া কিছু দিন বাহ্য ক্রিয়া-কলাপের অনুরোধ এবং স্তোত্র পাঠ ও বেদোচ্চারণ করিতে পারিতেন বটে, কিন্তু উপনিষদোক্ত অনন্ত আত্মাতে মনোনিবেশ করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। তিনি এই আত্মানুগমনে যতই মনোনিবেশ করিতেন অহংকাবে মত্ত থাকিয়া, যে সকল বস্তু আপনাব বলিয়া ভাবিতেন, তৎসমুদয় যতই পরিহার করিতে পারিতেন এবং স্থায়ী অচিরস্থায়ী বিষয় হইতে দূরে থাকিয়া যতই অনন্ত আত্মাতে পরমাত্মার দর্শন লাভে সমর্থ হইতেন, ততই নিয়ম, আচার, জাতি ও বাহ্য ধর্মের বন্ধন সকল তাঁহার নিকট বিচ্ছিন্ন হইতে থাকিত। বেদজ্ঞান এখন তাঁহার নিকট সামান্য জ্ঞান বলিয়া বোধ হয়। যাগ যজ্ঞ সকল বাধা স্বরূপ বলিয়া মনে হয় এবং প্রাচীন দেবতা অগ্নি, ইন্দ্র, বিত্র ও বরুণ, বিশ্বকর্মা, প্রজাপতি কেবল নাম মাত্র বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে। তখন আত্মা ও ব্রাহ্মণ (অন্তরাত্মা ও বাহ্যাত্মা) কেবল এই দুইটি মাত্র থাকে। তখন তিনি এই সকল বাক্যে সর্বোচ্চ জ্ঞান প্রকাশ করেন, 'তত্ত্বম্,' তুমিই এই, তোমাতেই তুমি, যখন সকল বস্তু কিছু কালের জন্য তোমার বলিয়া বোধ হয়, তখন যে আত্মজ্ঞান থাকে, তাহা অন্তর্হিত হইলে অনন্ত আত্মা লাভ হয়। যখন সমুদয় সৃষ্ট পদার্থ স্বপ্নের ন্যায় তিরোহিত হয়,

তখন তোমার প্রকৃত আত্মা অনন্ত আত্মায় মিশিয়া যায়। তোমার শরীরস্থ আত্মাই প্রকৃত ব্রাহ্মণ(৫)। জন্মমৃত্যু হেতু কিছুকাল তুমি উহার অপরিচিত

(৫) আমি “ব্রাহ্মণ” শব্দের পরিবর্তে “আত্মন,” শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। যদিও ব্রাহ্মণ শব্দের ক্রমোৎকর্ষ পরিষ্কাররূপে বুঝা যায়, তথাপি আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, আমি উহার প্রকৃত ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিরূপণ করিতে পারি নাই। ব্রাহ্মণ বলিলেই যেন এমন কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় বুঝায়, যাহা হইতে ইহা উদ্ভূত হইয়াছে, কিন্তু এই বিষয় কি, তাহাতে এখনও আমার সংশয় আছে।

ব্রাহ্মণ বৃহ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় বৈয়াকরণদিগের মতে বৃহ্ ধাতুর অর্থ স্থাপন বা নির্মাণ করা, চেষ্টা করা, বৃদ্ধি পাওয়া। এই তিনটি অর্থ সঙ্কচিত করিয়া একটি করিলে “ঠেলন” হয়। ইহা অকর্ম্মক রূপে ব্যবহৃত হইলে উদ্ভূত হওয়া, বর্দ্ধিত হওয়া বুঝায় এবং সাকর্ম্মক রূপে ব্যবহৃত হইলে উৎপাদিত করা, স্থাপন করা বুঝাইয়া থাকে।

প্রাচীনেরা ব্রাহ্মণ শব্দের যে সকল অর্থ নির্দেশ করিয়াছেন, তৎসমুদায়ের সহিত এই সকল অর্থের তাদৃশ সংশ্রব নাই। যাক্ষ ব্রাহ্মণের অর্থ খাদ্য কিংবা ধন নির্দেশ করিয়াছেন। সায়নাচার্য্য এই সকল অর্থের সহিত আর কয়েকটি যোগ করিয়া দিয়াছেন, যথা, স্তোত্র, প্রশংসাস্তোত্র, যজ্ঞ, বৃহৎ। অধ্যাপক রথ নির্দেশ করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণের প্রথম অর্থ (১) ধর্ম্মসম্বন্ধে ধ্যান, ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য চেষ্টা, ঐশ্বরিক উপাসনায় প্রত্যেক ধর্ম্মসম্বন্ধে কার্য্য, (২) পবিত্র নিয়ম, (৩) পবিত্র বাক্য, ঈশ্বরের বাক্য, (৪) পবিত্র জ্ঞান, তত্ত্ববিদ্যা, ঐশ্বরিক জ্ঞান, (৫) পবিত্র জীবন, সাধুতা, (৬) ঐশ্বরিক জ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ বিষয়, নিরাকার ঈশ্বর, এক অদ্বিতীয়, (৭) ধর্ম্মগাজক। পক্ষান্তরে হৌগ সাহেব বলেন, ব্রাহ্মণের আদিম অর্থ, কুশনির্ম্মিত সম্ভারজ্ঞান, তিনি বেন্‌ফির নায় পারসীকদিগের যজ্ঞ বিশেষের স্রবোর সহিত ইহার অভেদ বলিয়া করিয়াছেন। এই যজ্ঞ বৈদিক সোম যাগের অনুরূপ। তিনি অনুমান করেন, ব্রাহ্মণের অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া শুভ। স্তোত্রের উপর যজ্ঞের শুভাশুভ নির্ভর করাতে স্তোত্রসমুদয়ও ব্রাহ্মণ নামে উক্ত হয়।

কিন্তু আমি এই সকল অর্থও পরিত্যক্ত হই নাই। ব্রাহ্মণ শব্দের উৎপত্তি ও উদ্ভূতির কথা না বলিয়া আমি উহার আর একটি অর্থ নির্দেশ করিতেছি। বৃহ্ ধাতুর অর্থ শব্দকরা, কথা বলা। কথা উদ্ভূত হইয়া উদ্ভিষ্ট বিষয়ে প্রযুক্ত হয়। ঈশ্বর প্রধান উদ্ভিষ্ট বিষয়। ঈশ্বর কথা দ্বারা স্তুত হন। লাতিনের শব্দ-বিশেষের ধাতুতেও এইরূপ অর্থ দেখা যায়। ভারতবর্ষীয়েরা বৃহ ও ব্রহ্মের আদিম অর্থ কতদূর পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা বলা দুর্ব্বট। তাঁহারা এক দেবতাকেই বৃহস্পতি ও বাচস্পতি নামে নির্দেশ করিতেন। বৃহদারণ্যকে (১ম, ৩, ২০) উল্লেখ আছে, ‘এষ উ এব বৃহস্পতি বাপতৈ বৃহতী, তস্য এব পতিঃ তস্মাৎ উ বৃহস্পতি, এষ উ এব ব্রহ্মস্পতিঃ, বাগ বৈ ব্রহ্মা, তস্য এব পতিঃ, তস্মাৎ উ ব্রহ্মস্পতিঃ। এই স্থলে

থাক। কিন্তু যখন তুমি তৎসমীপে প্রত্যাপ্ত হও, তখনই তাহার পরিচিত হইয়া উঠ।

### উপসংহার।

আমরা যে সুদীর্ঘ পথের পথিক হইয়াছিলাম, এইখানে তাহার শেষ হইল। যে “অনন্ত,” আদৌ পর্বত, নদী, সূর্য্য, আকাশ, উষা, চন্দ্র, বিশ্বকর্মা ও প্রজাপতি প্রভৃতির অন্তবালে দৃষ্ট হইত, এইখানে সেই “অনন্ত” আপনার উচ্চতম ও পবিত্রতম মূর্তিতে পরিদৃষ্ট হইল। ভারতবাসীর জ্ঞান ইহা অপেক্ষা আর অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। তাঁহারা কহিয়াছেন, আমরা কি তাহাকে বর্ণন বা অবধারণ করিতে পারি? ইহার উত্তর স্থলে তাঁহারা নিজেই বলিয়াছেন, “না”। আমরা তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিব, সমস্তই “না না”। তিনি ইহা নন, তিনি উহা নন, তিনি স্রষ্টা নন, পিতা নন, সূর্য্য নন, আকাশ নন, নদী বা পর্বতও নন। আমরা তাঁহাকে যাহাই বলি না কেন, তিনি তাহার কিছুই নহেন। আমরা তাঁহার অবধারণ বা তাঁহার নাম-নির্দেশ করিতে পারি না, কিন্তু তাঁহাকে অনুভব করিতে পারি। আমরা তাঁহাকে জানিতে পারি না, কিন্তু তাঁহার উপলব্ধি করিতে পারি। আমরা একবার যদি তাঁহাকে পাই, তাহা হইলে কোনও ক্রমে তাঁহা হইতে বিচ্যুত হইতে পারি না। তখন আমরা শান্তির ক্রোড়ে লালিত, আমরা বন্ধন-মুক্ত ও আমরা সুখী হই। মৃত্যু আসিয়া যত দিনে তাঁহাদিগকে বিযুক্ত না করিত, ততদিন তাঁহারা সহিসু হইয়া কালান্তিপাত করিতেন। তাঁহারা তাঁহাদের বারুক্যকাল বৃদ্ধি করিবার কোন চেষ্টা করিতেন না বটে কিন্তু আত্মঘাতী হওয়া মহা পাপ বলিয়া মনে করিতেন(১)।

বাক্শব্দর সহিত বৃহত্তী (বৃহ) ও ব্রাহ্মণ একত্র দেখা যাইতেছে। বৃদ্ধি পাওয়া অর্থ-বোধক বৃহ ধাতু হইতে বহিঃ (তৃণ, তৃণপুঞ্জ) শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। যাহাইউক, ব্রাহ্মণ শব্দ শেষে বিধি, আত্মা, পরমাত্মা অথ-দ্যোতক হইয়া উঠিয়াছে।

(১) মনু (৬ষ্ঠ, ৪৫) কহিয়াছেন, মৃত্যু কামনা কবা উচিত নয়, বাঁচিবারও ইচ্ছা করা উচিত নয়, বেতনভুক্ ভৃত্য যেমন ভূতির অপেক্ষায় থাকে, সেইরূপ নিয়মিত সময়ের অপেক্ষায় থাকিবে।

তঁাহারা পৃথিবীতে অনন্ত জীবন লাভ করিতেন, তঁাহাদের বিশ্বাস ছিল, পুনর্জন্ম কিংবা মৃত্যু আর তঁাহাদিগকে অনন্ত আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না।

তথাপি তঁাহারা আপনাদেব আত্মার বিধ্বংসে বিশ্বাস করিতেন না। ইন্দ্র যখন সহিসু হইয়া প্রজাপতির নিকট আত্মজ্ঞান লাভ কবিতেন, তখন তিনি বাহা কহিয়াছিলেন, তাহা একবার স্মরণ করুন। ইন্দ্র প্রথমে জল-পতিত ছায়াতে আত্মার অনুসন্ধান করেন, পরে লোকের তদ্ভাবস্থায় এবং পরিশেষে লোক যখন গাঢ় নিদ্রাভিভূত, তখন তাহাতে আত্মার অব্যবহাতি করিতে থাকেন, কিন্তু ইহাতে তিনি পরিতৃপ্ত না হইয়া কহেন, “না ইহা আত্মা হইতে পারে না, যেহেতু নিদ্রিত ব্যক্তি জানিতে পারে না যে, সে আমি, কিংবা সে কোন পাদার্থের সত্তা অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। সে ধ্বংসমুখে পতিত হইবে। আমি ইহাতে কোন উপকার দেখিতেছি না। তঁাহার গুরু এ বিষয়ে কি উত্তর দিয়াছিলেন? গুরু কহিয়াছিলেন, “এই শরীর মরণ-ধর্মশীল, ইহা সর্বদাই মৃত্যুর আয়ত্ত থাকে, কিন্তু এই নশ্বর শরীরই আত্মার বাসগৃহ, এই আত্মা অমর ও অশরীরী। এই শরীর আমি এবং আমিই এই শরীর, যত দিন এই জ্ঞান থাকে, ততদিন আত্মা সুখ দুঃখ হইতে বিমুক্ত হয় না; কিন্তু যখন আমি শরীর হইতে পৃথক্, আত্মার এই জ্ঞানের উদয় হয়, তখন কি সুখ, কি দুঃখ, কিছুই আর তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

“এই আত্মা—সর্বোত্তম পুরুষ ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না, ইহা পুনরায় আপনাতেই ফিরিয়া আইসে। ইহা কেবল দর্শকরূপে থাকিয়া আনন্দিত হয়, হাসে, খেলা করে, শরীর যে ইহার উৎপত্তিস্থান, তাহা ইহার মনে থাকে না। ইহা চক্ষুর আত্মা, চক্ষু কেবল যন্ত্রমাত্র, যিনি জানেন, আমি ইহা বলিব, আমি ইহা শুনিব, আমি ইহা ভাবিব, তিনিই আত্মা, জিহ্বা, কণ এবং মন কেবল যন্ত্রমাত্র। মন তঁাহার স্বর্গীয় চক্ষু, এই চক্ষু দ্বারা আত্মা সমুদয় সুন্দর বস্তু দেখিয়া আনন্দিত হন।”

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, নির্লিপ-লাভ বনবাসীদের ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না। আত্মা বিমুক্ত হইয়াও পূর্বের



ন্যায় বিদ্যমান থাকিবে। আমরা আপনাদিগকে যাহা বলিয়া ভাবিতাম, তাহা আর থাকিলাম না, আপনাদিগকে যাহা বলিয়া জানি, আমরা তাহাই হইলাম। যেমন কোন রাজপুত্র হীনবংশোদ্ভব বলিয়া প্রতিপালিত হইলে হীন-বংশোদ্ভব বলিয়াই পরিচিত হন, কিন্তু কোন বন্ধু মুখে আপনার প্রকৃত জন্ম-বৃত্তান্ত শুনিলে তিনি কে তাহা জানিতে পারেন, এবং রাজপুত্ররূপে পরি-গৃহীত হইয়া পিতার সিংহাসনে আরুঢ় হন, আমাদের ঠিক সেইরূপ হইয়া থাকে। যত দিন আমরা আমাদের আত্মাকে চিনিতে না পারি, ততদিন আমরা আপনাদিগকে যাহা বলিয়া ভাবি, তাহাই থাকি। কিন্তু আমরা যথার্থতঃ কি, ইহা কোন বন্ধু যখন দয়া করিয়া আমাদের বলেন, তখন আমরা নিমেষ মধ্যেই পরিবর্তিত হই, আত্মা নিকট উপনীত হই, এবং আত্মাকে অবগত হই। রাজ-বালক যেমন নিজ পিতাকে চিনিয়া স্বয়ং রাজা হন, সেইরূপ আমরাও আত্ম-পরিচয় পাইয়া আমাদের আত্মা হইয়া উঠি।

### ধর্মচিন্তার অবস্থা।

যে ধর্ম সরল বাল্য-ভাবপূর্ণ উপাসনা হইতে অবস্থার পর অবস্থা অতি-ক্রম করিয়া পরিশেষে সর্বোচ্চ দার্শনিক ভাবে পরিণত হইয়াছে, আমরা তাহার সমালোচনা করিলাম। বৈদিক স্তোত্রের অধিকাংশে বৈদিক ধর্মের বাল্যাবস্থা, ব্রাহ্মণ-বর্ণিত যজ্ঞাদি, গার্হস্থ্য ও নৈতিক ব্যবস্থাদিতে মধ্যাবস্থা এবং উপনিষদে বৃদ্ধাবস্থা দৃষ্ট হয়। জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসী যদি ব্রাহ্মণ আয়ত্ত করিয়াই বাল্য-ভাবপূর্ণ স্তোত্রাদি পরিত্যাগ করিতেন এবং পরিশেষে যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্মকাণ্ডেও মার্কত্যা ও দেবগণেও প্রকৃত শক্তি অস্বীকার করিয়া যদি একমাত্র উপনিষদের উন্নত ধর্মে আদর দেখাইতেন, তাহা হইলে কোন কথাই ছিল না। কিন্তু সেরূপ কিছুই হয় নাই। ভারতে যে ধর্মভাব প্রথমে পরিব্যক্ত হইয়াছে এবং পুরুষানুক্রমে পবিত্র বলিয়া চলিয়া আসিয়াছে, তাহাই রক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। বৈদিক ধর্মের বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য, এই তিন কালে যে সমস্ত ভাব পরিষ্কৃত হইয়াছে, তৎ-সমুদয় যথাক্রমে মানব জীবনের তিন অবস্থার সহায়তা করিতেছিল।

ইহাতেই বুঝা যাইতে পারে যে, সুপবিত্র বেদে কেবল ধর্মচিন্তার নানা অবস্থা বিবৃত হয় নাই, অধিকন্তু উহাতে পরস্পর-বিরোধী মতসকলও সংরক্ষিত হইয়াছে। বেদেব স্তোত্র-সমূহে ঐহারা দেবতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, ব্রাহ্মণে সর্ষজীবেশ্বর প্রজাপতির বিষয় পাঠ করিলে আর আমবা তাঁহাদিগকে দেবতা বলিতে পারি না। ইহার পর উপনিষদে যখন ব্রাহ্মণ সমস্ত বিষয়ের হেতু বলিয়া পরিগণিত হইল এবং ব্যক্তিগত আত্মা অনন্ত আত্মার কণা মাত্র বলিয়া অবধারিত হইল, তখন বৈদিক দেব-গণের আর দেবত্ব রহিল না।

শত শত এমন কি সহস্র সহস্র বংশব ব্যাপিয়া এই প্রাচীন ধর্ম আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, কখনও কখনও ইহার আধিপত্য বিলুপ্ত হইলেও পুনরায় ইহা শক্তি সংগ্রহ করিয়া আপনার পূর্ব-প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে, ইহা যেনন সমরোচিত তেমনি কালোপযোগী। অনেক নূতন ও বিনদূশ বিষয় আসিয়া ইহাতে প্রবেশ করিয়াছে। অত্যাপি অনেক ব্রাহ্মণ-পরিবারের মধ্যে শ্রুতি ও স্মৃতিব ব্যবস্থানুসারে লৌকিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন হইয়া থাকে।

অত্যাপি এখন অনেক ব্রাহ্মণ পরিবার আছে, যে পরিবাবে স্কুগাবমতি বালকগণ বেদ পাঠ করিতেছে, তাঁহাদের পিতা প্রতিদিন আপনার পবিত্র কর্তব্য যোগবস্ত্র অমুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকিতেছেন, পক্ষান্তরে তাঁহাদের পিতামহ পল্লীবাসী হইয়াও কর্মকাণ্ডের প্রতি অনাদর দেখাইতেছেন এবং বৈদিক দেবতার নাম বুঝা মনে করিতেছেন। বেদান্তই এক্ষণে তাঁহার ধর্ম হইয়া উঠিয়াছে, তিনি এই বেদান্তই শাস্ত্রের অন্তর্গত কবিতেন।

ইহাদের তিন পুরুষই নির্বিবাদে একত্র বাস করিয়া থাকেন। পিতামহ অধিকতর জ্ঞানী হইলেও পুত্র পৌত্রের প্রতি অবজ্ঞা দেখান না, কিংবা তাহাদিগকে ভণ্ডাচারী বলিয়াও সন্দেহ করেন না। তিনি জানেন যে, ইহার পর তাহাদেরও মুক্তির সময় আসিবে। এজন্য তিনি এমন ইচ্ছা করেন না যে, তাহারা এই মুক্তির জন্য সর্বদা উৎসুক থাকুক। পুত্র কঠোর ব্রত-পালনে বাধ্য হইলেও পিতার স্বাধীনতা দেখিয়া ক্ষুব্ধ হন না। যেহেতু তিনি জানেন যে, তাহার পিতা একে ও এক সময়ে এই কঠোর ব্রত পালন করিতে হইয়াছিল। ধর্মের আলোচনায় আমাদের যে সকল জ্ঞান লাভ হয়, এতদ্বারা কি তাহার

কিছুই নাই? যখন আমরা দেখি, যাঁহারা ইশ্বের উপাসনা করিতেন, তাঁহারা অগ্নির উপাসকদের সহিত একত্র থাকিতে কুণ্ঠিত হন নাই, যখন আমরা দেখি, যাঁহারা প্রজাপাতির আরাধনায় ব্যাপৃত থাকিতেন, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর দেবগণের উপাসকদের প্রতি কিছুমাত্র অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন নাই, যখন আমরা দেখি যাঁহারা আত্মচিন্তায় নিবিষ্ট থাকিয়া পরমাত্মার জ্ঞান লাভ পূর্বক সমুদয় দেবতাকে নাম মাত্র বলিয়া নির্দেশ করিতেন, তাঁহারা এই পূর্বোপাসিত দেবগণের নিন্দাবাদে উন্মুখ হন নাই, তখন আমরা অনেক বিষয়ে তাঁহাদের অপেক্ষা জ্ঞানী ও সুনভ্য হইলেও কি তাঁহাদের নিকট হইতে কিছুই শিখিতে পারি না?

আমার একরূপ অভিপ্রায় নহে যে, সকল বিষয়েই আমাদের কেবল ব্রাহ্মণদের অনুকরণ করা উচিত এবং তাঁহাদের ধর্মগত বিশ্বাসের অনুমোদনীয় চারিটি আশ্রমও আমাদের সমাজে প্রচলিত করা কর্তব্য। আমাদের আধুনিক জীবন উল্লুপ কঠোর নিয়মের বশীভূত হইতে পারে না। প্রকৃত বিশ্বাসের অধিকারী হইবার আশায় কেহই এখন যাগ বজ্র ও কঠোর ব্রত-পালনের কষ্ট স্বীকার করিবেন না। প্রাচীন ভারতে যেক্রপ শিক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, আমাদের আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতির সহিত তাহার কোন সাদৃশ্য নাই। আধুনিক সমাজে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার গৌরব বাড়িয়াছে। এ সমাজে ভারতের প্রাচীন ব্যবস্থাপকদিগের ব্যবস্থা পরিগৃহীত হওয়া সম্ভবপর নহে। ভারতবর্ষে আমরা যে সকল ব্যবস্থার কথা জানি, তৎসমুদয় কিরূপে প্রতিপালিত হইত, তাহা বুঝিতে পারি না। ভারতের ইতিহাসেই দেখা যায় যে, পরিশেষে ব্রাহ্মণদিগের এই কঠোর ব্যবস্থার বন্ধনও ছিন্ন হইয়াছিল। যেহেতু, ভারতের বৌদ্ধধর্মে আমরা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিকাশ দেখিতে পাই। বৌদ্ধধর্ম সাধারণকে সামাজিক বন্ধন অতিক্রম করিবারও অধিকার দিয়াছে। বৌদ্ধেরা ইচ্ছা করিলেই অরণ্যে যাইয়া স্বাধীন ভাবে ধর্ম'মুশীলনে ব্যাপৃত থাকিতেন। ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা এই বলিয়া বৌদ্ধদিগের উপর একটা গুরুতর দোষের আরোপ করেন যে, তাঁহারা প্রব্রজিত, তাহারা নিয়মিত সময়ের পূর্বে ব্যবস্থা-বন্ধন ছেদন করে এবং প্রাচীন নিয়মানুসারে বজ্রাদির অনুষ্ঠানে বিরত থাকে।

যদিও আমরা ভারতীয় প্রাচীন আর্থাগণের এই ক্রমোন্নত জীবনান্ধিপাত-পদ্ধতির অনুকরণ করা উচিত বোধ করি না, যদিও ইদানীন্তন সময়ে সাংসারিক কার্যে বিরক্তি জন্মিলে আমাদেরকে অরণ্য আশ্রয় করিতে হয় না এবং যদিও সমাজের বর্তমান অবস্থায় কখনও কখনও সংসারে থাকিয়াই আমরা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা অপেক্ষাকৃত গৌরব-জনক বোধ করি, তথাপি আমরা প্রাচীন ভারতের অরণ্য-বাসীদের নিকট হইতে বহুমূল্য উপদেশ পাইতে পারি। এই উপদেশের বলে আমরা আমাদের জীবনের বাহিরে, অভ্যন্তরে ও উর্দ্ধে অবলোকন করিতে সমর্থ হই, এই উপদেশের বলে, আমরা ক্ষমা, করুণা ও সমবেদনা লাভ করিতে পারি, বনবাসী না হইয়া নগরবাসী হইলেও এই উপদেশের বলে আমরা ক্রুরপে প্রতিবাসীদের সহিত একতা ও ক্রুরপে প্রভেদ রাখিতে হয়, তাহা শিখিতে পারি, যাহারা আমাদের ধর্মসম্বন্ধীয় মতে অবজ্ঞা দেখায়, এই উপদেশের বলে আমরা তাহাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করিতে পারি এবং যাহাদের বিশ্বাস, যাহাদের আশা, যাহাদের ভাবনা, এমন কি যাহাদের নৈতিক মত আমাদের হইতে বিভিন্ন, আমরা এই উপদেশের বলে সকল সময়ে, সকল অবস্থাতেই তাহাদিগকে অবজ্ঞা কবিত্তে বিরত থাকি। ফলতঃ যে জীবনে মানুষ, “মানুষ কি” তাহা বুঝিয়াছেন, জীবন কি তাহা অবধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং অনন্ত ও অসীমের সমক্ষে মৌনাবলম্বন কবিত্তে অভ্যাস করিয়াছেন, সেই জীবনই প্রকৃত অরণ্য জীবন ও সেই জীবনই অরণ্যবাসী প্রকৃত জ্ঞানিগণের উপযোগী।

মানব-মনের এই অবস্থাকে নিন্দা করা অতি সহজ; নিন্দাবাদ উদ্দেশ্যের উপযোগী শব্দ বিন্যাস করিতেও কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না। কেহ কেহ এই অবস্থাকে অন্তঃসার-বিহীন তাচ্ছল্য প্রদর্শন মাত্র কহেন, কেহ কেহ ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধর্মপ্রণালী এবং শৈশবাব্দ তিন কালের জন্য জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা সাধুতার বহির্ভূত বলিয়া নির্দেশ করেন, আবার সমাজের শিক্ষিত ও অনিাক্ষিত, উভয় সম্প্রদায়ের জন্য এই বিভিন্নতা তাঁহারা অধিকতর অসাধু বলিতেও সঙ্কচিত হন না।

যাঁহা এইরূপ নিন্দাবাদের পক্ষপাতী, আমি তাঁহাদিগকে, সংসারে যাঁহা হইয়া থাকে, যাঁহা আমাদের চারি দিকে সর্বদা ঘটিতেছে, একবার তাহার আলোচনা করিতে অনুরোধ করি। পাদরি বার্ক্লি, কিংবা নিউটনের ধর্ম্ম আর সামান্য কৃষক-বালকের ধর্ম্ম কি এক? এই প্রশ্নের উত্তরস্থলে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, কোন কোন অংশে এক, কিন্তু অধিকাংশস্থলে এক নহে। ইংলণ্ডের লোক যদি বলিত, মানসিক উন্নতির সহিত ধর্ম্মের কোন সংশ্রব নাই, তাঁহা হইলে মাথু আর্গোল্ডের ন্যায় জ্ঞানী পুরুষের কথা কখনও আদৃত হইত না; পাদরি বার্ক্লিও নিরক্ষর জড়ভাবাপন্ন কৃষক-বালকের সহিত একত্র উপাসনা করিতে অসম্মত হইতেন না। কিন্তু এই বিখ্যাত নার্শনিক ঈশ্বর শব্দে যাঁহা বুঝিতেন, সামান্য কৃষকবালকও যে তাঁহাই বুঝিত, তাঁহা কখনও সম্ভবপর নহে।

কিন্তু অপরের কথা না বলিয়া আমাদের নিজের বিষয়ই বিবেচনা করা যাউক, সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ছাড়িয়া আমরা বাল্য হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত যে যে অবস্থা অতিক্রম করি, তাঁহাই ধরা যাউক। কোনও সজ্জন এতদূর বলিতে পারেন না যে, বাল্যকালে তাঁহার যেরূপ ধর্ম্মবুদ্ধি ছিল যৌবনে ঠিক সেইরূপ আছে, এবং প্রৌঢ়কালে যেরূপ ছিল, বার্দ্ধক্যেও ঠিক সেইরূপ আছে। বাল্য-বিশ্বাসই প্রকৃত বিশ্বাস এই বলিয়া আপনাদিগকে প্রতারণিত করা অতি সহজ। বয়োবৃদ্ধি সহকারে আমরা বাল্যবিশ্বাসমূলক অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই; কিন্তু ইহা জানিবার পূর্বে আমরা বালকত্ব-সুন্দর বিষয়গুলিও পরিত্যাগ করিতে শিখি। উদীয়মান সূর্য্যে যে আভা বিকশিত হয়, অন্তর্মিত সূর্য্যেও সেই আভা পরিস্ফুট হইয়া থাকে। কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যভাগে সমস্ত জগৎ রহিয়াছে। আকাশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে উপস্থিত হইয়া সূর্য্যকে প্রাভাতিক লক্ষ্মীর পরিবর্তে সায়ন্তন-শ্রী পরিগ্রহ করিতে হয়। মানব-জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতে ও সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে এই প্রকার ধর্ম্মগত বিভিন্নতা আছে কি না, তাঁহা আর আমাদের জিজ্ঞাস্য হইতেছে না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, আমরা প্রাচীন ব্রাহ্মণদের ন্যায় অরূপটে যথার্থ বিষয় স্বীকার করি কি না, অর্থগত বৈষম্য সত্ত্বেও যাঁহারা আমাদের সহিত ধর্ম্ম-বিষয়ে এক শব্দ ব্যবহার

করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সঙ্গে এবং যাঁহারা সেক্রপ করেন না, তাঁহাদের সঙ্গেইবা আমাদের কিক্রপ সম্বন্ধ ?

ইহার পর এই জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, সকলেরই এক শব্দ ব্যবহার করায় বা না করায়, স্বর্গীয়ের প্রতি এক নাম প্রয়োগ করায় বা না করায় কোন ইতরবিশেষ আছে কি না ? অগ্নি ও প্রজাপতি নামের কি একই কার্য্য-কারিতা ? বাল নাম যেমন, জিহোবা কি তেমনি ভাল ? উৎকর্ষ বিষয়ে অহরমজ্জাও ও অল্লা নাম কি গমান ? ঈশ্বরের গুণ-বিষয়ে আমরা অতি অজ্ঞ হইলেও তাঁহাতে যে সকল গুণ আরোপিত হইয়াছে, তাহার কতকগুলি কি অযৌক্তিক ও মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না ? ঈশ্বরের উপাসনায় আমরা অজ্ঞ হইলেও বর্তমান উপাসনা-পদ্ধতির কোন কোন বিষয় কি পরিত্যক্ত হইবার যোগ্য নহে ?

এই সকল প্রশ্নের কতকগুলি উত্তর আছে। সকলে সেই সকল উত্তরের সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য পরিগ্রহ না করিলেও তৎসমুদয় গ্রহণ করিতে অসম্মত হইবেন না। যথা:—

“অগ্নীশ্বর ব্যক্তিবিশেষের সমাদর করেন না; কিন্তু সমুদয় জাতির মধ্যে যে কেহ তাঁহাকে ভয় করেন এবং ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া চলেন, তিনিই তাঁহার প্রিয়।”

“যাঁহারা আমাকে ‘প্রভু’ বলিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই স্বর্গে যাইবেন না। কিন্তু যাঁহারা আমার স্বর্গীয় পিতার ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিবেন, তাঁহারাও স্বর্গে যাইবেন”।

উক্ত রূপ প্রমাণ যদি পর্য্যাপ্ত বলিয়া বোধ না হয়, তাহাহইলে একটী সাদৃশ্য লইয়া দেখা যাউক। এই সাদৃশ্য ঈশ্বরে প্রযুক্ত হইয়া অনেক স্থলে আমাদের নন্দেহ ভঞ্জে সহায়তা করিয়াছে। মনে করুন, ঈশ্বর পিতা, ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহার সন্তান।

পুত্র প্রথমে পিতাকে নাম ধরিয়া ডাকিতে ইচ্ছা করিয়া যদি কোন অপরিচিত ও অস্পষ্ট নামে ডাকে, তাহা হইলে পিতা কি তাহাতে কিছু মনে করেন ? আমাদের লক্ষ্য করিয়া যে, অস্পষ্ট বাল-ভাবিত উচ্চারিত হয়, আমরা কি তাহা আত্মাদের সহিত গ্রহণ করি না ? ইহা

অপেক্ষা অধিকতর স্মৃতিষ্ট, অধিকতর ক্রান্তিসুখাবহ আর কোন্ নাম আছে?

অধিকন্তু একটা শিশু যদি আমাদেরকে এক নাম ও আর একটা শিশু যদি আর এক নামে ডাকে, তাহা হইলে আমরা কি তাহাদের নিন্দা করি? এক নামেই ডাকিতে হইবে বলিয়া কি আমরা জিদ করিয়া থাকি? আমরা কি ইচ্ছা করি না যে, বালকেরা তাহাদের আপনাদের বাল-স্মৃতি ভাবে আমাদেরকে ডাকুক?

নাম সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত। এখন চিন্তার সম্বন্ধে কতদূর, দেখা যাউক। বালকেরা যখন চিন্তা করিতে আরম্ভ করে এবং যখন মাতা পিতার সম্বন্ধে আপন আপন ধারণা সংগঠিত করিতে থাকে, তখন তাহাদের কমনীয় হৃদয়ে যদি এমন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, তাহাদের জনকজননী সকলই করিতে পারেন, সমস্তই দিতে পারেন, এমন কি আকাশেব নক্ষত্র পর্য্যন্ত ধরিয়া দিতে সমর্থ হন, তাহা বা কোন অপরাধ করিলেও তাহা ক্ষমা করেন, তাহা হইলে পিতা কি বালকের এই সকল কল্পনায় মনোযোগ দেন? তিনি কি নিয়তই তাহার ভ্রম সংশোধন করিতে থাকেন? সম্ভব পিতাকে যদি কঠোর-প্রকৃতি বলিয়া মনে করে, পিতা কি তাহাতে ক্রুদ্ধ হন? মাতাকে যদি অধিকতর দয়াবতী, অধিকতর প্রগল্ভ এমনি শিশু বলিয়া ভাবে, মাতা কি তাহাতে অসন্তুষ্ট হন? শিশু সম্ভব জনকজননীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারে না, তাহাদের নিজের অভিপ্রায়ও হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু যত দিন তাহারা আপন আপন বিচিত্র বাল্যভাবে বিভোর হইয়া তাঁহাদিগকে অসঙ্কুচিতচিত্তে বিশ্বাস করে এবং তাঁহাদিগকে আন্তরিক ভালবাসে, তত দিন আমরা সেই সরল বিশ্বাস ও সেই অকৃত্রিম ভালবাসা অপেক্ষা তাহাদের নিকট আর কি অধিক চাহিতে পারি?

এখন পূজা-পদ্ধতির সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত হইতেছে। কোন কোন পূজায় বৃষ বধ করা হইত। “অনন্তের তৃপ্তি সাধন জন্য বৃষবধ করা উচিত” এই অপ্রিয় মতে আমরা কখনও আস্থা দেখাইতে পারি না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কোন্ মাতাই বা তাহার পুত্রের মুখ-বিনিঃসৃত ও পুত্রের অপবিত্র হস্ত-প্রদত্ত খাদ্য সামগ্রী গ্রহণে অসম্মত হইতে পারেন? তিনি যদিও উহা



মা খাইতে পারেন, তথাপি তিনি কি এমন ইচ্ছা করেন না যে, পুত্র জাম্বুক, তিনি উহা খাইয়াছেন এবং খাইয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন? যত দিন শিশুর বিবৃদ্ধ ও সরলান্তঃকরণ হইতে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে এই সমস্ত অকপট ভাব সমুখিত হইবে, তত দিন আমরা তাহাদের ভ্রমকে অপরাধ বলিয়া মনে করিব না। শিশুরা যে সকল কথা ভালরূপে বুঝে না, তাহারও উল্লেখ করে, তাহার অর্থ পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হয় না, তাহাও বলিয়া থাকে, না বুঝিয়া অপরের প্রতি নির্দয় ভাবেও কথা বলে।

এই সমস্ত কেবল সাদৃশ্য মাত্র। ঈশ্বর ও আমাদের মধ্যে এত অন্তর যে, পিতা পুত্রের মধ্যগত অন্তরকে মাপ করিয়াও এ অন্তর মাণিয়া উঠা যায় না। আমরা এ বিষয় অধিক ক্ষণ ভাবিতে পারি না বটে, কিন্তু কিছু ক্ষণ ভাবিবার পরই বোধ হয় যে, আমরা স্বর্গীয়ের সহিত আমাদের যেরূপ যুদ্ধভাবিতেছি এবং পরজীবনে আমরা যেরূপ আশা করিতেছি, সেরূপ সম্বন্ধ ও সেরূপ আশা যেন আর নাই। আমাদের বাল্য-প্রকৃতি, আমাদের মানবীয় জ্ঞান, আমাদের ঈশ্বরের প্রতিকৃতি-পূজাবিষয়িনী চিন্তা, সমস্তই যেন অন্তর্দ্বন্দ্ব করিয়াছে।

আমাদের জানা উচিত যে, মানব-প্রকৃতি স্বর্গীয়ের প্রতিবিম্ব গ্রহণে এক খানি অতি অল্পযুক্ত দর্পণ মাত্র। কিন্তু এই অপরিষ্কৃত দর্পণ না ভাঙিয়া বরং উহাকে যথোচিত উজ্জ্বল করিয়া রাখিতে, আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা পাওয়া আবশ্যিক। এই দর্পণ অযোগ্য ও অস্বচ্ছ হইলেও আমাদের নিকটে উহাই সুরোগ্য ও স্বচ্ছ। ক্ষণ কালের জন্য উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলেও আমরা ভ্রমে নিপতিত হইতে পারি না।

যত ক্ষণ সাদৃশ্য ও সম্ভাবনার কথা কহা যায়, তত ক্ষণ আমাদের মনে রাখা উচিত যে, অদৃষ্ট ও অজ্ঞাতের সহিত যে সমস্ত সাদৃশ্য কল্পনা করা যায়, মানব-প্রকৃতির দৌর্ভাগ্য ও দৃষ্টি-ক্ষীণতা সত্ত্বেও তাহাই সম্ভাবিত ও সম্পূর্ণ বোধ-গম্য হইতে পারে। প্রাচীন ব্রাহ্মণেরা বিশ্বাস করিতেন তাঁহারা ভবিষ্যতের ঘটনাবলি যেরূপ সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ বলিয়া কল্পনা করিবেন, উহা কার্য্যতঃ সেইরূপ সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ হইবে। তাঁহারা মনে করিতেন তাঁহাদের সমস্ত আশা ভরসা ইহ জগতে বদ্ধ, তাঁহারা জগৎসমুদ্র বস্তই প্রাপ্ত

হইবেন, যাঁহারা তাঁহাদের অন্তঃকরণকে উচ্চকল্পনা ও উচ্চ আশায় নিয়োজিত করিতে পারিবেন, তাঁহারা ই আপনাদের জন্য শ্রেষ্ঠতর জগৎ নির্মাণে সমর্থ হইবেন।

যদি আমরা এমন মনে না করি যে, অজ্ঞাত ও অদৃশ্যের সহিত যে সমস্ত সাদৃশ্য কল্পিত হইয়াছে বা পরলোকের সম্বন্ধে যেরূপ আশা করা গিয়াছে, তৎসমুদয় ঠিক সেইরূপ সম্পূর্ণ হইবে না, তাহাহইলে কোন্ যুক্তিবলে আমরা বিশ্বাস করিব যে, দুর্বল মন যেরূপ ইচ্ছা করিতেছে, তাহা অপেক্ষাও পরিণাম মন্দ হইবে? যাহা কিছু আছে, তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট হইবে, এরূপ বিশ্বাসকেই প্রকৃত বিশ্বাস বলা যায়। অনেক স্থলে ও অনেক ধর্ম্মে ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু বোধ হয় প্রাচীন এবং নূতন ষ্টেটমেন্ট্ ভিন্ন অন্য কোথাও এই বিশ্বাস অধিকতর সরল ভাবে ও অধিকতর দৃঢ়রূপে পরিবাক্ত হয় নাই। যথা:—

“হে ঈশ্বর! জগতের আদি হইতে এপর্যন্ত যাঁহারা আপনার উপাসনা করিতেছেন, তাঁহারা আপনি ব্যতীত আর কোনও বিষয় শ্রবণ করেন না, বা কিছুই দর্শন করেন না।”

“ঈশ্বর তাঁহার প্রেমিকদের জন্য যাহা সৃজন করিয়াছেন, মানবেরা চক্ষে তাহা কখন দেখে নাই, কর্ণে কখন তাহা শুনে নাই এবং হৃদয়ে কখনও অনুভব করে নাই।”

আমরা যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারি। মানুষ মানুষের ধারণা করিতেই সক্ষম, তদপেক্ষা আর উচ্চতর ধারণা করিতে পারেন না। ইহা ছাড়া তিনি আর এক পদ যাইতে পারেন এবং বলিতে পারেন যে, পরে যাহা আছে, তাহা ভিন্নরূপ হইতে পারে, কিন্তু বর্তমান হইতে কম অসম্পূর্ণ হইতে পারে না। ভবিষ্যৎ অতীত অপেক্ষা মন্দ হইতে পারে না। বর্তমান যে মন্দ, ইহা মানুষ বিশ্বাস করিয়া থাকেন, কিন্তু ভবিষ্যৎ যে মন্দ হইবে, ইহা তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে দেখা যায় না। যে পরিণামবাদ নিন্দিত হইয়া থাকে, তাহা যদি আমাদের কিছু শিখাইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা তাহা হইতে ইহাই শিখিয়াছি যে, ভবিষ্যৎ অবশ্যই অপেক্ষাকৃত উত্তম হইবে এবং মানুষ উন্নতির উচ্চতর সোপানে ক্রমে আরোহণ করিবে।

ঐশ্বর যদি আমাদেরকে আত্ম-পরিচয় দিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহাকে মানবাকারে আবির্ভূত হইতে হইত। ঐশ্বর হইতে মানবের দূরত্ব যত অধিকই হউক না কেন, জগতে মনুষ্য হইতে আর কেহই ঐশ্বরের অধিক নিকটবর্তী নহে। মামুষ যেমন শৈশব হইতে বার্কিকো উপনীত হইতে থাকে, স্বর্গীয়ের সম্বন্ধে ধারণাও সেইরূপ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে শৈশবের দোলা হইতে বার্কিকোর চিতা পর্য্যন্তও এক আশ্রম হইতে অন্য আশ্রম পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যে ধর্ম্ম আমাদের ন্যায় বর্দ্ধনশীল নহে, আমাদের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যাহার জীবনীশক্তি পরিস্ফুট হয় না, তাহা মৃত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। নির্দ্ধারিত ও অপরিবর্তনশীল একীভাবকে জীবনের লক্ষণ না বলিয়া মৃত্যুর লক্ষণই বলা গিয়া থাকে। যে ধর্ম্ম জ্ঞানী হউক, অজ্ঞানী হউক, যুবা কি বৃদ্ধ হউক, সকলেরই একমাত্র বন্ধন-স্বরূপ হইবে, সে ধর্ম্ম সাধারণের অধিগম্য উচ্চ, গভীর, প্রশস্ত, সর্ব বিশ্বাস, সর্ব আশা ও সর্ব সীমিতাময় হওয়া চাই। যতই ইহা বৃদ্ধি পাইবে, ততই ইহার অন্তঃ-শক্তি প্রবল হইবে। এই প্রবলতা যত বৃদ্ধি পাইবে, ততই উহার সংস্পর্শ মধুর হইতে থাকিবে।

এ কথার দৃষ্টান্ত স্থল খ্রিস্টীয় ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের প্রথম অবস্থাতে যে উচ্চতর মত বিকাশ পাইয়াছিল, তাহা ইহুদী সূত্রধরগণ, রোমক জনসাধারণ ও গ্রীক দার্শনিকগণ গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। এই ধর্ম্ম পৃথিবীর উৎকৃষ্ট প্রদেশ সমুদয় অধিকার করিয়াছে। এই ধর্ম্মের মত যদি প্রথম হইতেই সঙ্কীর্ণ করিবার চেষ্টা না করা হইত, যদি বিশ্বাস ও প্রেমের স্বলে সঙ্কীর্ণ মত প্রবেশ না করিত, তাহা হইলে ধর্ম্মাহুরক্ত ব্যক্তিগণ খ্রিস্টীয় ধর্ম্ম-সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিতেন না এবং তাহা হইলে এই বিশ্বময় প্রেম ও জগৎময় দয়্য-যুক্ত ধর্ম্ম উদ্দেশ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িত না।



## পূর্ব বিষয়ের আলোচনা ।

যে পথে আমাদের সপ্ত সিদ্ধুর তট-নিবাসী আৰ্য্য পিতৃপুরুষেরা অনন্ত, অদৃশ্য ও স্বর্গীয়ের অন্বেষণে কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই পথে তাঁহাদের সহিত আমরাও একবার বেড়াইয়া আসিয়াছি। আর একবার তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করা বাউক ।

হিন্দু আৰ্য্যগণ প্রথমেই জড়োপাসনায় প্রবৃত্ত হন নাই । আমরা যেখানে জড়োপাসনার আশা করি, সেইখানেই দেখিতে পাই যে, জড়োপাসনা আরও পরে আরম্ভ হইয়াছে। ভারতের আদিম ধর্মভাবোৎপত্তিতে ইহার চিহ্ন মাত্রও দৃষ্ট হয় না । ফলতঃ বেক্রপ পাটলবর্ণ প্রস্তরের মধ্যে দ্বিতীয় যুগের স্তরনিহিত চূর্ণোপল স্থান পায় না, জড়োপাসনাও সেই রূপ উহাতে স্থান পায় নাই ।

আদিম প্রকটীকরণ বলিলে যাহা বুঝায়, আমরা তাঁহাদের কোন ধর্ম-গ্রন্থে তাহার চিহ্ন মাত্রও দর্শন করি নাই । সকলই স্বাভাবিক ও বোধ-গম্য এবং ঐ ভাবে দেখিতে গেলে প্রকৃতই ঈশ্বর-প্রচারিত । বুদ্ধি ও যুক্তি হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া, কেবল ধর্ম-বুদ্ধি দ্বারা এই বিষয় স্থির করার প্রয়োজন দেখা যায় না । তাহা করিলেও আমাদের যে সকল প্রতিপক্ষ অন্যত্র আমাদের কথায় নায় দেন, তাঁহারা তাহার অনুমোদন করিবেন না । ধর্ম-বুদ্ধি দ্বারা প্রকৃত ধর্মের ব্যাখ্যা করা, আর অজ্ঞাতকে অল্পজ্ঞাত বিষয় দ্বারা প্রকাশ করা সমান কথা । প্রকৃত ধর্মসম্বন্ধীয় সংস্কার অনন্তের অনুভূতি ব্যতীত আর কিছুই নহে ।

সুতরাং প্রাচীন আৰ্য্যগণের নিকট আমরা অধিক কিছু দাবি করি নাই । আমাদের দাবি আমাদের নিজের কাছে । আমাদের বুদ্ধি, আমাদের যুক্তি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দ্বারা আমাদের অবধারণ করিবার ক্ষমতা প্রভৃতি যাহা আমরা পাইয়াছি, কোন শত্রু তাহা লইয়া কলহ করিতে পারে না । ইহা ব্যতীত মানবের আর কি আছে ? আরও কিছু আছে, একরূপ কল্পনা করিয়া মানবের কোনও লাভ নাই ।

আমরা দেখিয়াছি, যখন আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ কোন সীমাবিশিষ্ট পদার্থের জ্ঞান আমাদের নিকট আনিয়া দেয়, তখন অসম্পূর্ণ সীমাবিশিষ্ট

অর্থাৎ সীমায়ুক্ত হইলেও এখনও যেন উহাতে অভাব আছে, এমন একটা ধারণা আনিয়া উপস্থিত করে। অনন্তের মধ্যে অন্তবানের, অদৃশ্যের মধ্যে দৃশ্যের, অনৈসর্গিকের মধ্যে নৈসর্গিকের ও বিশ্বের মধ্যে প্রত্যক্ষ-লোকের সুপ্রচারই উহাৰ প্রধান উদ্দেশ্য।

অসীমের সহিত ইন্দ্রিয়ের এত স্থায়ী সম্বন্ধই ধর্ম-সম্বন্ধীয় প্রথম উদ্ভে-  
জন্য উৎপত্তি করে। ইহাকেই ভাষায় বোধের ও জ্ঞানের অতীত  
“কিছু” বলা গিয়া থাকে।

এই খানেই ধর্মের প্রকৃত মূল স্থাপিত হইয়াছে। জড়বাদের  
গৌণবাদের, প্রাণবাদের, সাকারবাদের, নকলের পূর্বে উহাৰই ব্যাখ্যা  
করা প্রয়োজনীয়। মানব কি জন্য ইন্দ্রিয়-গোচর সীমায়ুক্ত পদার্থের  
জ্ঞানেই সম্বন্ধে নহে এবং কেনইবা তাঁহার মনে এই ধারণার আবির্ভাব  
হয় যে, স্পর্শ, শ্রবণ, দর্শন প্রভৃতির অগ্রাহ্য—বাহ্যকে শক্তি, আত্মা বা ঈশ্বর  
কহা যায়, অগতঃ এমন কিছু আছে অথবা থাকিতে পারে।

বৈদিক সাহিত্য-সৌন্দর্য ভগ্নাবশেষ খনন করিতে করিতে যখন আমরা ঐ  
দৃঢ় পাষণ-সমীপে উপনীত হইয়াছি, তখন ঐ পাষণোপরি গঠিত প্রাচীন  
স্তম্ভ এবং আধুনিক সময়ের ধর্ম-মন্দিরবৎ খিলান ও ভগ্নাবশেষ প্রভৃতি  
আবিষ্কার করিবার জন্য আরও খনন করিয়াছি। অন্তবানের বাহিরে অবশ্য  
কিছু আছে, মানব-মনে একবার এইরূপ ধারণার সূত্রপাত হইলে হিন্দুগণ  
কিপ্রকার প্রকৃতির সর্লদেশই—প্রথমে অর্ক্স্পৃশ্য, পরে অস্পৃশ্য অবশেষে  
সম্পূর্ণ অদৃশ্য পদার্থে উহা খুঁজিয়া বেড়াইয়াছেন এবং উহাকে আয়ত্ত ও  
উহাৰ নাগকরণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা আমরা দেখাইয়াছি।

যখন অর্ক্স্পৃশ্য পদার্থের সম্বন্ধে মানব বুঝিতে পারিয়াছেন যে, উহা  
তাঁহার ইন্দ্রিয়ের আংশিক আয়ত্তের মধ্যে, তখনও উহা ছিল।

আবার অস্পৃশ্য পদার্থের বিষয়ে যখন তাঁহার ইন্দ্রিয়জ্ঞান জানাইল যে,  
উহা অনায়ত্ত বা কদাচিৎ অস্বত্বাধীন, তখনও উহা ছিল।

এইরূপে অস্পৃশ্য, অর্ক্স্পৃশ্য ও অদৃশ্য পদার্থ-পূর্ণ এক নূতন জগৎ সৃষ্ট  
হইল। মনুষ্যের কার্যক্ষমতার অমূরূপ উহাদের কার্যক্ষমতা ও তদনুযায়ি  
নামাদিও কল্পিত হইল।

এই সকল নামের যে ছুই একটী অদৃশ্য পদার্থের প্রতি আরোপিত হইয়াছিল তাহা ক্রমে সাধারণ সংজ্ঞা হইয়া দাঁড়াইল। যথা ;—অমর (জীবিত বস্তু), দেব (উজ্জল বস্তু), দেবাসুর (জীবিত দেবগণ)\* অনর্ন্ত্য (অমরগণ)। গ্রীক, রোমক প্রভৃতি দেবগণেরও এইরূপ সংজ্ঞা দেখা যায়।

ইহার পর দেখান হইয়াছে যে, ধর্মবিষয়ক সূক্ষ্মতর ধারণাগুলি অপরাপর ধারণার ন্যায় ইন্দ্রিয়-জ্ঞান-সুলভ অনুভূতি হইতে উদ্ভূত। নীতি, ধর্ম, অসীমত্ব ও অমরত্ব প্রভৃতি ভাবগুলিও এইরূপে উৎপাদিত হইয়াছে।

এইখানে দেখা যায়, মানবের মনে কেনন করিয়া সর্বপ্রথমে “মৃত্যু” “শ্রদ্ধা” ও “ঐশোন্মেষ” প্রভৃতির ধারণা হয় এবং কেননে সেই ধারণা ক্রমে পকিষ্ঠ হইয়া থাকে। এ বিষয়ে আর কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিতে পারিলে ভাল হইত।

বিরোধী মত যাহাই হউক না কেন, মৃত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে যে চিন্তা ও অনুভূতির আবির্ভাব হয়, তৎসমুদয়ের মূলে ভারতবর্ষেও আদিম ধর্ম-তত্ত্বের উপকরণ পাওয়া গিয়া থাকে। মৃত্যু যাহাদিগকে আমাদের হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, পরলোকে তাহাদের সহিত আমাদের সম্মিলন হইবে, এই বিশ্বাস ধর্মের অবলম্বনরূপ হয়। আমাদের ন্যায় আমাদের পূর্বপুরুষ-গণেরও পরলোকসম্বন্ধে এইরূপ আশা ও কল্পনা ছিল।

শেষে বুঝান গিয়াছে যে, কেনন করিয়া ইষ্টেশ্বরবাদ, অনেকেশ্বরবাদ ক্রমে পরিবর্তিত হইয়া একেশ্বরবাদে গিয়া উপনীত হইয়াছে।

ইহার পর প্রদর্শিত হইয়াছে যে, প্রাচীন দেবতাবা কেবল কতকগুলি কল্পিত নাম বৈ আর কিছুই নহে। একপ আবিষ্কার যদিও কোন কোন স্থলে নাস্তিকতা বা একপ্রকার বৌদ্ধভাব বুঝায়, তথাপি অনেকের পক্ষে ইহা এক নূতন বিষয় উপস্থিত করিয়াছে এবং একমাত্র অদ্বিতীয়ে বিশ্বাস আনিয়া দিয়াছে। এই একমাত্র অদ্বিতীয় যে, কেবল, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সীমা-বদ্ধ পদার্থের অতীত, তাহা নহে। ইহা আমাদের নীমা-বিশিষ্ট অহং-এর অতীত, পরমাত্মা।

এইখানে ভারতীয় ধর্ম-ভিত্তি ও পূজা বলি প্রভৃতির মূল সম্বন্ধে একপ্রকার তৃপ্ত হইয়া আমরা এতদ্বিষয়ক গবেষণায় ক্রান্ত হইয়াছি।

এস্থলে সকলকেই বলা যাইতেছে, ভারতীয় ধর্ম যেরূপে গঠিত হইয়াছিল, পৃথিবীর সকল ধর্মই ঠিক ঐ ভাবে গঠিত হইয়াছে, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। উপসংহারে এবিষয়ে আরও দুই একটি কথা বলিতেছি।

যেখানে ধর্ম, শ্রদ্ধা ও পূজা আছে, সেই খানেই কোন কোন বিষয়ে একতাব দৃষ্ট হইবে, কেন না সকল মানবের হৃদয় এক প্রকার।

আপাততঃ আমাদের একথার অতিরিক্ত কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।

আমি আশা করি, এমন একদিন আসিবে, যে দিনে আমরা মানবজাতির ধর্মের নিভৃততম প্রদেশে যাইতে পারিব। আমি আজ যে বিষয়ের সূত্রপাত করিয়াছি, আশা করি ভবিষ্যতে আমা অপেক্ষা ভাল লোকে সে বিষয় সবিস্তর বিবৃত করিবেন। আর ধর্ম-বিজ্ঞানের এখন কেবল যে আশা ও যে বীজ মাত্র আছে, সুসময়ে সেই আশা সুসিদ্ধ ও সেই বীজ হইতে প্রচুর শস্য হইবে।

যখন সেই শস্য-সংগ্রহের সময় উপস্থিত হইবে, যখন সর্বজগতের ধর্মের ভিত্তি মুক্ত ও উদ্ধৃত হইবে, কে জানে যে, আর এক বার নানা ধর্মবাদিগণ তাঁহাদের যাগ, যজ্ঞ, পূজা, বলি প্রভৃতি হইতে উৎকৃষ্টতর, পবিত্রতর, প্রাচীনতর ও যপার্থতর বিষয় পাইবার আশায় ভূগর্ভস্থ শবরক্ষণ-স্থানের ম্যায় বা প্রাচীন ধর্মমন্দিরের নিম্নদেশ-স্থিত লুক্কায়িত প্রদেশের ন্যায় সেই ভিত্তিতে আশ্রয় চাহিবেন না। যাহারা বাল্য-ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহাদিগকে বংশাবলি, অলৌকিক বিষয়, দেবমায়া প্রভৃতি বলিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাঁর এখনও আপনাদের মন হইতে বালক-সুলভ বিশ্বাস দূর করিতে পারেন নাই।

হিন্দু দেব-মন্দিরে, বৌদ্ধ বিহারে, মুসলমানের মসজিদে, ইহুদীর পূজা-গৃহ ও খ্রীষ্টীয় গির্জায় বাহা প্রচারিত বা পূজিত হয়, তাহা অনেক দূরে ফেলিয়া আসিলেও শ্রদ্ধাবান্ মাঝেই উল্লিখিত নিতক শাস্তিপূর্ণ স্থানের মধ্যে তাঁহার জীবনের এক অমূল্য নিধি—যাহা তিনি সর্বাপেক্ষা ভাল বাসেন—লইয়া অবতরণ করিবেন।



হিন্দুগণের ইহলোকে অবিখ্যাস, ও পরোলোকে অসংদিগ্ধ বিখ্যাস;  
বৌদ্ধের নিত্য নিয়মের সম্বন্ধে অমুভূতি, তৎবশবর্ত্তিতা এবং দয়া ও  
শীলতা;

মুসলমানের আর কিছু না থাকিলেও শাস্ত্যভাব;  
ইহুদীর মন্দ ও ভাল দিনের মধ্যে, যিনি ন্যায়-প্রিয়, যাঁহার নাম  
“অহম্” (আমি), এমন ঈশ্বরে আসক্তি;

খ্রিষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীর যাহা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, তাহাতে আস্থা। এবিষয়ে যাঁহার  
সন্দেহ আছে, তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন, তাঁহাদের ঈশ্বর-প্রেম  
কেমন সুন্দর, যাঁহার যাঁচা ইচ্ছা তাহাই বলিয়া তাঁহারা ডাক, অসীম বল,  
অদৃশ্য বল, অমর বা পিতা বল, শ্রেষ্ঠ আত্মা বা সকলের বাহিরে, সকলের  
মধ্যে, যাহা ইচ্ছা, তাহাই বল। তাহাদের দয়া ও প্রেম মানবে, জীবে ও  
মৃত ব্যক্তিতে সুপ্রকাশিত। এ প্রেম জীবন্ত ও অবিনশ্বর।

কিন্তু সেই শাস্তি-পূর্ণ ভূগর্ভ-নিহিত লুক্কায়িত স্থান যাহা আজিও ক্ষুদ্র-  
অন্ধকারময়, যেখানে অতি অল্প সংখ্যক মাত্র নানা লোকের কোলাহল-  
বিদ্রোহী, নানা আলোক-বিদ্রোহী এবং নানা মত-বিদ্রোহী ব্যক্তি গমন করেন, কে  
জানে সময়ে সেই স্থান সুপ্রশস্ত ও আলোক-সমুজ্জল হইবে না এবং অতীত  
কালের ঐ নিভৃত নিবাস ভবিষ্যতের দেব-মন্দির হইবে না।

সম্পূর্ণ।



## সংবাদপত্র-সম্পাদক ও অন্যান্য প্রধান ব্যক্তির অভিপ্রায় ।

মালাবারির নিকট বোম্বাইর গবর্ণরের ১৮৮২ অব্দের ২৩এ অক্টোবর তারিখের পত্র (গবর্ণরের সদয় অনুজ্ঞা অনুসারে উদ্ধৃত)—

“আপনি যে মহৎকার্যের ভাব গ্রহণ করিয়াছেন, গবর্ণর তাহার আবশ্য-  
কতা ও উৎকর্ষ বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতেছেন, এবং সর্বাস্তঃকরণে আশা  
করিতেছেন, আপনি ইহাতে কৃতকার্য হইবেন ।”

শিক্ষা সমিতির অধ্যক্ষ অনারেবল হন্টর সাহেব ৩১এ অক্টোবর বোম্বাই-  
ইর কনবোকেশন-হলে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে মালাবারির উপস্থিত  
কার্যের সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন—

এখন বোম্বাইতে আধুনিক সাহিত্যের উৎপত্তি হইতেছে । আপনাদের  
একজন নগরবাসী ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার সাহিত্যের পরিপুষ্টির জন্য বঙ্গদেশ ভ্রমণ  
করিয়াছেন দেখিয়া, আমি বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি । অন্ত্যস্ত কথার  
মধ্যে তিনি আমাকে বলিয়াছেন যে, তিনি অধ্যাপক মোক্ষমূলরের গ্রন্থ  
পশ্চিম ভারতবর্ষের ভাষায় অনুবাদ করিতেছেন । আমার বিশ্বাস, তিন  
এই কার্য সম্পাদনের সম্পূর্ণ যোগ্যপাত্র । বর্তমান সময়ে এই দেশে জ্ঞানের  
অভাব পূরণে ইহা অপেক্ষা যে, যোগ্যতর কাজ নাই, তাহাতেও আমার  
বিশ্বাস আছে । বোম্বাই নগরে উপস্থিত হইয়া, যখন আমি এই বিষয়ের  
সম্বন্ধে অনুসন্ধান করি, তখন জানিতে পাবিলাম, অনুবাদকের কোন দোষে  
নয়, কেবল উপযুক্ত অর্থের অভাবে উপস্থিত কার্য সুসম্পন্ন হইতেছে না ।  
সাহিত্য আত্মপোষণ-ক্ষম হওয়া উচিত, এবিষয়ে ঠাহাদের বিশ্বাস আছে,  
আমি তাঁহাদের মধ্যে একজন । কিন্তু ঠাহারা বিশ্বাস করেন, ভারতবর্ষে এখন  
পর্যাপ্ত সাহিত্যের আত্মপোষণ-ক্ষম হওয়ার সময় উপস্থিত হয় নাই, আমি  
তাঁহাদেরও শ্রেণীভুক্ত । যখন আমি এখানে দেখিতেছি যে, পর-প্রদত্ত অর্থ  
দৃঢ়তর ও শিক্ষার উৎকর্ষের পরিচায়ক চিহ্ন স্ফুটল নিম্নিত হইয়াছে,

তখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রস্তুত এবং পিতৃল অপেক্ষাও অধিকতর স্থায়ী সাহিত্য-সংক্রান্ত মহৎ-কার্য সম্পাদনে এইরূপ অর্থের অভাব হইবে না।

ইহার পর অহমদাবাদে আর একটি প্রকাশ্য বক্তৃতায় ডাক্তার হণ্টর সাহেব এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন—

আমি ইচ্ছা করি, সভা মালাবারিকৃত মোক্ষমূলরের হিবার্ট বক্তৃতার উৎকৃষ্ট অনুবাদের প্রতি মমোযোগ দিবেন। একজন পণ্ডিত এইরূপ একটি অত্যাৱশ্যক কার্য সম্পাদন করিতেছেন। আমি আশা করি, তিনি গুজরাটী এবং অন্যান্য দেশীয় সভা হইতে সাহায্য পাইবেন।

“ডাক্তার হণ্টর সাহেবকে বোম্বাইএতে যে সকল অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়, তৎসমুদয়ের উত্তরস্থলে হণ্টর সাহেব বিখ্যাত পারসী গ্রন্থকার বি, এম, মালাবারি সাহিত্যজগতে যে একটি অত্যাৱশ্যক কার্য আরম্ভ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ করেন \* \* \* ডাক্তার হণ্টর যথার্থই বিবেচনা করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে আজ পর্যন্ত উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্যের আত্মপোষণ-ক্ষম হওয়ার সময় উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং মালাবারির প্রশংসনীয় কার্যে যে, অর্থকৃচ্ছ উপস্থিত হইবে, তাহা আশ্চর্যের নহে \* \* \* সুতরাং মালাবারিকে কৃতাৰ্থ্য করিতে হইলে যথোচিত সাহায্য করা আবশ্যক হইতেছে। আমাদের যে সকল পাঠক মালাবারির কার্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করেন, আমরা তাঁহাদিগকে জানাইতেছি যে, মালাবারি তাঁহাদের সাহায্যপ্রার্থী হইতেছেন’।—ষ্টেটসম্যান।

হিন্দু পেট্রিয়ট হণ্টর সাহেবের মন্তব্য উল্লেখ করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন :—

বেশ বলা হইয়াছে। অর্থাভাবে মালাবারির মহৎ সঙ্কল্প বিফল হইলে তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জাকর হইবে।

পারী নগরীর অধ্যাপক ডারমেণ্টের ১৮৮৩ অব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি

রিবিউক্রিটিক নামক সংবাদ পত্রে এক প্রবন্ধ লিখেন। নিয়ে তাহার কিয়-  
দংশের প্রকৃত অনুবাদ দেওয়া গেল :—

মালাবারির উদ্ভাবনা সাহিত্যবিষয়েই আছে। তিনি তাঁহার স্বদেশীয়-  
দিগের মধ্যে সভ্যতা ও আধুনিক ভাবসকলের ব্যাখ্যা-কারক হইতে  
ইচ্ছা করিয়াছেন এবং প্রথম হইতেই গদ্য পদ্য লিখন, অনুবাদ, ইংরাজী  
ও গুজরাটী সংবাদপত্র প্রভৃতি নানারূপে এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।  
তাঁহার প্রাথমিক কবিতা-সমূহ দশ বৎসর বয়সে লিখিত হয়, এখন তাঁহার  
বয়স আটাইশ বৎসর। প্রায় দুই বৎসর গত হইল, তিনি ইণ্ডিয়ান স্পেক্টে-  
টর নামক এক খানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রচার করিতেছেন। এই  
পত্রিকা শীঘ্রই দেশীয় সংবাদপত্র সমূহের মধ্যে সর্বপ্রধান স্থান অধিকার  
করিয়াছে। যদিও ইহাতে সাপ্তাহিক সংবাদ অপেক্ষা তৎসমুদয়ের উপর  
সমালোচনাই অধিক পরিমাণে থাকে, তথাপি এই পত্রিকায় যে ইউ-  
রোপীয় পাঠকদিগের কিছু পড়িবার নাই, এমন নহে। ইহার ভাষা  
বিশুদ্ধ এবং ইহা ওজস্বিতা প্রভৃতির জন্য বিখ্যাত। মালাবারি একজন  
কবি। ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্র সকল যে, তাঁহাকে কেবল প্রধান পার-  
সিক কবি বলেন, এরূপ নয়, তাঁহারা তাঁহাকে বর্তমান সময়ের সর্ব  
প্রধান গুজরাটী কবি বলিয়াও স্থির করিয়াছেন। মালাবারি ইংরাজি ও গুজ-  
রাটী এই উভয় ভাষাতেই কবিতা লিখিতে অভ্যাস করিয়াছেন।

গত দুই বৎসর হইতে মালাবারি যে কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতে  
তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস ও সাহস আবশ্যক করে। এই কার্যে তাঁহার কৃত-  
কার্য্য হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। যে সকল বিষয়ের সঙ্কলনে  
ইউরোপীয়েরা এখন ভারতবর্ষের ধর্মভাব সকল জানিতেছেন, মালাবারি  
প্রচলিত ভাষায় তৎসমুদয়ের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি মোক্ষমূলরের  
ভারতবর্ষীয় ধর্ম-সম্বন্ধীয় হিবার্ট বক্তৃতা সমূহ নওরজি এন্, মোবেদজিনের  
সাহায্যে গুজরাটী ভাষায় অনুবাদ করিয়া এই মহৎকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।  
সংস্কৃত, মহারাষ্ট্রীয়, হিন্দি, তামিল ও বঙ্গভাষায় অনুবাদ পরে প্রকাশিত  
হইবে। মালাবারির এই কার্য্য যেন তাঁহার সমস্ত বিষয়ের সমর্পণ। "যদি  
এই অনুবাদ সাংসারিক যন্ত্রণায় বিকৃত-চিত্ত কোন আর্ষ্য লাতাকে শান্তি দান

করে, যদি ইহা তাঁহার চিরপ্রসিদ্ধ পূর্ব পুরুষদিগের মহৎকার্য্য সমূহ স্মরণ করাইয়া দিতে পারে, যদি ইহাতে তিনি জীবাত্মার চিন্তা দ্বারা পরমাত্মায় মনঃ-সংযোগ করিতে পারেন, যদি ইহা দ্বারা পরমানন্দ এবং সৎ, অনাদি, অনন্ত অমর, পরমাত্মা হৃদয়ে ধারণ করিবার কোন উপায় প্রাপ্ত হন ; যিনি আৰ্য্য বিশ্বাস ও আৰ্য্য ভাষা, মানবীয় ইতিহাসের এই দুইটি প্রধান বিষয়ের ব্যাখ্যায় সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, সেই তুলনা-রহিত জন্মণ আৰ্য্য মুনি মোক্ষমূলরের অভিজ্ঞতাতে যদি তিনি কোন উপায়ে প্রবেশ করিতে পারেন, তবেই তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইবে।”

যাহাতে সৰ্ব্বসাধারণে এই মহৎ বিষয়ে আকৃষ্ট হয়, তজ্জন্য মালাবারি তাঁহার সংকল্প ও উদ্দেশ্য বুঝাইতে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার এই অবিশ্রান্ত উৎসাহের আশা-তীত ফললাভ হইয়াছে। ভারতবর্ষের সকল সংবাদ পত্রই তাঁহাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়াছেন। বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহাকে তাঁহাদের নাম ব্যবহার করিতে অধিকার দিয়াছেন। মহারাজী স্বর্ণময়ী তাঁহাকে ১,০০০ টাকা দান করিয়াছেন। গুজরাটী অনুবাদের অধিকাংশ খরচ বোম্বাই হইতে চাঁদা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, সকলেই মনোযোগের সহিত তাঁহাদের মত বাক্ত করিয়াছেন। ইহা অসম্ভব নয় যে, এই উদ্যম প্রচলিত ভাষা সমূহকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় পরিবর্তিত করিতে সাহায্য করিবে। এইরূপে প্রচলিত ভাষা সমূহ অপ্রচলিত সংস্কৃত ভাষার ও বিদেশীয় ইংরেজি ভাষার কার্য্য সকল নির্বাহ করিবে। আমরা এই সাহিত্য সম্বন্ধীয় আন্দোলনের নিকট মস্তক অবনত করিতেছি। ইহাতে আধুনিক ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় উন্নতির পক্ষে সুফল ফলিবে। যে তরুণ যুবক এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, আমরা এই দূরত্ব ফরাসীভূমি হইতে তাঁহার প্রতি সহানুভূতি দেখাইতেছি।—জেমস্ ডারমেণ্টের।

আমরা বোম্বাইর সংবাদপত্র সমূহ পাঠে জানিয়াছি যে, মালাবারির “হিবার্ট বক্তৃতার মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় অনুবাদ” কয়েক দিন হইল প্রকাশিত

হইয়াছে। ইহা বরদার গুইকুমারকে উৎসর্গ করা হইয়াছে। মালা-  
বারি গুইকুমারকে একখানি অতি সুন্দর উৎসর্গ-পত্র লিখিয়াছেন। বরদা  
রাজ্যের প্রজা এই পারসিক গ্রন্থকার তাঁহার কর্তব্য কার্য্য উত্তমরূপে  
সম্পাদন করিয়াছেন। আমবা আশা কবি, বরদার মহারাজ ইহার  
প্রশংসিত সঙ্কল কার্য্যে পরিণত কবিত্তে ইহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিবেন।—  
অমৃতবাজার পত্রিকা, কলিকাতা, ৩রা আগষ্ট, ১৮৮৩।

অধ্যাপক মোক্ষমূলরের হিবার্ট বক্তৃতা সমূহ যে, মালাবারি মহারাজীয়  
ভাষায় অনুবাদ কবিত্তা প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য আনরা আনন্দ প্রকাশ  
করিতেছি। বইখানি উত্তমরূপে ছাপান হইয়াছে এবং ইহাতে প্রসিদ্ধ  
সংস্কৃতভিজ্ঞ মোক্ষমূলরের প্রতিকৃতি দেওয়া হইয়াছে। বোধাই হাইকো-  
র্টের উকীল গোবিন্দ বাহুদেব কনিতকর বি, এ, এল, এল্ বি কর্তৃক  
অনুবাদ-কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। ইহা যে, ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান  
মহারাষ্ট্রীয় রাজা বরদার গুইকুমারকে উৎসর্গ করা হইয়াছে, তাহা উচিতই  
হইয়াছে।

আমবা সর্লান্তঃকরণে আশা কবি যে, বরদার রাজা মুক্তহস্তে মালা-  
বারির সঙ্কলিত বিষয়ে সাহায্য করিবেন। যুবক গুইকুমারের প্রতি,  
বিশেষতঃ তাহার শিক্ষা ও সাধুতাব অনুবাগ ও তাঁহার জাতীয় উন্নতির  
ইচ্ছাব উপর আনাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। তিনি যে, মালাবারি তাহা  
স্বদেশচিহ্নিত বাক্তিদিগের সাহিত্যসম্বন্ধীয় ও জাতীয় মহৎ সঙ্কল সাধনে  
যথেষ্ট উৎসাহ দিবেন, তাহাতে আমাদের অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। মালাবারি  
গুইকুমারের প্রজা বলিয়া তাঁহার উপর বিশেষ দাওয়া করিতে পারেন।—  
হিন্দু পেটিয়ট, কলিকাতা, ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩।

অধ্যাপক মোক্ষমূলরের জগৎবিখ্যাত ভারতবর্ষীয় ধর্মবিষয়ক হিবার্ট  
বক্তৃতা বেংবামজি এম্ মালাবারি কর্তৃক মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় অনুবাদিত  
হইয়াছে এবং তাহা অতি সুন্দর ভাষায় ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান মহারাষ্ট্রীয়



রাজা গুইকুমারের নাম উৎসর্গ করা হইয়াছে। মালাবারির বরদা রাজ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। স্বাভাবিক সৌজাত্যের বশবর্তী হইয়া তিনি এই শত্ৰু মহারাজ গুইকুমারকে প্রদান করিয়াছেন। দাতা এবং তাঁহার প্রদত্ত বস্তুটী বরদা রাজ্যের পক্ষে প্রকৃত গৌরবের বিষয়। আমরা ভরসা করি, মালাবারির সঙ্কলিত বিষয়টী কার্য্যে পরিণত করার জন্য তাঁহাকে বরদার রাজ-কোষ হইতে বিশেষরূপ সাহায্য করা হইবে।—ইণ্ডিয়ান মিরর, কলিকাতা, ৪ ঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩।

এই অবিশ্রান্ত ভ্রমণকারী মালাবারি পীড়া হইতে মুক্তি পাওয়া মাত্রই এবার বোম্বাই হইতে মধ্য ভারতবর্ষাভিমুখে গমন করিয়াছেন। কোন মাননীয় পত্র প্রেবক লিখিয়াছেন, “তিনি ইন্দোর, ধার এবং রাত্নামের মধ্যদিয়া যাত্রা করিয়াছেন। এই সমস্ত প্রদেশের রাজধানীতে তাঁহাকে রাজবাটীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে বিশেষরূপে অনুবোধ করা হয়, কিন্তু বোম্বাই নগরে ২০ এ তারিখের পূর্বে তাঁহাকে পৌঁছিতে হইবে বলিয়া, তিনি এইরূপ সম্মানপ্রদ নিমন্ত্রণ নকল গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন”। আমরা সর্বান্তঃকরণে আশা করি, উক্ত রাজগণ মালাবারির স্বদেশ-হিতৈষিতা ও উৎসাহেব যথেষ্ট পুরস্কার করিবেন। মালাবারি নে, অধ্যাপক মোক্ষমূলরের ব্যাখ্যা-কারক হইরাছেন, এটা মোক্ষমূলরের পক্ষে যথার্থই সৌভাগ্যের বিষয় হইয়াছে। বোম্বাইতে কি এমন কেহই নাই, যিনি মালাবারির কার্য্যভাব স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে অন্ততঃ ছয় মাসেব জন্ত একবারে অবসর দিতে পারেন? এইরূপ শীঘ্র শীঘ্র এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাওয়া অবশ্যই বহু ব্যয়-সাধ্য। অধিকন্তু জুন মাসে মধ্যভারতবর্ষ ভ্রমণ করা এই কথাটী মনে হইলেই, যাঁহাদের বাড়ীতে থাকা অভ্যাস, তাঁহারা ভীত হন। কিন্তু মালাবারির দৃঢ় শরীরে সকলই যেন সহ্য পায়। “অথ” স্বাক্ষরিত ঐ সকল পত্র পাঠ করিয়া সঙ্কলিত বিষয়ের প্রতি যে মহৎ আসক্তি হয়, তাহা অতি অল্প লোকেই বুঝিতে পারে। যদি ভারতবর্ষে মালাবারির ত্রায় আরও লোক থাকিত, তাহা হইলে যে কয়েক জন অল্পসংখ্যক লোকের হস্তে আমাদের দেশের গুরুতর সাহিত্য-

বিষয়ক ভার ন্যস্ত আছে, তাহা অনেক পরিমাণে লম্বু হইত।—হিন্দুপেট্রিট,  
কলিকাতা, ২৫এ জুন, ১৮৮৩।

ধারের মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারির লিখিত পত্র।

ধার রাজবাটী

১৩ই জুন, ১৮৮৩।

মহাশয়,

আমি মহারাজের অনুমতিক্রমে আপনাকে জানাইতেছি যে, এতৎসম্ব  
রাজ কোষ হইতে অনেক টাকা খরচ হওয়ার মহাবাজ আপনার এই মহৎ ও  
স্বদেশ-হিতকর কার্যে যথেষ্ট সাহায্য করিতে অসমর্থ হওয়াতে দুঃখিত  
হইয়াছেন।

যাহা হউক, এই নিঃস্বার্থ বিষয়ে আপনি যেরূপ পরিশ্রম ও ব্যয় স্বীকার  
করিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিয়া আপনার মহারাজীয় অনুবাদের সাহায্য  
স্বরূপ মহারাজ ৫০০ টাকা দান করিলেন এবং ঐ অনুবাদের পঁচিশ খানির  
গ্রাহক হইলেন।

ভবিষ্যতেও এই অত্যাৱশ্যক কার্যের উন্নতির জন্য সাহায্য করিবেন  
এরূপও মহারাজের ইচ্ছা আছে। তিনি আশা করেন যে, তাঁহার স্বশ্রে-  
ণীস্থ রাজগণ ও স্বদেশের পুনরুজ্জীবনে যাঁহাদের বাস্তবিক ইচ্ছা আছে,  
তাঁহারা এই মহৎ কার্যে যথোচিত সহায়তা করিবেন।

বি, এম্, বেডেকর

ধারের মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারি।

শ্রীমৎ তত্বসাহেবও মহারাজীয় অনুবাদের সাহায্য স্বরূপ ৫০০ টাকা দান  
করিয়াছেন এবং অনুবাদিত গ্রন্থের দশ খানির গ্রাহক হইয়াছেন।

ইন্দোবের মহারাজ ও রতলামের মহারাজও প্রত্যেকে ৫০০ টাকা  
দান করিয়াছেন।

বেঃরামজি মালাবারি তাঁহার আপনার প্রেসিডেন্সি বোর্ডাইতে যেরূপ

পরিজ্ঞাত, এ প্রদেশের সেরূপ নন। আমরা অত্যন্ত আচ্ছাদ সহকারে বঙ্গদেশে তাঁহার পরিচয় প্রদান করিতেছি। তিনি একজন বিশিষ্ট প্রতিভা-শালী ও ক্ষমতাপন্ন পারসিক যুবক। তিনি কবি ও বিজ্ঞ লেখক। ইংরেজি ও গুজরাটী উভয় ভাষাতেই তাঁহার লিপিচাতুর্য্য দৃষ্ট হয়। তিনি বোম্বাই নগরস্থ ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটরের সম্পাদক। অন্যান্য গুজরাটী কাগজেও তিনি লিখিয়া থাকেন। এইরূপে তাঁহা দ্বারা পশ্চিম প্রেসিডেন্সির দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রের উন্নতির সাহায্য হইয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় ছয় ভাষাতে ভট্ট মোক্ষমূলরের ধর্ম্মের উৎপত্তি ও উন্নতি সম্বন্ধে ছিবার্ট বক্তৃতা সমূহ অনুবাদ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া সাহায্যপ্রাপ্তির আশায় তিনি সম্প্রতি আমাদে-  
 র নগরে আগমন করিয়াছেন। মালাবাবি নিজেই গুজরাটী ভাষায় অনুবাদ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। সংস্কৃত, মহাবাহী, হিন্দি, তামিল ও বঙ্গভাষায় অনুবাদেবও বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। আমরা অবগত হইয়াছি, বাঙ্গলায় অনুবাদেব ভার শ্রীবৃত্ত বাবু বঙ্গমীকান্ত গুপ্তের উপর সমর্পিত হইয়াছে। আমরা আশা করি, আমাদের দেশীয়গণ বর্তমান সময়ে ধর্ম্মতত্ত্বের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মোক্ষমূলরের উৎকৃষ্ট ছিবার্ট বক্তৃতা ভারতবর্ষের প্রধান ছয়টি ভাষায় অনুবাদ করিতে মালাবারিকে বিশেষ সহায়তা করিবেন।

হিন্দুপেট্রিয়ট, ২০ এ মার্চ, ১৮৮২।

আমরা আচ্ছাদ সহকারে মালাবারিকে আমাদের প্রদেশে সাদবে গ্রহণ করিতেছি। কবিরূপে সংবাদপত্রসম্পাদকরূপে এবং সাহিত্যজ্ঞরূপে তিনি অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইংরেজি ভাষায় গদ্য ও পদ্য উভয় লিখিয়াই তিনি বিশেষ যশোলাভ করিয়াছেন। তিনি বোম্বাই নগরস্থ ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটর নামক অতি সুন্দর একখানি ক্ষুদ্র সংবাদপত্রের সম্পাদক। এই সংবাদপত্র হইতে অনেক সময়ে আমরা অনেক বিষয় উদ্ধৃত করিয়া থাকি। মালাবাবি একজন সাধারণ হিতকর কার্য্যে লব্ধী উন্নত পারসিক যুবক। তিনি ভারতবর্ষীয় ভাষায় মোক্ষমূলরের বক্তৃতা সমূহ অনুবাদেব জন্য বে মনঃ মনঃ করিয়াছেন, তাহাট ইহার প্রমাণ।

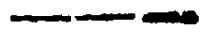
ইণ্ডিয়ান মিরর, ২০ এ মার্চ, ১৮৮২।

সাধারণ-কার্য্যে ত্রতী আর এক জন লোক আমাদের এখানে আনি-  
 যাছেন। মালাবারি যে, কেবল সাধারণ কার্য্যেই ব্যাপ্ত তাহা নয়, তিনি  
 এক জন প্রথম শ্রেণীর কবি। তাঁহার দেশীয় ভাষায় লিখিত কবিতা-  
 সমূহ পশ্চিম প্রেসিডেন্সির উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যরূপে গণ্য হইয়াছে। তাঁহার  
 ইংরেজি কবিতা সমূহ পাঠ করিয়া ইংরেজ কবি ও পণ্ডিতগণ আহ্লাদিত  
 ও বিস্মিত হইয়াছেন। এই উভয় বিষয়েই প্রকৃত ভারতবর্ষীয় ভাবরূপে  
 আপনাকে প্রকাশ করাই তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যায়  
 যে, সাহিত্যে তাঁহার অদ্বিতীয় প্রতিভা আছে। কিন্তু ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটরেই  
 তাঁহার বর্ণ বিশেষরূপে ব্যাপ্ত হইয়াছে। আমাদের সহযোগী ইংরেজি  
 ভাষায় বিশেষ অধিকার লাভ করিয়াছেন। রসিকতার ও বিজ্ঞপেও তাঁহার  
 যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। তাঁহার তাঁর অথচ ভাবপূর্ণ বাক্যসমূহ দেশে  
 প্রচলিত হইতেছে। সপ্তাহে সপ্তাহেই আমাদের সহযোগীর সম্পাদকীয়  
 স্তম্ভসকল সুপাঠ্য বিষয়ে পূর্ণ থাকে। মালাবারির সর্ব প্রধান প্রশংসার  
 বিষয় এই যে, তিনি মনোগত ভাবে ও অভ্যাসে প্রকৃত হিন্দু। সর্ব সাধা-  
 রণেব হিতকর কার্য্যে নিজের অর্থ ও শারীরিক ও মানসিক শক্তি ব্যয়  
 করেন, একরূপ লোক অতি বিরল। মালাবারির বর্তমান কার্য্যটি অতি  
 বিস্তৃত। তিনি ভট্ট নোক্ষমূলবের ভারতবর্ষের ধর্ম-নক্ষত্রীয় সর্বত্র আদৃত  
 হিবর্ট বক্তৃতা সমূহ অনুবাদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। নোক্ষমূলর যে  
 সকল গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে এই গুলিই সর্ব প্রধান। বেদান্ত ধর্মাব-  
 লম্বিদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী হইবে।

আমরা আমাদের দেশের সকলকেই বিশেষতঃ সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিদিগকে  
 মালাবারির এই কার্য্যে সাহায্য করিতে অনুরোধ করি। আমাদের দেশীয়  
 রাজাদিগের ধন ইহা অপেক্ষা আর কোন উৎকৃষ্টতর কার্য্যে ব্যয়িত হইতে পারে  
 না। ধর্ম ও সাহিত্য, এই উভয়ের জন্যই ভারতবন্ধুদিগের এই হিতকর বিষয়-  
 টির সাহায্য করা উচিত। এক বাঙ্গলাদেশেই মালাবারির আবশ্যক অর্থ  
 সংগৃহীত হওয়া উচিত। অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৩এ মার্চ, ১৮৮২।

মালাবারি কর্তৃক গুজরাটী ভাষায় অনুবাদিত অধ্যাপক মোক্ষমূলরের হিবার্ট বক্তৃতাসমূহ সাদরে গৃহীত হইয়াছে। তিনি এক্ষণে আপন বায়েই এই গ্রন্থ ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষাতে অনুবাদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। সংস্কৃত, বাঙ্গালা, মহাবাহ্মীয়, হিন্দি ও তামিল অনুবাদের কার্য্য আবস্ত হইয়াছে, কোন কোন অনুবাদ অনেক দূর পর্য্যন্ত হইয়াছে। এই কার্য্য যেকপ বহুকষ্টসাধ্য সেইরূপ বহুব্যয়সাধ্য। মালাবারি যে, এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার যথেষ্ট নিঃস্বার্থপরতা প্রকাশ পাইয়াছে।

মালাবারি এক জন বিখ্যাত পণ্ডিত লোক ও ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটর নামক সংবাদপত্রের সম্পাদকরূপে বিশেষ পবিজ্ঞাত। এই সংবাদপত্রখানি অতি দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হয়। ইংলিসম্যান, ২৯এ মার্চ, ১৮৮২।



মালাবারি ভারতবর্ষীয় ভাষায় হিবার্ট বক্তৃতাসকল অনুবাদ করার যে সংকল্প করিয়াছেন, তাহা ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতগণ কর্তৃক সমর্থিত হইয়াছে। এই কার্য্যটীতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এইরূপ কার্য্যে পূর্বে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। আমাদের বিশ্বাস যে, পূর্বেও অনেক ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতদের নিকট এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কিন্তু কার্য্যটি অত্যন্ত গুরুতব বলিয়া তাঁহারা ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই। ডিনষ্ট্যানলি, ডাক্তর মাটিনো, ডাক্তর কার্পেটের প্রভৃতি ব্যক্তিগণের প্রবর্তনায় মোক্ষমূলর যে বক্তৃতা দ্বারা হিবার্টকেণ্ডের স্মৃচনা করেন, সেই সমস্ত বক্তৃতা ইউরোপে কিরূপ সাদরে গৃহীত হইয়াছে, তাহা আমাদের পাঠকবর্গের অবিদিত নাই। কিছু দিন পবেই এই বক্তৃতা গুলি সংশোধিত হইয়া ইংলণ্ডে ও আমেরিকাতে প্রকাশিত হয়। ইহা প্রাচ্য বিদ্যাবত্তা ও গবেষণার আদর্শ স্বরূপ সর্বত্র গৃহীত হইয়াছে। এই হিবার্ট বক্তৃতাসমূহ অতি অল্প দিন পবেই ইউরোপীয় প্রধান প্রধান ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। কিন্তু মালাবারির পূর্বে আর কোন ভারতবর্ষীয় কোন ভাষায় ইহা অনুবাদ করিতে প্রয়াস পান নাই। মালাবারি স্বভাবতঃ প্রতিভাশালী ও সুশিক্ষিত বলিয়া

বিখ্যাত। বিশেষতঃ পাশ্চাত্য চিন্তা ও জ্ঞানের ফলসমূহ ভারতবর্ষীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তার করিবার জন্য তাঁহার সম্পূর্ণ উৎসাহ আছে। মোক্ষমূলরের ন্যায় ব্যক্তির বক্তৃতা ভারতবর্ষীয় ভাষায় অনুবাদিত হইলে ভারতবর্ষে সংস্কৃত প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার চর্চা সম্বন্ধে সবিশেষ উপকার হইবে, সন্দেহ নাই। এতদ্বারা দেশীয় ভাষা সমূহ পরিপুষ্ট হইবে এবং প্রাচীন জ্ঞানিগণ মানসিক উন্নতির পথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার ইচ্ছা শিক্ষিত সম্প্রদায়েব মধ্যে উদ্দীপিত হইবে। দেশীয় ভাষার সম্বন্ধে একরূপ আশাপ্রদ কার্য্যেব সূচনা আর আমবা কখনও দেখিতে পাই নাই বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না। আমরা সর্বসাধারণকে ও যাহাবা শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদিগকে মালাবারির সাহায্য করিতে অনুরোধ কবি। মোক্ষমূলরের অনুমতি লইয়াই মালাবারি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। এইরূপ গ্রন্থের অনুবাদ সহজ ব্যাপার নহে। এই জন্যই উত্তর পশ্চিম প্রদেশ স্যার উইলিয়ম মুইর এইরূপ কয়েক খানি গ্রন্থের অনুবাদ সম্বন্ধে যেকরূপ সাহায্য কবিয়াছিলেন, উপস্থিত বিষয়েও সেইরূপ সাহায্য করা উচিত।—ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউন্, ৩০এ মার্চ, ১৮৮২।

মালাবারি অধ্যাপক মোক্ষমূলরের হিবার্ট বক্তৃতা সমূহ অনুবাদ করার যে সংকল্প করিয়াছেন, তাহা সাধারণের উপকারক হইবে। ইহাতে দেশীয় সাহিত্যের পরিপুষ্টি হইবে এবং জাতীয় ধর্ম্মের যথাযথ ব্যাখ্যা ইদানীন্তন শিক্ষা-জ্যোতি-বিহীন লোকদিগের আয়ত্ত হইয়া উঠিবে। এই উদ্দেশ্যটী অতি মহৎ ও কষ্টপ্রদ। নানা প্রকার কৰ্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াও এই পারসিক কবি, পণ্ডিত ও খত্রিকা-সম্পাদক যে, এই মহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন ইহা তাঁহার পক্ষে সামান্য প্রশংসার বিষয় নয়।

মালাবারি এই বক্তৃতা সমূহ গুজরাটী ভাষায় নিজেই অনুবাদ করিয়াছেন। সঙ্কল্পিত ব্রতসাধনে তিনি যে কৃতকার্য্য হইবেন, ইহা একরূপ নিশ্চয় বলা যাইতে পারে। তাঁহার স্বীয় বিদ্যাবত্তা ও কবিত্ব-শক্তি তাঁহাকে দেশ বিদেশে বিখ্যাত করিয়াছে। তিনি যে এক্ষণে সেই বিদ্যা ও কবিত্ব অতি মহৎ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়।

এরূপ কার্যে ব্যাপৃত হইলে অনেক ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। কিন্তু আমরা আশা করি যে, সর্বসাধারণ ও ভারত বর্ষীয় শাসনকর্তারা এই শ্রমজনক কার্যে, যে, কত মূল্যবান তাহা বুঝিবেন।

এই মালাবারি কৃত্রিম সম্পাদিত ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটর সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা উপযুক্ত মনে করি। যেকোন দক্ষতাব সহিত ও স্বাধীন ভাবে এই পত্রিকা খানি চালান হয়, ইহার লেখা যেকোন উৎকৃষ্ট, তাহাতে ইহা সর্বোৎকৃষ্ট দেশীয় পত্রিকা বলিয়া পবিগণিত হইয়াছে।—ষ্টেটস্ম্যান, ৩০এ মার্চ, ১৮৮২।

বোম্বাই নগরস্থ প্রসিদ্ধ কবি ও পত্রিকা-সম্পাদক মালাবারি অধ্যাপক মোক্ষমূল্যের হিবার্ট বক্তৃতাসমূহ অনুবাদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সর্বসাধারণকে তাহা জানাইবার আশায় কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছেন। মালাবারি অন্যান্য স্থানে ভ্রমণ করিতেও মনস্থ করিয়াছেন। পাঞ্জাবের রাজধানীতে আমরা তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিতে পাবিলে সন্দেহ হইব। প্রকৃত সমাজ-সংস্কারকের ও সমাজ-নেতার যে সমস্ত গুণ থাকা আবশ্যক, মালাবারির তাহা সকলই আছে। তিনি সর্বদাই কার্যে ব্যাপৃত থাকেন। তাঁহার সঙ্কলিত কার্যটি অতি গুরুতর। কিন্তু মালাবারি যেকোন অধ্যবসায়-শালী তাহাতে তাহার পক্ষে কিছুই অসাধ্য নয়। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, কলিকাতার কতিপয় প্রধান ব্যক্তি সম্মানভাৱে তাঁহার সহিত যোগ দিয়াছেন।—লাহোর ট্রিবিউন, ১লা এপ্রেল, ১৮৮২।

মালাবারি অধ্যাপক মোক্ষমূল্যের হিবার্ট বক্তৃতা সমূহ অনুবাদ করাব যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা সাধারণের গোচর করার জন্য দুই সপ্তাহ হইল তিনি কলিকাতায় গিয়াছেন। তথাকার প্রধান প্রধান সংবাদ-পত্র সমূহ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা যেকোন সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতে মালাবারি তাঁহার সঙ্কলিত বিষয়ে সম্ভবতঃ কৃতকার্য হইবেন। এই কবি ও সংবাদপত্র-সম্পাদকের জন্যই আমরা এই সংবাদে অত্যন্ত আশ্লাদিত হইয়াছি। ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটরের সম্পাদকের সহিত পিয়োস-



কিষ্টেব মতভেদ আছে। কিন্তু তজ্জন্তু আমাদের কোন প্রকার ঈর্ষা নাই। সমুদয় প্রশংসনীয় কার্যে তিনি কৃতকার্য হইল, ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।— থিওসফিষ্ট, এপ্রেল, ১৮৮২।

একটী জাতীয় কার্য।—যদিও মালাবারির সঙ্কলিত বিষয়টী বর্তমান সময়ের অপেক্ষা ভবিষ্যৎবংশীয় দিগের বিশেষরূপ আদৃত হইবে, তথাপি আমাদের আশা ছিল, আমাদের সময়ের যে সকল উন্নতিশীল ব্যক্তি সাহিত্যের উন্নতিসাধন এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জাতির মধ্যে মনোগত ভাবে আদান প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই কার্যে মালাবারিকে বিশেষরূপে সাহায্য করিবেন। কিন্তু সম্প্রতি আমরা বোম্বাই হইতে যে সংবাদ পাইয়াছি, তাহা বড় ভাল নয়। মালাবারি প্রায় ছয় মাস হইল, বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি সকলকেই তাঁহার সঙ্কলিত কার্যের আবশ্যকতা বিশেষরূপে বুঝাইয়া বাম। কিন্তু সে সময় বড় ভাল ছিল না। প্রধান রাজ-পুরুষগণ ও অন্যান্য বডলোকদিগের প্রধান দশজন কলিকাতা হইতে প্রস্থান কবার গোলমালে ছিলেন। শ্রাব আমূল ইডেন সাহেবেব হঠাৎ কৰ্ম্মভ্যাগেও মালাবারির সাহায্য-প্রাপ্তির পক্ষে অনেকটা ব্যাঘাত জন্মিয়াছিল। কারণ তখন ইডেন সাহেবের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন জন্ত ও ইডেন সাহেবকে বিদায় দিবার সময়ে যে সব আমোদ প্রমোদ করা হয়, তাহাব নিমিত্ত অনেক টাকা চাঁদা সংগ্রহ করা হইয়াছিল। মোক্ষমূলরের উৎসাহী ব্যাখ্যাকারক বঙ্গদেশ হইতে ৭০০০ টাকা মাত্র চাহিয়াছিলেন। এই টাকা এ প্রদেশের অনেক ধনী লোক একাই দিতে পারেন। কিন্তু তিনি কেবল দানশীল মহারাজী স্বর্ণময়ীব নিকট হইতে ১০০০ টাকা পাইয়াছেন। ইহাতে বোধ হয়, তাঁহার কষ্টসাধ্য যাতায়াতের খরচটা কোনরূপে পোষাইয়া গিয়াছে। তিনি ভূপরে বাঁকিপুর, বারানসী ও এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে যাত্রা করেন। জয়পুরে তাঁহার সঙ্কল্প ব্যাখ্যা করিয়া একটী বক্তৃতা করেন; এই বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি বোম্বাইএ ফিরিয়া আসিয়াও নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই। মালাবারি লিখিয়াছেন, ‘আমি অনেক গুজরাটী রাজাদিগের সহিত দেখা করিতে গিয়াছি এবং অনেকের নিকট পত্রও লিখিয়াছি। তাঁহারা সকলেই

আমার সহিত ভাল ব্যবহার করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা কোন বিষয়ই শীঘ্র শীঘ্র স্থির করেন না। বোধ হয়, কিরূপে কোন একটি বিষয় স্থির করিতে হয়, তাহা তাঁহারা জানেন না। এখন আমাকে হয়ত সাহায্যের আশা পরিত্যাগ করিতে হইবে, নচেৎ আশার আশায় দিন কাটাইতে হইবে। আমি বিরক্ত হইয়া শেষে উক্ত রাজাদিগের নিকট হইতে সাহায্যের আশা পরিত্যাগ পূর্বক অন্যত্র চেষ্টা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি।”

আমাদের বন্ধু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ঠিক। কোন ব্যক্তিই তাঁহার নিজের দেশে ভবিষ্যৎবক্তা হইতে পারেন না। তাহার সঙ্কলিত বিষয় যে, উপযুক্তরূপে আদৃত হইবে, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। মালাবারির বন্ধুগণ এই প্রদেশে সর্বসাধারণকে এ বিষয়ে উদ্দীপিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। বাঙ্গালা ও বেহারের রাজগণ ও জমিদারগণ এই বিষয়ে সাহায্য করা চলে, তাঁহাদের কর্তব্য, তাহা এখন বুঝিতে পারিবেন। জয়পুরের রাজাও বিশেষ আনুকূল্য করিতে পারেন। রাজ-পুতনার অগ্রাণ্ড রাজারাও বোধ হয় তাঁহার অনুসরণ করিবেন। বরদার যুবক মহারাজা রাজার উপযুক্ত দান করিয়া পশ্চিম ও মধ্যভারতবর্ষের অগ্রাণ্ড মহারাজীয় রাজাদিগকে একটি মহৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন, এরূপ আমাদের ভরসা আছে। তাহার পর পঞ্জাব উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণ ভারতবর্ষ; তাহার মধ্যে দুই প্রদেশের গবর্নরগণ মালাবারির এই দেশহিতকর কার্যের মূল্য সুন্দররূপে বুঝিতে পারিবেন। ত্রিবাঙ্কোব, বিজয়নগরাম ও তাজোর প্রভৃতি স্থানের মহারাজারাও এই কার্যের গুরুত্ব বেশ বুঝিতে পারেন।

আমরা ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা কি এই দেশ-হিতকর কার্যে সাহায্য করা উপযুক্ত বোধ কবেন না? সাধারণ শিক্ষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য গবর্নমেন্টের যেরূপ চেষ্টা আছে, তাহাতে এই বিষয়টি তাঁহাদের নিকট সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত। দেশীয় রাজারা মালাবারির এই কার্যে যে, বড় মনোযোগ দেন নাই, তাহার একটি কারণ এই বোধ হয় যে, পলিটিকাল অফিসরগণ তাঁহাকে নিকটে আসিতে দেন নাই। আমাদের বন্ধু লর্ড রিপনের গবর্নমেন্টের নিকট

বিশেষ পরিচিত। আমরা আশা করি যে, উক্ত গবর্ণমেন্ট তাঁহার পথ পরিষ্কারের জন্য কিছু করিবেন। এই উৎসাহী সংস্কারক নানারূপ বিঘ্ন বিপত্তিতে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাঁহাকে আশ্বাস দিতে, প রি যে, উন্নতিশীল গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে সাহায্য করিবেন। মালাবারি এই কার্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছি যে, নানা প্রকাব কর্তব্যকার্যের ভাবে তাঁহার স্বাস্থ্য-হানি হইয়াছে। দেশীয় রাজাদিগের এ বিষয়ে সাহায্য করা উচিত হইতেছে। বর্তমান সময়ে মালাবারির ন্যায় কেহই দেশীয়দিগের নিকট হইতে সাহায্য পাইবার অধিকতর উপযুক্ত নন।—ইণ্ডিয়ান মিবব, ২৮এ সেপ্টেম্বর, ১৮৮২।

বোম্বাইব সর্লপ্রদান পারসিক কবি মালাবারি অধ্যাপক মোক্ষমূলরের হিবার্ট বক্তৃতাগুলি সংস্কৃতে এবং ভাবতবর্ষীয় চলিত ভাষায় অনুবাদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। গুজরাটী অনুবাদ প্রকাশ হইয়াছে। আমরা দেখি যে, পশ্চিম প্রেনিডেন্সিব সকল সংবাদপত্রেই ইহাব ভূমসী প্রশংসা বাহির হইয়াছে। সংস্কৃত অনুবাদের ভার অধ্যাপক মনিষর উইলিয়মসেব যুবক সহযোগী গ্রহণ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য ভাবসমূহ ভাবতবর্ষীয় প্রচলিত ভাষাতে ব্যক্ত হইতে পারে কি না, এবিষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন। অধ্যাপক মোক্ষমূলরকে সংস্কৃত অনুবাদেব জ্ঞাত বিশেষ বাগ্ৰ বলিয়া বোধ হয়। মালাবারি যে, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা আশ্লাদ প্রকাশ করি। তিনি সাময়িক চিহ্ন সমূহ যথার্থতঃ বুঝিতে পারিয়াছেন। বর্তমান সময়ে ভাবতবর্ষবাসীদিগের মধ্যে বিজ্ঞান চর্চার উন্নতি আবশ্যক। মোক্ষমূলরের গ্রন্থ দ্বারা উহা যেরূপ সম্পাদিত হইবে, অন্য কোনও গ্রন্থ-কারের গ্রন্থ দ্বারা সেরূপ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। আমরা আশা করি মালাবারি কেবল হিবার্ট বক্তৃতাসমূহ অনুবাদ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিবেন না, মোক্ষমূলরের ভাষা-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বক্তৃতা, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতি-হাস, ধর্ম-বিজ্ঞান ও চিপস্ ক্রম এ জবমান ওষাকসপ গ্রন্থেব কয়দংশ অনুবাদ করিবেন। বঙ্গদেশে অধ্যাপক মোক্ষমূলরের গ্রন্থ সমূহ বিশেষরূপ আদৃত হইবে। যদি তৎসমুদয় অন্তঃপুবেও প্রবেশ করে, তাহা হইলেও আমাদের আশ্চর্য্যান্বিত হওয়ার বিষয় কিছুই নাই।—লিবারেল, ২৫এপ্রেল, ১৮৮২।

মালাবারি নিজেই এই বক্তৃতা সমূহ গুজরাটী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। সংস্কৃত, বাঙ্গলা, মহারাষ্ট্রীয়, হিন্দি, ও তামিল ভাষায় অনুবাদের বন্দোবস্ত হইয়াছে। অধ্যাপক মোক্ষমূলর মালাবারিকে এক পত্র লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি তাঁহার সঙ্কলিত বিষয়ের অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। এই সংকলনটি অতি প্রশংসনীয় এবং মালাবারি এই কার্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত, একরূপ মত অনেক সংবাদপত্রেই প্রকাশ করিয়াছেন। —পাইওনিয়র, ৫ই মে, ১৮৮২।

—

আমরা শুনিয়াছি, অধ্যাপক মোক্ষমূলরের হিবার্ট বক্তৃতা সমূহ সংস্কৃতে ও ভারতবর্ষীয় অন্য পাঁচ ভাষাতে অনুবাদ করার জন্য মালাবারি যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহাতে ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজ আশ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন। কাণ্ডটি অতি গুরুতর। কিন্তু অনুবাদকের পূর্ব পূর্ব কার্য্য এবং তৎকর্তৃক উক্ত বক্তৃতার গুজরাটী ভাষায় অনুবাদের বিষয় বিবেচনা করিলে তিনি যে ইচ্ছাতে কৃতকার্য্য হইবেন, তাহা আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস। মালাবারি একজন কবি ও প্রতিভাশালী বিদ্বান লোক। ইউরোপের ও তাঁহার নিজ দেশের বর্তমান ভাব সমূহ তাঁহার বিশেষরূপ জ্ঞান আছে।

আকাডেমি (লণ্ডন), ১০ই জুন, ১৮৮২।

—

আমরা শুনিয়া শুনিয়া হইলাম, মালাবারি বঙ্গদেশ হইতে উৎসাহ পাইয়া মোক্ষমূলরের হিবার্ট বক্তৃতা গুলি ভারতবর্ষীয় অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। গুজরাটী অনুবাদ বাহির হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীয় ও বাঙ্গলা অনুবাদও বৃন্দগের জন্ত প্রস্তুত হইয়াছে। সংস্কৃত, (কাহারও কাহারও মতে বাহা বিশেষ প্রয়োজনীয়) হিন্দি ও তামিল অনুবাদ পরে বাহির হইবে। মালাবারির সঙ্কলিত বিষয়টির বিশেষ আবশ্যিকতা এই যে, ইহা দ্বারা তাঁহার স্বদেশীয়েরা তাঁহাদের প্রাচীন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনাবলি জানিতে পারিবেন। অধ্যাপক মোক্ষমূলর তাঁহার বক্তৃতায় ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক ঘটনাবলির আলোচনা করিয়াছেন। বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও ডাক্তর রাজেন্দ্রনাথ মিত্রের ন্যায় চিত্র চিত্র প্রকারের

ভাবুকগণ অস্থঃকবণের সহিত প্রস্তাবটি গ্রহণ করিয়াছেন। মালাবারি অনেক দেশীয় ও ইউরোপীয় খ্যাতনামা পণ্ডিত লোকেব সহানুভূতি পাইয়াছেন। বর্তমান বিষয়টিতে কৃতকার্য হইলে মালাবারি দেশীয় ভাষাতে ও দেশীয় ভাষা হইতে, অনুবাদ প্রকাশের জন্য একটি সভা স্থাপন করিবেন। কল্পনাটি অতি উচ্চ। কিন্তু যদি দেশীয় রাজা ও জমীদারগণ সাহায্য করেন. (তাঁহাদেব এ বিষয়ে সাহায্য করাও উচিত) তবে কি জন্য যে, ইহা সফল হইবে না, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, বোম্বাই গবর্ণমেন্ট এই বিষয়ে সাহায্য করিয়া অতি সদ্‌চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন। যেরূপ উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সহিত মালাবারি এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা অতি প্রশংসনীয়। আমরা আশা কবি, উপযুক্ত সাহায্যের অভাবে তাঁহার এই নিঃস্বার্থ চেষ্টা নিষ্ফল হইবে না। প্রধান প্রধান দেশীয় সংবাদপত্রসমূহ গুজরাটী অনুবাদ সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। অনেকে বলেন অনুবাদেব কোন কোন স্থল অত্যন্ত বঠিন হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইলেও অনুবাদটি যে অতি উত্তম হইয়াছে, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। উপক্রমণিকার অধ্যায় কয়েকটি অতি উত্তম গুজরাটী ভাষায় লিখিত হইয়াছে। ওজস্বিতায় ও লালিত্যে ইহা তুলনারহিত। কোন সমালোচকের মতে লেখকের ভাষা, গুজরাটী ভাষার যত দূর উৎকর্ষ হইতে পারে, ততদূর হইয়াছে।—টাইমন্ অব ইণ্ডিয়া, জুন. ১৮৮২।

যে কার্যটিতে মালাবারি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা অতি মহৎ ও সকল শ্রেণীর লোকেবই সাহায্যের উপযুক্ত। ভারতবর্ষীয় ভাষায় যে হিবার্ট বক্তৃতাগুলির অনুবাদ তিনি প্রকাশ করিতে কৃতসম্মত হইয়াছেন, তাহা ইউরোপের সর্বপ্রধান সংস্কৃত পণ্ডিত অধ্যাপক মোক্ষমূলরের লিখিত। বর্তমান সময়ে এ দেশে যে সকল ধর্ম প্রচলিত আছে, তাহা দ্বারা ধর্মের উৎপত্তি ও উন্নতির বিষয় এই বক্তৃতায় আলোচনা করা হইয়াছে। অনেকেই মালাবারির এই কার্যটির অনুমোদন করিয়াছেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি তাঁহার প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়াছেন। কিছু কাল হইল, মালাবারি জয়পুরে গিয়া-

ছিলেন, তথাকার সকলেই তাঁহার সঙ্গর বুঝাইয়া দিবার জন্য একটা বক্তৃতা করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করেন। একরূপ আশা করা যাঠিতে পারে, জয়পুরের মহারাজ এই কার্য সম্পাদনে জন্য মালাবারিকে বিশেষ সাহায্য করিবেন। মহাবাণী স্বর্ণময়ীও সাহায্য লইয়া অগ্রসর হইয়াছেন। বোম্বাই গবর্ণমেন্টও এক হাজার টাকা দিয়াছেন। এই অনুবাদে দেশীয় সাহিত্য বিশেষরূপ পুষ্ট হইবে এবং আমাদের দেশীয় লোকগণ ভারতবর্ষীয় ধর্ম সম্বন্ধে ইউরোপীয় সংস্কৃত পণ্ডিতবর্গের মত জানিতে পারিবেন। এই কার্য সম্পন্ন করিতে মালাবারিকে বহু অর্থ ব্যয় ও পবিত্রম স্মীকার করিতে হইবে, এজন্য আমরা আশা করি যে, দেশীয় রাজগণ তাঁহাকে বিশেষরূপ সাহায্য করিবেন।—নেটিব্ অপিনিয়ন জুন, ১৮৮২।

মালাবারি, ইংরাজি ও হিন্দি ভাষায় জয়পুরস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের নিকট যে বক্তৃতা করেন, তাহার যথার্থ বিবরণ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। মালাবারি যখন কলিকাতায় ছিলেন, তখন অনেকেই তাঁহার আলাপ করার ক্ষমতায় মোহিত হইয়াছেন। ইহারা বোধ হয় শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইবেন না যে, তাঁহার বক্তৃতাশক্তিও বিশেষ প্রবল। যে সমস্ত ভাষায় তিনি জয়পুরে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সে সমস্তই তাহার নিকট বিদেশীয় ভাষা। তাঁহাকে একরূপ লোকদিগের নিকটে বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল, যাহারা তাঁহার বক্তৃতার উপর কোন না কোনরূপ সমালোচনা না করিয়াই থাকিতে পারিতেন না। অন্য একটি কাণ্ডেও গত শুক্র-বাবের বক্তৃতাটি সাদরে গৃহীত হইয়াছে। ইডেন্ সাহেবকে বিদায় দেওয়ার গোলমালে তাঁহার সঙ্গিত বিষয় যে, বঙ্গদেশে আদৃত হয় না, তাহাতে কিছুমাত্র নিরুৎসাহ না হইয়া তিনি সংপ্রতি আরও উচ্চ বিষয়ের সঙ্গর করিয়াছেন। অকৃতকার্য হওয়ার জন্য এই সকল লোক জন্মগ্রহণ করেন নাই। যদিও এখন তিনি তাঁহার কার্যস্থান বোম্বাইতে গিয়াছেন, তথাপি তিনি যে পুনরায় দেশের নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া উপযুক্ত সাহায্য সংগ্রহ করি-  
দিগ্বিজয়ী বীরের ন্যায় সন্তানে প্রভাগত হইবেন, তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। আমরা সেই দিনের জন্য প্রার্থনা করি।

ইণ্ডিয়ান মিরর, ১১ই মে, ১৮৮২।

১১/০

৫২২, পার্ক ষ্ট্রীট কলিকাতা, ১৫ই মার্চ, ১৮৮২।

প্রিয় মালাবারি,

আপনি মোক্ষমূলরের বক্তৃতা সমূহ অনুবাদের বিষয় আমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ মত আছে। আমি বিবেচনা করি যে, ভারতবর্ষীয় ভাষাতে এই সকল বক্তৃতার অনুবাদ শিক্ষিত সমাজের পক্ষে মঙ্গলের বিষয় হইবে।

আমি আশা করি, যে সকল বাজগণ শিক্ষা ও সাহিত্যে বিশেষ মনোযোগ দিয়া থাকেন এবং এই সকল বক্তৃতা বুঝিতে পারেন, তাহারাই এই কার্যে আপনাকে সাহায্য করিয়া আপনাদিগকে সম্মানিত করিবেন।

আপনার গুজরাটী অনুবাদ হইতে ভবিষ্যতে অগ্ৰাণু অনুবাদও কবা যাইতে পারিবে। এইরূপে উহা নিঃসন্দেহ সকলের পক্ষেই সাহায্যকর হইবে।

আমি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, ডাক্তর রাভেন্দ্রলাল মিত্র আগ্রহেব সহিত এই বিষয়ে অনুমোদন করিয়াছেন। তিনি একাই এক শ। আমার বিবেচনার ভারতবর্ষের এই অংশে আপনাকে সাহায্য করিতে তাহার মত উপযুক্ত আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই।

যদি এই পত্র প্রকাশ করিলে আপনার কোনরূপ উপকার হইতে পারে, এরূপ বিবেচনা করেন, তবে ইহা প্রকাশ করিবেন। এই বিষয়ে যে, আমার সম্পূর্ণ মনোযোগ আছে, এই পত্র তাহার সাক্ষী।

আপনার  
জে. জিব্‌স্‌।

কমল কুটীর, অপর স্কুলার রোড, ২৯ এ মার্চ, ১৮৮২।

প্রিয় মালাবারি,

আমার শরীরের বর্তমান অবস্থায় আমি কোন কার্যই করিতে সক্ষম নই, নচেৎ আপনাব পত্রের উত্তর শীঘ্রই দিতাম। আপনার অভীষ্ট কার্যের আবশ্যকতা আমি সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিয়াছি। আপনি কৃতকার্য হউন, এই আমার ইচ্ছা। অধ্যাপক মোক্ষমূলরের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। প্রাচ্য সাহিত্য ও ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবসমূহ এক শৃঙ্খলে গ্রথিত হইয়াছে। তাহার হিবাট বক্তৃতাগুলি ও অন্যান্য গ্রন্থ ভারতবর্ষীয় ভাষায় বিশেষতঃ সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া আপনি দেশের বিশেষ উপকার করিবেন, এবং দেশের সকল লোকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন। এই কার্যে আপনাকে বহু ব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইবে। আমি সর্বান্তঃকরণে



আশা করি, সর্বসাধারণে এবিষয়ে উপযুক্ত সাহায্য করিবেন। আমার ভরসা আছে যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় রাজারা ইহাতে মনোযোগ দিবেন ও যথোচিত সাহায্য করিবেন। সঙ্কলিত বিষয়টি নিশ্চয়ই বহু সাহায্যের অপেক্ষা করে। শিক্ষিত ও চিন্তাশীল সমাজ অন্তঃকরণের সহিত ইহাতে সাহায্য করিতে বিমুখ হইবেন না। যদি বিবেচনা করেন যে, আমার পত্র আমার বন্ধুদিগের, দেশীয় রাজা সমূহের ও প্রেসিডেন্সি নগর সকলের সর্ব সাধারণের মন এই বিষয়ে আকর্ষণ করিতে পারে, তাহা হইলে আপনার গ্রন্থে, আপনার যেকোন ইচ্ছা, এই পত্রের সেইরূপ ব্যবহার করিতে পারেন।

আপনার  
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

৮ নং মানিকতলা, ১১ই এপ্রেল, ১৮৮২।

প্রিয় মালাবারি,

মোকমুলের হিবার্ট বক্তৃতাসমূহ ধর্মসম্বন্ধীয় ইতিহাসে এক নূতন যুগ উপস্থিত করিয়াছে। শুৎসমুদয় দেশীয় ভাষায় অনুবাদিত হইলে আমাদের সাহিত্য পরিপুষ্ট হইবে। আপনার সঙ্কলিত বিষয়টি অতি প্রশংসনীয় ও সর্বপ্রকারে উৎসাহের যোগ্য বলিয়া আমি বিবেচনা করি। অর্থসম্বন্ধে ও অনুবাদ-কার্যে আপনাকে অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে। কিন্তু আপনার অধাবসার ও প্রহিভাশুণে আপনি সেই সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারিবেন। আপনি কৃতকার্য হউন, ইহা সর্বান্তঃকরণে কামনা করি।

আপনার  
শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র।

ইউনাইটেড্ সার্ভিস ক্লাব, কলিকাতা, ২২এ মার্চ, ১৮৮২।

প্রিয় মালাবারি,

যদি আমার পরিচিত কোন ভদ্রলোকের সহিত আপনি দেখা করিতে চান, তাহা হইলে আমি আত্মদসহকারে আপনাকে আপনার পরিচয়-জ্ঞাপক পত্র দিব। যাহা হউক, আপনার নিজের প্রতিপত্তিই আপনাকে সকল স্থানে পরিচিত করিবে। আপনি যে কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা পণ্ডিত লোকদের মতামতের সহিত করিবার উৎকৃষ্ট উপায়। আমার লেখায় ততদূর কিছু হওয়ার সুভাবনা নাই।

আপনার  
ডব্লিউ, ডব্লিউ, হটর।

